দামঃ ৩০০ টাকা
www.poundrakshatriya.com

দ্বিতীয় বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ), ইং-২০২৬, অক্টোবর, ক্রমিক সংখ্যা-৪

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র মুখপত্র

শারদ সংখ্যা



সম্পাদকঃ শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

দ্বিতীয় বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ), ইং-২০২৬, অক্টোবর, ক্রমিক সংখ্যা-৪

www.poundrakshatriya.com

দামঃ ৩০০ টাকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

শারদ সংখ্যা

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র মুখপত্র

সম্পাদকঃ শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল



সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

সংগঠন মন্ত্র (বেদ থেকে গৃহীত)

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সং জানানা উপাসতে।।

সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।

সমানী বা আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ।। (সামবেদ)

"সমভাবে চল, সমভাবে বল, সমভাবে মনোবৃত্তি সমূহের প্রেরণা হউক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের ন্যায় সমভাবে আরাধনা পরায়ণ হও। তোমাদের সমান মন্ত্র হউক, সমান সমিতি হউক, সমান মন হউক, সমান চিত্ত হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হও, সমানভাবে আত্ম নিবেদন কর, সম হৃদয়ে উদ্দেশ্য জানাও, তোমাদিগের মন সমানভাবে ভাবান্বিত হউক, তোমাদিগের হাস্যহর্ষ সমভাবাপন্ন হউক। ওম শান্তি! ওম শান্তি! ওম শান্তি"

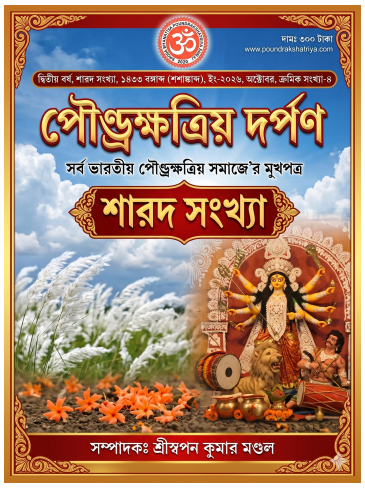
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

দ্বিতীয় বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ক্রম-৪

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/শশাঙ্কাব্দ,

যুগাব্দ - ৫১২৮, ইং-২০২৬

www.poundrakshatriya.com



পত্রিকা সম্পাদকঃ শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

সহ-সম্পাদিকাঃ শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

যে কোনও বিষয়ের জন্য যোগাযোগ

সম্পাদক - ৯৮০০২৯৬৬৪৮

প্রকাশকের ঠিকানাঃ

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ই-মেলঃ :

poundrakshatriyadarpan@gmail.com

সূচিপত্র

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র - 2

সম্পাদকীয়ঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের করণীয় - 3

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের

সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - 7

'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি - শ্রীপৌণ্ড্রক বাসুদেব - 8

বৈদিক সাহিত্যে পৌণ্ড্র - শ্রীআত্মবান বৈদ্য -17

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্র - শ্রী বাসুদেব বৈদ্য-23

অষ্টাদশ মহাপুরাণে পৌণ্ড্র - শ্রীসৎকৃত করণ -29

উপপুরাণে পৌণ্ড্র - শ্রীপরাণ মণ্ডল-35

মৎস্য পুরাণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়- শ্রীমতী রত্নগর্ভা রায়-42

হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র-শ্রী হিরণ্যনাভ জানা-47

মনুসংহিতায় পৌণ্ড্র - শ্রী সর্বদৃক সানা-53

রামায়ণে পৌণ্ড্র - শ্রীঅমৃতপ সোম-59

মহাভারতে পৌণ্ড্র- শ্রীপুস্করাক্ষ পৌণ্ড্র-63

বৌদ্ধ সাহিত্যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় - শ্রীসহস্রাংশু সেন-69

জৈন সাহিত্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়- শ্রীমতি মহামায়া মৃধা-75

অর্থশাস্ত্রে পৌণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়- শ্রী দেবেশ মণ্ডল-80

গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে- শ্রী পদ্মনাভ প্রজাপতি-87

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নগরী মহাস্থানগড়-শ্রী সন্ধাত সেন-94

পৌণ্ড্র সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব- শ্রী বাসুদেব সরকার-102

অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থে পৌণ্ড্র- শ্রীবিধিদর্শী সর্বজ্ঞ-108

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসচর্চায় পৌণ্ড্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রসঙ্গ-- শ্রী উদ্ভব করণ-115

ফ্যাসিবাদ ও মার্ক্সবাদ ভাই ভাই - শ্রী রতন বিশ্বাস-121

নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থে প্রাচীন পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রসঙ্গ- শ্রী নিহার হাউলি-129

ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল-133

আম্বেদকর যে ভুল করেছিলেন-শ্রীচৈতন্য বর-148

১১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করা শ্রেয় - শ্রীমঙ্গল মৃধা-157

আত্মশক্তির জাগরণই চাবিকাঠি- শ্রীরাধামাধবাচার্য-160

সনাতন ধর্ম সুরক্ষায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা - শ্রী বীরভদ্র গায়েন-166

বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-শ্রী ত্রিলোচন নস্কর-171

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উল্লেখযোগ্য নারীরা- শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল-174

কবিতাঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাগাথা-এ আই আচার্য-178

সাংগঠনিক সভা -178

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক খবর -179

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ-181

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র

"বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ। তোমারা যে, যে অবস্থায় থাক না কেন ভুলিও না, তুমি এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননীর একটি সন্তান। ভুলিও না, জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। ভুলিও না তোমার চরিত্র, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃতিত্ব, তোমার গৌরব তোমার প্রতিষ্ঠার দিকে তোমার জননীর অপমান, তোমার জননীর লাঞ্ছনা, তোমার জননীর নির্যাতনের জন্য তুমি দায়ী। ভুলিও না- তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দ, সুবিধা, বিলাস, ব্যাসন ভোগের ক্ষুধা মনুষ্যেতর জীবনেও মিটিতে পারে। ভুলিও না তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার নিত্য সহচর। ভুলিও না— তুমি আর্য, আচার্য্যত্ব তোমার আছে। ভুলিও না তুমি ভারতের একজন, পৃথিবীর একজন। ভারত তথা পৃথিবী তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

স্মরণ রাখিও–তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ী, আসামী, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মৎসর হস্তের বিকৃত বিবৃতিকে তোমার লেখনীর নির্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। **সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধ চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্ত কাল চলিবে। স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। চিন্তা করিও—পরিবেশই মানব গঠন করে। অসৎ পরিবেশ নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন ও সৎপরিবেশে প্রবেশই অস্তিত্ব রক্ষার উপায়।** মনে রাখিও তোমার পরিচয়ে, তোমার জাতি, তোমার জননীর পরিচয়। স্থির জানিও তোমার আদরেই তোমার জননীর আদর। বিচার করিও -- তোমার গুরু পুরোহিত কুলের অবনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু মৎসর মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তিই বল। মনে রাখিও – কুটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, আবার সোজা হইয়া সোজা পথে চলিতে হইবে। লুপ্ত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে। নচেৎ তোমার আত্মাই তোমাকে ক্ষমা করিবে না, করিতে পারে না। সাধু। সাবধান! প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।" বাক্য সার্থক কর। **ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !!!"**

- মহাত্মা রাইচরণ সরদার,
"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা" থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের করণীয়

একটি জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব ও বিকাশ নির্ভর করে তার আত্মপরিচয়, ইতিহাসচেতনা এবং সমকালীন বাস্তবতার সঠিক মূল্যায়নের ওপর। বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। বাংলার মাটি, কৃষি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আত্মরক্ষার ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঘাম ও রক্ত মিশে রয়েছে।

আজ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে সমগ্র বিশ্ব, ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এক জটিল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে থাকার আর কোনো অবকাশ নেই। নিজের গৌরবময় ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা, বর্তমানের সঙ্কট ও সুযোগকে চিহ্নিত করা এবং সামগ্রিক হিন্দু সমাজের সংহতি ও সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করাই হলো আজকের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রধানতম ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস কোনো আকস্মিক বা প্রান্তিক ঘটনা নয়; এটি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন অধ্যায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণে 'পুণ্ড্র' জাতির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের আদিপর্ব ও সভাপর্বে পুণ্ড্রদের বীরত্ব, তাদের রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান উত্তর ও পূর্ব বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল, যার কেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড়) ছিল শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও জ্ঞানচর্চার এক সুবিশাল কেন্দ্র। পৌণ্ড্ররা কেবল সুশাসক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা ও রণনিপুণ ক্ষত্রিয়। মধ্যযুগে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বহিরাগত আক্রমণের মুখে এই বীর জাতি কৃষিকাজ ও মাটির প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়, যার ফলে তাদের সামাজিক পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার এক অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের সূচনালগ্নে যখন ব্রিটিশ সেন্সাস রিপোর্টে স্থানীয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাবে এই বীর জাতিকে অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়, তখন শুরু হয় এক অভূতপূর্ব আত্মমর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন (১৮৯১-১৯৫৬)। ইতিহাসবিদ ও সমাজসংস্কারক মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর রচিত বিখ্যাত আকর গ্রন্থ **'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ'** এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে পৌণ্ড্ররা সনাতন আর্য ক্ষত্রিয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর সাথে সাথে শ্রী ভূষণচন্দ্র নস্কর, রাজেন্দ্রনাথ সরকার এবং পরবর্তীতে বহু মনীষী এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁরা কেবল জাত্যাভিমান প্রতিষ্ঠা

করেননি, বরং গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার, উপনয়ন সংস্কার, নীতিবোধ জাগ্রত করা এবং কুসংস্কার দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯১১-র আদমশুমারিতে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রামের এক উজ্জ্বল মাইলফলক।

বাংলার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান অতুলনীয়। সুন্দরবনের শ্বাপদসংকুল জঙ্গল কেটে আবাদি জমিতে রূপান্তর করা, নোনা জলের বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাকে শস্যশ্যামলা করে তোলা—এ সবই সম্ভব হয়েছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অদম্য শারীরিক শক্তি, ধৈর্য ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরাজেয় মনোভাবের কারণে। একই সাথে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা ও খুলনায় ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র ও অহিংস লড়াইয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকরা অকাতরে রক্ত দিয়েছেন।

যে জাতি নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, সে জাতি নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। দীর্ঘদিনের সামাজিক অবহেলা ও রাজনৈতিক বঞ্চনার ফলে যুবসমাজের মধ্যে যে একধরনের আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি হয়েছিল, গৌরবময় অতীত স্মরণ করলে তা নিমেষে আত্মমর্যাদাবোধে রূপান্তরিত হয়। পূর্বপুরুষদের ক্ষত্রিয় সুলভ তেজ, সহনশীলতা ও পরিশ্রমী মনোভাব আজকের তরুণ প্রজন্মকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা জয়ের সাহস জোগায়। বিশ্বায়নের যুগে যখন নিজের শিকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে, তখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহ্য সনাতন সংস্কৃতির সাথে নিবিড় যোগসূত্র রক্ষা করতে শেখায়।

আজকের বিশ্ব চরম অস্থিরতা ও বহুমুখী মেরুকরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যবাহী কর্মসংস্থানের ধরন বদলে যাচ্ছে। একই সাথে বিশ্বজুড়ে চলছে সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত দ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য বস্তুবাদের আগ্রাসন এবং ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান সনাতন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। বিশ্ব নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতার উপযোগী মেধা গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান ভারত এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে তৃতীয় বৃহত্তম হওয়ার পথে ভারত দ্রুত ধাবমান। ডিজিটাল বিপ্লব, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্টার্ট-আপ সংস্কৃতি এবং জাতীয় আত্মমর্যাদার নবজাগরণ আজকের ভারতের বৈশিষ্ট্য। সাংবিধানিক অধিকার, সংরক্ষণ নীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রকল্পগুলির সুবাদে অনগ্রসর অংশের সামনে এগিয়ে যাওয়ার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে শুধু সরকারি সুযোগের আশায় বসে থাকলে চলবে না; বরং

মেধার বিকাশ, কারিগরি শিক্ষা ও বেসরকারি বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করাই আজকের জাতীয় ক্ষেত্রে সফলতার চাবিকাঠি।

পশ্চিমবঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ বসবাস করে (বিশেষত দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর)। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একাধিক গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি। কৃষিজ পণ্যের সঠিক মূল্যের অভাব, লোনা জলের অনুপ্রবেশ, নদীভাঙন এবং সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। চাষি ও মৎস্যজীবীদের সিংহভাগ পৌণ্ড্র হওয়ায় তাঁরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত। রাজ্যে পর্যাপ্ত কলকারখানা ও কর্মসংস্থানের অভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকদের একটি বিশাল অংশ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিপজ্জনক ও স্বল্পমজুরির কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এবং উপকূলীয় জেলাগুলিতে দ্রুত জনমিতিক পরিবর্তন ঘটছে। অনুপ্রবেশ এবং উগ্র ধর্মীয় শক্তির আগ্রাসনের ফলে স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রাজনৈতিক দলগুলি পৌণ্ড্রদের নিছক 'ভোটব্যাংক' হিসেবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাদের মৌলিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা কিংবা সাংস্কৃতিক সুরক্ষায় স্থায়ী কোনো সমাধান করেনি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সনাতন হিন্দু সমাজ যখনই বর্ণ ও জাতপাতের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত হয়েছে, তখনই বিদেশি আক্রমণকারীরা সহজে তাদের পদানত করেছে। আজও সেই একই চক্রান্ত সক্রিয়। জাতপাতের সংঘাত বাঁধিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখা সমাজবিরোধীদের চিরকালীন কৌশল। পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আক্রমণকারী কখনো বর্ণ দেখে আঘাত করে না; তারা হিন্দু বলেই আঘাত করে। পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় নির্দেশনায় বলা হয়েছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে"। কর্ম ও গুণই মানুষের পরিচয়। তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও অনগ্রসর বর্ণের মধ্যেকার কৃত্রিম দূরত্ব মুছে ফেলে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রদর্শিত সমরসতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাস্তবায়ন করতে হবে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কোনো বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় নয়; বরং তাঁরা বাঙালি সনাতন হিন্দু সমাজের প্রাণশক্তি ও মেরুদণ্ড। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে মন্দির রক্ষা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, রাস উৎসব, গাজন এবং হরিনাম সংকীর্তনের ঐতিহ্যকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা। এই সংস্কৃতি রক্ষা করাই সনাতন ধর্মের শিকড়কে মজবুত রাখা। ক্ষত্রিয়ত্বের মূল দর্শন হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও দুর্বলকে রক্ষা করা। সমাজে অনাচার, নারী

নির্যাতন বা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা দেখা দিলে পৌণ্ড্র যুবকদের আত্মরক্ষামূলক ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ অন্যান্য সমস্ত দলিত, ওবিসি ও সাধারণ শ্রেণির হিন্দুদের সাথে একযোগে কাজ করে এক অটুট সামাজিক প্রাচীর গড়ে তুলতে পারে। তাঁরা পারেন সমস্ত অংশের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনকারী প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে যদি তার অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হয় এবং আধুনিক যুগে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তবে জরুরি ভিত্তিতে সুসংগঠিত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, আইন এবং সিভিল সার্ভিসের মতো উচ্চপর্যায়ের পরীক্ষায় যুবকদের প্রস্তুত করতে হবে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে কোডিং, এআই (AI), ডেটা সায়েন্স এবং পেশাদার বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে যুবসমাজ বিশ্ববাজারের উপযোগী হয়ে ওঠে। সমাজের বিত্তবান ও কৃতী ব্যক্তিত্বদের উদ্যোগে একটি শক্তিশালী **'পৌণ্ড্র মেধা তহবিল'** (Scholarship Fund) গড়ে তুলতে হবে, যাতে কোনো দরিদ্র অথচ প্রতিভাবান সন্তান অর্থের অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। শুধুমাত্র সরকারি চাকরির আশায় না থেকে ব্যবসা ও স্বনির্ভর উদ্যোগের (Entrepreneurship) দিকে ঝুঁকতে হবে। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, অর্গানিক ফার্মিং, কোল্ড স্টোরেজ নেটওয়ার্ক, মৎস্যচাষ (Blue Economy), এবং কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ করতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি গঠন করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা আবশ্যক। কোনো একক দলের অন্ধ সমর্থক না হয়ে নিজেদের যৌক্তিক দাবি ও স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। যোগ্য ও সৎ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতৃত্বকে তুলে ধরতে হবে, যাঁরা আইনসভা ও স্থানীয় প্রশাসনে সমাজের অধিকার ও হিন্দু স্বার্থের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর হবেন। বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা পৌণ্ড্র সংগঠনগুলিকে একটি অভিন্ন মহাজোট বা সমন্বয় পরিষদের অধীনে এনে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ব্যাধি, যেমন অতিরিক্ত পণপ্রথা, অপচয়, মাদকাশক্তি এবং পারিবারিক কলহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতামূলক আদালত ও কাউন্সিলিং সেল গঠন করা প্রয়োজন। কন্যাসন্তানদের উচ্চশিক্ষিত ও স্বনির্ভর করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত কোনো জাতির সার্বিক মুক্তি অসম্ভব। পরিবারে সনাতন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, চরিত্রগঠন এবং পৌণ্ড্র মনীষীদের জীবনের পাঠ চর্চা করতে হবে। মহেন্দ্রনাথ করণ, রাইচরণ সরদার, ভূষণচন্দ্র নস্কর প্রমুখ অগ্রদূতদের রচনাবলী সংরক্ষণ ও পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। প্রতিটি জেলায় পাঠাগার, আর্কাইভ এবং গবেষণা কেন্দ্রে পুস্তক ও পত্রিকা রেখে তরুণ প্রজন্মের কাছে

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সত্যিকারের ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস এক অপরাজেয় সংগ্রামের ইতিহাস। রক্ত, ঘাম এবং মাটির গভীর থেকে উঠে আসা এই শক্তি কখনো পরাজিত হতে পারে না। আজ প্রয়োজন কেবল আত্মবিস্মৃতির মোহভঙ্গ ঘটিয়ে নিজেদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করা। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যখন আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে শিক্ষা, অর্থ ও সংগঠনে শক্তিশালী হবে, তখন শুধু তাঁদের নিজস্ব সমাজেরই মুক্তি ঘটবে না, বরং সমগ্র হিন্দু সমাজ ও বাংলা এক অপরাজেয় শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমোঘ বাণীকে স্মরণ করে এগিয়ে আসতে হবে—"ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্য না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।" অতীত আমাদের প্রেরণা, বর্তমান আমাদের কর্মক্ষেত্র, আর ঐক্যবদ্ধ সনাতন সমাজ আমাদের ভবিষ্যৎ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নবজাগরণেই সমগ্র বাংলা নতুনরূপে গড়ে উঠুক। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এগিয়ে আসুন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ভারতের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি ও তাদেরকে একই সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা।

২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করা ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

৩। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি করা।

৪। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে "Payback to your Society"-এর ধারণা জাগ্রত করা।

৫। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনা বৃদ্ধির জন্য মেলার আয়োজন করা।

৬। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ আরও বৃদ্ধি করা।

৭। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের ধারণা জাগ্রত ও বর্ধিত করা।

৮। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতন করা। জাতপাত ও ধর্মের ব্যবধান মুছে ফেলা।

৯। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যুবদের নিয়ে **'পৌণ্ড্র সেনা'** গঠন এবং নারীদের নিয়ে একটি **'দেবী বাহিনী'** গঠন করা।

১০। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও আলোচনা সভাতে সামিল করা।

১১। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদর্শন।

১২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে এনে সাধ্যমত সমাধান বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

সবিনয় নিবেদন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ-এর **সবিনয় নিবেদন বিভাগে** চিঠি/পত্র প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক তাঁর মতামত জানাতে পারবেন। মতামত সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া চাই। এছাড়া পাঠক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক বা অন্য যে কোনও বিষয়ে এই বিভাগে মতামত জানাতে পারেন। লেখা ইমেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ-এ পাঠাতে হবে। ইমেলঃ poundrakshatriyadarpan@gmail.com
Whatsapp No: 9800296648

লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

- পত্রিকা সম্পাদক

'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি, বহুবিধ অর্থ ও ঐতিহাসিক বিবর্তন

- শ্রীপৌণ্ড্রক বাসুদেব

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য, মহাকাব্য ও লিপিতত্ত্বের ইতিহাসে **'পুণ্ড্র' (Pundra)** এবং তার তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত রূপ **'পৌণ্ড্র'** (Paundra) এক অসাধারণ বহুমাত্রিক শব্দ। সাধারণ পাঠে বা ঔপনিবেশিক জাতিতাত্ত্বিক বৃত্তে অনেক সময় শব্দটিকে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জনপদ বা একটি প্রাচীন কৌম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আকর গ্রন্থসমূহ নিবিড়ভাবে পাঠ করলে স্পষ্ট হয় যে, **'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্র'** শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত। **শব্দটি একই সঙ্গে বৈদিক ও মহাকাব্যিক ক্ষত্রিয় রাজবংশ, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে পাণ্ডববীর ভীমসেনের মহাশঙ্খ, সনাতন ধর্মসাধনায় কপালে ধারণীয় পবিত্র তিলক (ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র), প্রাচীন চিকিৎসা ও উদ্ভিদবিদ্যায় সর্বোৎকৃষ্ট ইক্ষু (পৌণ্ড্রক আখ), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত বিশ্ববিখ্যাত রেশম বস্ত্র (পৌণ্ড্রবস্ত্র) এবং পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম নগর ও সভ্যতার নাম।** এই শব্দটির প্রতিটি অর্থপ্রয়োগের গভীরে নিহিত রয়েছে শক্তি,

পবিত্রতা, উৎপাদনশীলতা এবং সার্বভৌম মর্যাদা।

সংস্কৃত শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে ‘পুণ্ড্র’ ও ‘পৌণ্ড্র’ শব্দের গঠন অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবার্থ সৃষ্টিশীল শক্তিমত্তার দ্যোতক।

পুষ্ (পোষণ করা / পরিবর্ধন করা) + রক্ = পুণ্ড্র ——(+ অণ্ তদ্ধিত প্রত্যয়)——> পৌণ্ড্র (পুণ্ড্রের সন্তান / ক্ষত্রিয় বীর)

পুণ্ড্ (পবিত্র করা / শক্তি প্রয়োগ) + অচ্ = পুণ্ড্র ——(+ অণ্ তদ্ধিত প্রত্যয়)——> পৌণ্ড্র (পবিত্রকারী / তেজস্বী)

প্রাচীন বৈয়াকরণ ও কোষকারগণ শব্দটির মূলে দুটি প্রধান ধাতুর নির্দেশ দিয়েছেন।

'পুষ্' ধাতু (পোষণ ও পরিবর্ধন অর্থে): সংস্কৃত পুষ্ ধাতুর উত্তর উণাদি 'রক্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পুণ্ড্র' শব্দ নিষ্পন্ন হয় ($পুষ্ + রক্ = পুণ্ড্র$)। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যিনি প্রজাকে পুষ্ট করেন, পালন করেন, রক্ষা করেন এবং সমৃদ্ধিকে বর্ধিত করেন। নৃপতি বা শাসকের ক্ষাত্রধর্মের (প্রজার সার্বিক সংরক্ষণ ও রাষ্ট্ররক্ষা) মূল দর্শনের সঙ্গে এই ধাত্বর্থ সরাসরি যুক্ত।

'পুণ্ড্' ধাতু (পবিত্রতা ও শক্তিমত্তা অর্থে): অপর ব্যাকরণিক মতানুসারে, পুণ্ড্ (পবিত্র করা, শক্তি প্রয়োগ করা বা চূর্ণ/নিষ্পেষণ করা) ধাতুর সঙ্গে 'অচ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পুণ্ড্র' গঠিত হয়। এর অর্থ যা নির্মল ও পাপমুক্ত করে কিংবা যা শত্রুর দম্ভ চূর্ণ করে।

তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে 'পৌণ্ড্র' শব্দের গঠনঃ 'পুণ্ড্র' শব্দের সঙ্গে স্বার্থে বা অপত্যার্থে (বংশধর বা অধিপতি অর্থে) তদ্ধিত প্রত্যয় 'অণ্' যুক্ত হয়ে গঠিত হয় 'পৌণ্ড্র' ($পুণ্ড্র + অণ্ = পৌণ্ড্র$)। পাণিনীয় ব্যাকরণ মতে এর একাধিক সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে:

অপত্যার্থে: পুণ্ড্রের সন্তান বা বংশধর (মহাভারত বর্ণিত বলিপুত্র পুণ্ড্রের বংশধরেরা)।

নিবাস বা অধিকার অর্থে: পুণ্ড্রদেশের অধিপতি বা সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী।

সম্বন্ধার্থে: পুণ্ড্র সম্পর্কিত যেকোনো বস্তু—যেমন পুণ্ড্রদেশের শঙ্খ, পুণ্ড্রদেশের ইক্ষু বা পুণ্ড্রদেশের বস্ত্র।

ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপান্তর (Phonetic Evolution): পুণ্ড্র থেকে আধুনিক 'পোদ'

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে শব্দটি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে:

$$\text{সংস্কৃত: পুণ্ড্র / পৌণ্ড্র} \longrightarrow \text{প্রাকৃত: পুণ্ড / পোণ্ড} \longrightarrow \text{অপভ্রংশ: পৌড়}$$

সংস্কৃতের যুক্তব্যঞ্জন 'ণ্ড্র'-এর প্রাকৃতায়ন এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় নাসিক্যধ্বনির সরলীকরণের মাধ্যমে 'পৌড়' শব্দের উদ্ভব। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১৯১৪) এবং সমাজসংস্কারক মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (১৯১৯) গ্রন্থে অকাট্য ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, **মধ্যযুগে ও ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত 'পৌড়' কোনো স্বতন্ত্র বা হীনার্থক শব্দ নয়, তা প্রাচীন গৌরবমণ্ডিত 'পৌণ্ড্র' শব্দেরই লোকায়ত বিবর্তিত রূপ।**

মহাকাব্যিক সমরতত্ত্ব: ভগবদ্গীতায় ভীমসেনের মহাশঙ্খ 'পৌণ্ড্র'- 'পৌণ্ড্র' শব্দের সামরিক ও ক্ষাত্র ঐতিহ্যের এক পরম গৌরবময় নিদর্শন পাওয়া যায় কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে। যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবশিবিরের প্রধান প্রধান বীরদের নিজ নিজ শঙ্খধ্বনির বিবরণে ব্যাসদেব পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় ভ্রাতা, অসীম বলশালী ভীমসেনের শঙ্খকে স্পষ্টভাবে 'পৌণ্ড্র' নামে অভিহিত করেছেন:

"পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ১, শ্লোক ১৫)

অনুবাদ: পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ‘পাঞ্চজন্য’, ধনঞ্জয় অর্জুন তাঁর ‘দেবদত্ত’ এবং ভয়ংকর কর্মকারী বৃকোদর ভীমসেন তাঁর ‘পৌণ্ড্র’ নামক মহাশঙ্খ বাজিয়েছিলেন।

'পৌণ্ড্র' শঙ্খের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যঃ

মহাশঙ্খের অভিধা: গীতায় অর্জুনের শঙ্খকে কেবল 'শঙ্খ' বলা হলেও ভীমের শঙ্খের বিশেষণ দেওয়া হয়েছে **'মহাশঙ্খ' (পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং)**। অর্থাৎ এটি ছিল আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং এর গর্জন ছিল বজ্রের ন্যায় গভীর ও ভয়াল।

শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণকারী শক্তি: গীতার পরবর্তী শ্লোকেই (১.১৯) বলা হয়েছে—সেই শঙ্খের মিলিত নির্ঘোষে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল (স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ)।

নামকরণের ঐতিহাসিক কারণ: বৈদিক ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুসারে, ভীমের এই শঙ্খটির নাম 'পৌণ্ড্র' হওয়ার কারণ—**এটি**

ছিল পুণ্ড্র দেশের শ্রেষ্ঠ সমুদ্রোপকূল বা বঙ্গোপসাগরের অববাহিকা থেকে সংগৃহীত এক অতি দুর্লভ, বৃহদাকার ও মহাশক্তিশালী শঙ্খ। দ্বিতীয়ত, ব্যুৎপত্তিগতভাবে যা শত্রুর অহংকার ও বাহিনীকে পেষণ বা দলিত করে (পুণ্ড্ ধাতু থেকে), সেই মহাশঙ্খই 'পৌণ্ড্র'। ভীমসেনের এই শঙ্খের নাম পৌণ্ড্র জাতির ক্ষাত্রশৌর্য ও অপরাজেয় রণহুঙ্কারের এক অবিনশ্বর পৌরাণিক স্মারক।

সনাতন ধর্মাচরণ ও আধ্যাত্মিক প্রতীক: তিলক অর্থে 'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্র' - হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থ ও উপনিষদে কপালে ও শরীরে অঙ্কিত পবিত্র ধর্মীয় চিহ্ন বা তিলককে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'পুণ্ড্র' (বা পৌণ্ড্র) বলা হয়। **এই চিহ্ন শরীরকে পাপমুক্ত, ইন্দ্রিয়কে সংযত এবং দেবভাবাপন্ন করার প্রতীক।** শাস্ত্রভেদে এটি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত:

ক. ঊর্ধ্বপুণ্ড্র (Urdhva-pundra)

বৈষ্ণব ঐতিহ্য: কপালে নাসিকাগ্র থেকে কেশমূল পর্যন্ত উল্লম্ব বা ঊর্ধ্বমুখী রেখায় যে তিলক চন্দন বা পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা অঙ্কন করা হয়, তাকে ‘ঊর্ধ্বপুণ্ড্র’ বলে। এটি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বা নারায়ণ-সান্নিধ্যের প্রতীক।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ: অথর্ববেদীয় বাসুদেবোপনিষদ্, পদ্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের বিধান বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাসুদেবোপনিষদে বলা হয়েছে, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণকারী ব্যক্তি পরম পবিত্র এবং সাক্ষাৎ শ্রীহরির আশ্রয়প্রাপ্ত।

খ. ত্রিপুণ্ড্র (Tripundra)

শৈব ও শাক্ত ঐতিহ্য: ললাটে ভস্ম বা চন্দন দ্বারা অনুভূমিকভাবে (Horizontal) টানা তিনটি সমান্তরাল রেখাকে বলা হয় ‘ত্রিপুণ্ড্র’।

তাৎপর্য: কালকাগ্নিরুদ্রোপনিষদ্ ও শিবপুরাণ অনুসারে, ত্রিপুণ্ড্রের তিনটি রেখা যথাক্রমে প্রণবের তিন মাত্রা (অ, উ, ম), গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি এবং সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের অতীত পরমেশ্বরের প্রতীক।

তিলক অর্থে পুণ্ড্র শব্দের গভীরার্থ - এখানে 'পুণ্ড্র' শব্দের মূল হলো পবিত্রতা বিধান করা। প্রাচীন সমাজে ক্ষত্রিয় বীরেরা সমরে যাওয়ার পূর্বে কপালে এই পুণ্ড্র তিলক ধারণ করতেন বিজয় ও আত্মরক্ষার প্রতীক হিসেবে। ফলে ধর্মাচরণে 'পুণ্ড্র' শব্দটি কোনো বিশেষ সংকীর্ণ অর্থ নয়, বরং সমগ্র সনাতন সংস্কৃতির অন্যতম পবিত্র ও রক্ষাকারী অঙ্গ।

উদ্ভিদতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি: 'পৌণ্ড্রক ইক্ষু' - প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সংস্কৃত অভিধানে 'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্রক' শব্দের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে কৃষিজ উৎপাদনে।

বাংলায় নদীমাতৃক পললভূমিতে উদ্ভাবিত এক বিশেষ জাতের উন্নত ইক্ষু প্রাচীন ভারতে এই নামে খ্যাত ছিল।

চরক ও সুশ্রুত সংহিতা (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক): প্রাচীন ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদাচার্য—মহর্ষি চরক তাঁর চরক সংহিতায় (সূত্রস্থান, ২৭তম অধ্যায়) এবং আচার্য সুশ্রুত তাঁর সুশ্রুত সংহিতায় (সূত্রস্থান, ৪৫তম অধ্যায়) বিভিন্ন প্রকার আখের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **‘পৌণ্ড্রক’ ইক্ষুকে সর্বশ্রেষ্ঠ** বলে ঘোষণা করেছেন। চরক সংহিতার মতে, পৌণ্ড্রক ইক্ষু রসায়নগুণসম্পন্ন, শীতল, সুমিষ্ট, বলবর্ধক এবং পিত্তনাশক।

অমরকোষ (ষষ্ঠ শতক): অমরসিংহ রচিত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ অমরকোষ-এর বনৌষধিবর্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে:

"পৌণ্ড্রকস্তু সিতেক্ষণৌ"

অর্থাৎ ‘পৌণ্ড্রক’ হলো উৎকৃষ্ট মিষ্টি শ্বেত ইক্ষু (White Sugarcane)।

কৃষি-ঐতিহাসিক তাৎপর্য: ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, **প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির মানুষই সর্বপ্রথম এই মিষ্টি আখের সফল চাষ ও তা থেকে গুড়-চিনি তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন।** এই কারণে আখের বৈজ্ঞানিক ও আঞ্চলিক নাম হয়ে যায় **'পুণ্ড্রক' বা 'পৌণ্ড্রক'।** এটি প্রাচীন বাংলায় পৌণ্ড্রদের অভূতপূর্ব কৃষি-প্রযুক্তিগত মেধার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

শিল্প ও বাণিজ্য: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'পৌণ্ড্রবস্ত্র' - খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মহামন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্য রচিত সুবিখ্যাত **অর্থশাস্ত্র** (দ্বিতীয় অধিকরণ, একাদশ অধ্যায়: 'কোষপ্রবেশ্য পরীক্ষা')-এ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্যাদির তালিকায় পুণ্ড্রদেশের বস্ত্রের বিশদ উল্লেখ রয়েছে।

পৌণ্ড্রক বস্ত্র ও ক্ষৌম বস্ত্র: কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন যে, বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশে প্রস্তুত বস্ত্র ছিল তৎকালীন ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট রেশম ও সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র **("পৌণ্ড্রকাঃ শ্যামা স্নিগ্ধাশ্চ" ইত্যাদি)**। পুণ্ড্রদেশে এক প্রকার বিশেষ পট্টকীট বা রেশমপোকা প্রতিপালন করা হতো, যা থেকে **'পৌণ্ড্রবস্ত্র' বা রেশমি কাপড়** তৈরি হতো। এই বস্ত্রের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা ছিল অতুলনীয়, যা রাজকীয় পোষাক হিসেবে মৌর্য রাজধানীতে রপ্তানি করা হতো। ফলে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি প্রাচীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নত বস্ত্রশিল্পের প্রতীক হিসেবে সমাদৃত ছিল।

পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ক্ষাত্র ঐতিহ্য: রক্ত ও শৌর্যের অবিচ্ছেদ্য ধারা - পৌণ্ড্র শব্দটির সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ভারতের এক দুর্দমনীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের ইতিহাস।

রাজা বলি ও রানি সুদেষ্ণা (মহর্ষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে পাঁচ পুত্র)

├─── অঙ্গ (অঙ্গ রাজ্য)

├─── বঙ্গ (বঙ্গ রাজ্য)

├─── কলিঙ্গ (কলিঙ্গ রাজ্য)

├─── পুণ্ড্র ──> পৌণ্ড্র রাজ্য (পুণ্ড্রবর্ধন) / পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

└─── সুহ্ম (সুহ্ম রাজ্য)

ক. মহাভারত ও পুরাণে ক্ষত্রিয় বংশপরম্পরা - মহাভারতের আদিপর্ব (১০৪তম অধ্যায়), হরিবংশ (৩১তম অধ্যায়) এবং মৎস্য পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, অসুররাজ বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচজন অমিততেজা পুত্রের জন্ম হয়—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

শাস্ত্রের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ: "বলেয়া ক্ষত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ"—অর্থাৎ বলির এই পাঁচ পুত্রই ছিলেন **জন্মসূত্রে স্বীকৃত ক্ষত্রিয়**। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম ছিল পুণ্ড্রদেশ। মহাভারতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে পুণ্ড্রের বংশধরেরাই হলেন 'পৌণ্ড্র'।

খ. সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মহাকাব্যিক পরাক্রম - মহাভারতের সভাপর্ব ও হরিবংশে বর্ণিত পুণ্ড্রদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন প্রাচীন বাংলার সার্বভৌম রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রথম ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবি। তিনি তৎকালীন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় যাদব শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব ভারতে এক প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর History of Ancient Bengal (১৯৭১) গ্রন্থে পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সপ্তম-অষ্টম শতকের বাঙালি দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের **"মহাকাব্যিক অগ্রদূত"** হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গ. মনুস্মৃতি ও মহাভারতে 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়' তত্ত্ব - মনুস্মৃতি (১০.৪৩–৪৪)-র বহুল আলোচিত শ্লোকটিতে সমাজপতি মনু স্বীকার করেছেন যে পৌণ্ড্ররা জাতিগতভাবে ক্ষত্রিয়:

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ..."

(বাংলা অনুবাদঃ "শাস্ত্রীয় বৈদিক ক্রিয়াকর্মের বিলোপ বা বর্জন এবং ব্রাহ্মণদের অনুশাসন ও পৌরোহিত্য গ্রহণ না করার কারণে জগতে এইসকল ক্ষত্রিয় জাতিসমূহ ক্রমশ 'বৃষলত্ব'

(বা ব্রাত্য/সংস্কারহীন অবস্থা) প্রাপ্ত হয়েছে—তাঁরা হলেন পৌণ্ড্রক (পৌণ্ড্র), ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ।")

মনুসংহিতার শ্লোকটিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। অর্থাৎ এই শ্লোকটি স্বীকার করে নিচ্ছে যে তালিকায় উল্লেখিত জাতিগুলি কোনো কৃত্রিম বর্ণসঙ্কর বা স্বভাবগতভাবে হীন কোনো সম্প্রদায় নয়; তাঁরা জন্মসূত্রে ও বংশানুক্রমিকভাবে **স্বীকৃত ক্ষত্রিয়**। পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব কোনো আধুনিক দাবি নয়, বরং প্রাচীন শাস্ত্রকাররা তাঁদের ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভূক্ত বলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা কখনোই শূদ্র ছিলেন না; **তাঁরা ছিলেন জন্মসূত্রে 'ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ'।** যেহেতু তাঁরা উত্তর ভারতের আর্য ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্য ও যাগযজ্ঞের বিধিনিষেধ মানেননি এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাই স্মার্ত সমাজপতিরা তাঁদের 'ব্রাত্য' বা ক্রিয়াহীন ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছিলেন। এটি মূলত পৌণ্ড্রদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতারই ঐতিহাসিক দলিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপিতাত্ত্বিক সত্য: পুণ্ড্রনগর থেকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি - পৌণ্ড্র শব্দের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপি (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক): ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী লিপিতে শহরটির নাম পাওয়া যায় 'পুডনগল' বা 'পুণ্ড্রনগর'। এটি প্রমাণ করে যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্র ছিল প্রাচীরবেষ্টিত এক সুসংগঠিত রাজধানী ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র।

দামোদরপুর ও খলিমপুর তাম্রশাসন (পঞ্চম থেকে নবম শতক): গুপ্ত ও পাল সম্রাটদের তাম্রশাসনে বাংলার বৃহত্তম প্রদেশটিকে বলা হয়েছে **'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'**। দশম শতকের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে দেখা যায়, এই ভুক্তির সীমানা দক্ষিণে সুন্দরবনের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যা প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রদের কর্মক্ষেত্র ও বসতি সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত ছিল।

দ্বাদশ শতকে সেন রাজাদের আমলে (বিশেষত বল্লাল সেনের সময়) যখন বাংলায় কট্টর বর্ণাশ্রম বলবৎ করা হয়, তখন স্বাধীনচেতা পৌণ্ড্রদের সামাজিক মর্যাদা হরণের অপচেষ্টা চলে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কৃত্রিম বর্ণসঙ্করের তালিকা তৈরি করে পৌণ্ড্রদের প্রান্তিক স্তরে

ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই আগ্রাসনের মুখে পৌণ্ড্রদের একটি বিরাট অংশ দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ও ভাটি অঞ্চলে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাঁরা লবণাক্ত জল ও বনাঞ্চলের সঙ্গে লড়াই করে নতুন ভূখণ্ড উদ্ধার করেন এবং নিজেদের সামরিক পাইক ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখেন। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক দক্ষিণ রায় ছিলেন এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সামরিক শৌর্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬–১৯২৮)-এর নেতৃত্বে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ তাদের হৃত ক্ষত্রিয় গৌরব ও আদি শাস্ত্রীয় পরিচয় পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯০১ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন করে তাঁরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নথিভুক্ত করতে সক্ষম হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ করণের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ প্রকাশিত হলে পৌণ্ড্রদের বৈদিক, মহাকাব্যিক ও লিপিতাত্ত্বিক ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য পুনরায় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের তফসিলি তালিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের এই ঐতিহাসিক নাম 'পৌণ্ড্র' (Paundra) হিসেবে স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করে।

'পৌণ্ড্র' ও 'পুণ্ড্র' শব্দের সামগ্রিক অর্থতালিকা

প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান, মহাকাব্য ও ইতিহাসগ্রন্থের আলোকে শব্দটির সমস্ত অর্থসংক্ষেপ:

রাজবংশ ও জাতি: প্রাচীন বলিপুত্র পুণ্ড্রের বংশধর; মহাভারত ও মনুস্মৃতি স্বীকৃত প্রাচীন ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় জাতি (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়)।

মহাশঙ্খ: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১.১৫) বর্ণিত পাণ্ডববীর ভীমসেনের মহাশঙ্খের নাম।

ধর্মীয় তিলক: কপালে ও ললাটে চন্দন বা ভস্ম দ্বারা অঙ্কিত পবিত্র রক্ষাচিহ্ন (ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র)।

কৃষিজ ফসল: চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতির মিষ্টি সাদা আখ (পৌণ্ড্রক ইক্ষু)।

বস্ত্র ও শিল্প: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত পুণ্ড্রদেশের উন্নতমানের রেশম বা ক্ষৌম বস্ত্র (পৌণ্ড্রবস্ত্র)।

নগর ও সাম্রাজ্য: খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মহাস্থান শিলালিপির 'পুণ্ড্রনগর' এবং গুপ্ত-পাল সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ প্রদেশ 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'।

উদ্ভিদ ও প্রতীক: প্রাচীন সংস্কৃত নিঘণ্টু অনুযায়ী রক্তপদ্ম বা শ্বেতপদ্ম (পুণ্ডরীক থেকে পুণ্ড্র) এবং রেশমপোকা (পট্টকীট)।

ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার নিরিখে এটি স্পষ্ট যে, **'পৌণ্ড্র' কোনো হীন বা অবহেলিত শব্দ নয়; এটি প্রাচ্য ভারতের প্রাচীনতম শৌর্য, ধর্মবোধ, প্রযুক্তি ও সভ্যতার এক অখণ্ড সমন্বয়। কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে ভীমের মহাশঙ্খের গর্জনে যে 'পৌণ্ড্র' ধ্বনিত হয়েছিল, চরক-সুশ্রুতের চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে 'পৌণ্ড্রক' শ্রেষ্ঠ পুষ্টিদাতা ইক্ষু হিসেবে বন্দিত হয়েছিল, সনাতন সাধনায় যে 'পুণ্ড্র' কপালে ধারণ করে মানুষ পরম পবিত্রতা অর্জন করত—সেই একই রক্তধারা ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছেন আজকের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ।** মধ্যযুগের রক্ষণশীল সমাজপতিরা তাঁদের যতই প্রান্তিক করার চেষ্টা করুক না কেন, শিলালিপি ও মহাকাব্যের অবিনশ্বর সাক্ষ্যে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি বাংলার আদি রাষ্ট্রনির্মাতা ও ক্ষত্রিয় বীর্যের এক চিরভাস্বর প্রতীক হয়ে চিরকাল বিরাজ করবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Basak, Radhagovinda. "The Five Damodarpur Copper-plate Inscriptions of the Gupta Period." Epigraphia Indica, vol. 15, 1919–1920, pp. 113–145.

২. Bhandarkar, Devadatta Ramakrishna. "Mausthan Brahmi Inscription." Epigraphia Indica, vol. 21, 1931–1932, pp. 83–91.

৩. Charaka. The Charaka Samhita: Expounded by the Worshipful Atreya Punarvasu. Edited and translated by P. V. Sharma, vol. 1, Chaukhambha Orientalia, 1981.

৪. Chatterji, Suniti Kumar. The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta University Press, 1926.

৫. Kangle, R. P., editor and translator. The Kautiliya Arthasastra: An English Translation with Critical and Explanatory Notes. Part 2, University of Bombay, 1972.

৬. Karan, Mahendranath. A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods: Their Status, Ways of Life and Social Manners and Customs. Diamond Harbour, 1919.

৭. Karan, Mahendranath. Paundra Kshatriya Kulapradeep. Paundra Kshatriya Samiti, 1926.

৮. Majumdar, Ramesh Chandra. History of Ancient Bengal. G. Bharadwaj & Co., 1971.

৯. Majumdar, Ramesh Chandra. editor. The History of Bengal, Vol. 1: Hindu Period. University of Dacca, 1943.

১০. Mitra, Satish Chandra. Jashohar-Khulnar Itihas. 1914. Reprint, edited by Shibshankar Mitra, Dey's Publishing, 2001.

১১. O'Malley, Lewis Sydney Steward. Census of India, 1911: Volume V, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Part I, Report. Bengal Secretariat Book Depot, 1913.

১২. Radhakrishnan, Sarvepalli, translator. The Bhagavadgita: With an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes. George Allen & Unwin Ltd., 1948.

১৩. Ray, Niharranjan. Bangalir Itihas: Adiparba. 1949. 3rd ed., Dey's Publishing, 1400 BS [1993].

১৪. Sushruta. An English Translation of the Sushruta Samhita. Translated by Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, vol. 1, Calcutta, 1907.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।



বৈদিক সাহিত্যে পৌণ্ড্র

- শ্রীআত্মবান বৈদ্য

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মানচিত্রে 'পৌণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্র' জনপদ এবং তার অধিবাসীদের ভূমিকা কেবল ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বৈদিক সাহিত্যের এক সুবিশাল আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিবর্তনের আখ্যান। বৈদিক ঐতিহ্যের পরিধিতে পৌণ্ড্রদের উপস্থিতি একদিকে যেমন আর্য সংস্কৃতির ভৌগোলিক সীমানার ব্যপকতার সংকেত দেয়, অন্যদিকে তেমনি মহান ঋষিকুলের উত্তরাধিকার ও বৈদিক জ্ঞানচর্চার এক মহতী ধারার সাক্ষ্য বহন করে। একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, **পৌণ্ড্ররা প্রাচীন আর্যাবর্তের মূলধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং তাদের এই সংযোগ বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।**

পৌণ্ড্রদের সম্পর্কে প্রাচীনতম ও সর্বাধিক প্রামাণ্য তথ্যের উৎস হলো ঋগ্বেদের সাথে সম্পর্কিত **'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'**। এই গ্রন্থটি বৈদিক সাহিত্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে কারণ এটি কেবল যজ্ঞীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ দেয় না, বরং বৈদিক সমাজের সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের এক নৃতাত্ত্বিক দলিল হিসেবেও কাজ করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম

পঞ্চিকার অষ্টাদশ অধ্যায়ে (VII. 18) পৌণ্ড্রদের উৎপত্তি ও তাদের আর্য আভিজাত্যের বিষয়ে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিবরণ অনুযায়ী, পৌণ্ড্ররা হলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সরাসরি বংশধর। বিশ্বামিত্র, যিনি স্বয়ং একজন ক্ষত্রিয় হয়েও কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মর্ষি পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁর একশত এক জন পুত্রের কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই পুত্রদের মধ্যে পঞ্চাশ জন ছিলেন মধচ্ছন্দার চেয়ে বয়সে বড় এবং পঞ্চাশ জন ছিলেন ছোট। পৌণ্ড্রদের ইতিহাস এই জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্রের সাথে যুক্ত। ঋষি **অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপকে** যখন বিশ্বামিত্র দত্তক গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তাঁর বংশের জ্যেষ্ঠতা প্রদান করতে চান, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। এই অবাধ্যতার কারণে বিশ্বামিত্র তাঁদের অভিশাপ দেন যে, তাঁদের উত্তরপুরুষরা আর্যাবর্তের প্রান্তসীমায় বসবাস করবে। এই অভিশপ্ত পুত্রদের থেকেই অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মূতিব জাতির উদ্ভব ঘটে। মার্টিন হগ তাঁর ১৮৬৩ সালের অনুবাদে এবং আর্থার বেরিডেল কিথ ১৯২০ সালের ভাষ্যে এই ঘটনাটিকে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসারের একটি মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একাডেমিক দৃষ্টিতে দেখলে, পৌণ্ড্ররা কোনো অখ্যাত বা অনার্য গোষ্ঠী নয়, বরং তারা সরাসরি এক মহান বৈদিক ঋষির রক্তজাত সন্তান, যা তাদের জন্মগত আভিজাত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ঐতিহাসিক জি. দত্ত (২০২৩) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, পৌণ্ড্রদের এই বিস্তৃতি আসলে আর্য সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিজয়ের একটি প্রাথমিক স্তর ছিল। তারা আর্যদের অবশিষ্টাংশ হিসেবে পূর্ব ভারতে এক নতুন সভ্যতার ভিত গড়ে তুলেছিলেন। পৌণ্ড্ররা বৈদিক সংস্কৃতির সেই অগ্রগামী সেনানী ছিলেন যারা গঙ্গা উপত্যকার সুদূর প্রান্তে আর্য জীবনচর্যাকে ধারণ, রক্ষা ও প্রসার করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পরবর্তী স্তর হিসেবে **'ঐতরেয় আরণ্যক' পৌণ্ড্রদের** সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানকে আরও সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আরণ্যকের প্রথম অধ্যায়ে (২.১.১) বঙ্গ ও মগধের (বাগধ) সাথে পৌণ্ড্রদের নাম একীভূতভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে এই অঞ্চলের মানুষকে **"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"** বলে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ হলো—বঙ্গ, বাগধ এবং চের জাতির লোকেরা পক্ষীর ন্যায় চঞ্চল ও প্রগতিশীল। যদিও সরাসরি পৌণ্ড্র শব্দটি এখানে কখনও কখনও উহ্য থাকে, তবে তৎকালীন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে পৌণ্ড্ররা এই সাংস্কৃতিক মণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আর্থার বেরিডেল কিথ (১৯০৯) তাঁর অনুবাদে উল্লেখ করেছেন যে, এই 'পক্ষী' প্রতীকটি আসলে সেই সকল মানুষের তেজস্বিতা ও বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি তাদের অদম্য আগ্রহকে নির্দেশ করে যারা আর্যাবর্তের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে থেকেও নিজেদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছিল। এই আরণ্যক

গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে, তারা কেবল ব্রাত্য বা বহিষ্কৃত জনপদ ছিল না, বরং আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় রহস্যের ক্ষেত্রেও তাদের জীবনচর্যা বৈদিক ঋষিদের গভীর আলোচনার বিষয় ছিল। তাদের এই প্রগতিশীল মানসিকতা পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গকে একটি শক্তিশালী জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল।

পৌণ্ড্রদের বৈদিক ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় ও অকাট্য প্রমাণ হলো **যজুর্বেদের শাখা সমূহের মধ্যে 'পৌণ্ড্র-বৎস'** (Paundra-Vatsa) শাখার অস্তিত্ব। শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতার অন্যতম শাখা হিসেবে এটি স্বীকৃত এবং এটি পৌণ্ড্রদের পাণ্ডিত্যের এক অনন্য নিদর্শন। **মহর্ষি শৌনকের 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে** শুক্ল যজুর্বেদের যে পনেরোটি শাখার তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে **'পৌণ্ড্র-বৎস'** শাখার নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং বায়ু পুরাণেও এই শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা এই অঞ্চলের বৈদিক বিদ্যাচর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়। **পণ্ডিত ভগবদ্দত্তের মতে, পৌণ্ড্র জনপদের অধিবাসী হওয়ার কারণে জনৈক 'বৎস' ঋষি বা তাঁর বংশধরদের দ্বারা এই শাখাটি প্রবর্তিত হয়েছিল বলে এর নাম হয় 'পৌণ্ড্র-বৎস'। এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক তথ্য যে, পূর্ব ভারতের এই জনপদ কেবল যজ্ঞের মাঠ ছিল না, বরং তাদের নিজস্ব বৈদিক পাঠ পদ্ধতি, সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি এবং শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ ছিল।** যদিও এই শাখার মূল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, তবুও বৈদিক তালিকার এই অন্তর্ভুক্তি পৌণ্ড্রদের শাস্ত্রীয় যোগ্যতার চূড়ান্ত স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হয়। পৌণ্ড্র-বৎস শাখার এই অবস্থান প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্র জনপদের মানুষেরা অত্যন্ত উচ্চমানের শাস্ত্রীয় চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তারা বৈদিক সংহিতার রক্ষক হিসেবে কাজ করতেন।**

উপনিষদীয় সাহিত্যে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি সরাসরি এবং প্রতীকী—উভয় অর্থেই গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। একদিকে এটি যেমন একটি পবিত্র তিলক বা ধর্মীয় চিহ্ন হিসেবে পরিচিত, অন্যদিকে বিভিন্ন উপনিষদে এর আধ্যাত্মিক ও যোগতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বৈষ্ণব উপনিষদ সমূহে, বিশেষত **'বাসুদেব উপনিষদ' এবং 'ব্রহ্ম উপনিষদ'-এ 'পুণ্ড্র' বা 'ঊর্ধ্বপুণ্ড্র'** (Urdhva Pundra) **ধারণের বিধান দেওয়া হয়েছে।** ঊর্ধ্বপুণ্ড্র হলো কপালে চন্দনের বা পবিত্র মৃত্তিকার উল্লম্ব দাগ, যা ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। উপনিষদীয় দর্শনে বলা হয়েছে যে, **পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র চিহ্ন ধারণকারী ব্যক্তি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র হন।** এটি কেবল একটি লৌকিক চিহ্ন নয়, বরং এটি সাধকের বৈদিক নিষ্ঠা এবং পরমাত্মার প্রতি সমর্পণের একটি দৃশ্যমান রূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে আত্মশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে, **'পুণ্ড্র' ধারণ তার একটি প্রয়োগমূলক আধ্যাত্মিক পদ্ধতি। এখানে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি সরাসরি আধ্যাত্মিক শোধনের সাথে সম্পর্কিত, যা পৌণ্ড্র জনপদের**

নামকে এক অনন্য পবিত্রতা প্রদান করেছে এবং পৌণ্ড্রদের আর্য দাবীকে অত্যন্ত জোরালোভাবে মজবুত করেছে।

অথর্ববেদের সাথে সম্পৃক্ত 'গরুড় উপনিষদ' (Garuda Upanishad) একটি অত্যন্ত রহস্যময় ও শক্তিশালী শাস্ত্র। এই উপনিষদে সর্পের বিষ ও নেতিবাচক শক্তি থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রের উল্লেখ আছে। কৌতূহলোদ্দীপকভাবে, এই তালিকায় অন্যতম শক্তিশালী নাগের নাম হিসেবে 'পৌণ্ড্র' (Paundra) উল্লেখ করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক ও যোগতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে, পৌণ্ড্র এখানে কুণ্ডলিনী শক্তি বা সুপ্ত প্রাণশক্তির আধার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। গরুড় মন্ত্রের মাধ্যমে এই 'পৌণ্ড্র' শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হলো নিজের রিপু ও অজ্ঞানতাকে জয় করা। পল ডিউসেন (১৮৯৭) এই উপনিষদটিকে প্রাকৃতিক ও মানসিক শক্তির ওপর মানুষের আধ্যাত্মিক বিজয়ের আখ্যান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটি পৌণ্ড্রদের নামের সাথে জড়িত এক মহান তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা যা তাদের বৈদিক সাহিত্যে এক অপরাজেয় শক্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে।

শুক্ল যজুর্বেদের সাথে যুক্ত 'শতপথ ব্রাহ্মণ' বৈদিক সাহিত্যের এক বিশাল স্তম্ভ। এই গ্রন্থে বিদেহ (মিথিলা) এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আর্যদের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা পৌণ্ড্রদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা অনুযায়ী, বিদেঘ মাথব এবং তাঁর পুরোহিত গৌতম রাহুগণ সরস্বতী নদী থেকে পূর্ব দিকে যজ্ঞের আগুন (অগ্নি বৈশ্বানর) নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা সদানীয়া (আধুনিক করতোয়া বা গণ্ডকী) নদীর তীরে এসে উপনীত হন। এই করতোয়া নদীই ছিল প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব সীমানা। শতপথ ব্রাহ্মণের এই পবিত্র আখ্যানটি নির্দেশ করে যে, **পৌণ্ড্র অঞ্চলটি বৈদিক যজ্ঞের আগুনের ছোঁয়ায় ধন্য হয়েছিল। রাজা বিদেঘ মাথবের এই অগ্রযাত্রা আসলে ছিল পৌণ্ড্র জনপদে বৈদিক সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পৌণ্ড্ররা এই যজ্ঞীয় ধারাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে তারা নিজেরাই বৈদিক যাগযজ্ঞ ও কৃষিব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। করতোয়া নদীর পবিত্রতা বৈদিক সাহিত্যে পৌণ্ড্রদের আধ্যাত্মিক মহিমাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।**

অথর্ববেদে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভেষজ গুণাবলির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। পৌণ্ড্র জনপদটি প্রাচীনকাল থেকেই তার বিশেষ ধরণের ইক্ষু বা আখের জন্য বৈদিক সমাজে সুপরিচিত ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, **'পৌণ্ড্র' শব্দটির অর্থ 'আখ' (Sugarcane)।** অথর্ববেদে বর্ণিত উন্নত মানের ইক্ষু চাষের কৌশল পৌণ্ড্ররাই আর্যাবর্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বিশেষ জাতের আখের নাম থেকেই তাদের জনপদের নাম 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' হয়েছে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। এটি তাদের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক

অর্থনৈতিক পরিচয় প্রদান করে। বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত মিষ্টি রস ও চিনি সরবরাহের ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রদের অবদান অনস্বীকার্য ছিল। পৌণ্ড্রদের এই কৃষি নৈপুণ্য তাদের কেবল একটি জনপদ হিসেবে নয়, বরং বৈদিক ভারতের খাদ্য ও সম্পদ ভাণ্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বৈদিক উত্তরকালীন সাহিত্য হলেও **'ভগবদ্গীতা'** উপনিষদের নির্যাস হিসেবে পরিচিত **(গীতোপনিষদ)**। গীতায় পাণ্ডব বীর **ভীমসেনের শঙ্খের নাম হিসেবে 'পৌণ্ড্র' (Paundra) শব্দটি পাওয়া যায়। গীতার প্রথম অধ্যায়ের ১৫ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে— "পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ" অর্থাৎ ভয়ানক কর্মকারী ভীমসেন তাঁর 'পৌণ্ড্র' নামক মহাশঙ্খ বাজালেন।** বৈদিক দর্শনে শঙ্খধ্বনিকে 'ওঁ' কার বা নাদ ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। ভীমসেনের শঙ্খের নাম **'পৌণ্ড্র'** হওয়াটি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এটি পৌণ্ড্র জনপদের শৌর্য, বীরত্ব এবং শক্তির প্রতীক। শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়, **পৌণ্ড্র শঙ্খ হলো সেই মহান ধ্বনি যা অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের জয় ঘোষণা করে। বৈদিক যজ্ঞে যেমন শঙ্খধ্বনি অশুভ শক্তিকে দূর করে, ভীমসেনের পৌণ্ড্র শঙ্খও তেমনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। এটি পৌণ্ড্রদের নামকে বীরত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করেছে।**

সামবেদ হলো সুর ও তালের বেদ। যদিও সামবেদে পৌণ্ড্রদের নিয়ে সরাসরি বর্ণনা সীমিত, তবে এর সাথে যুক্ত **'তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ'-এ (Tandya Mahabrahmana) বৎস ঋষির** যে কাহিনী পাওয়া যায়, তা পৌণ্ড্রদের বৈদিক গীতিচর্চার দিকে ইঙ্গিত করে। **বৎস ঋষি, যিনি পৌণ্ড্র-বৎস শাখার মূল পুরুষ ছিলেন, তাঁর অগ্নির ওপর দিয়ে হাঁটার পরীক্ষা (Fire-ordeal) এবং সামগানের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভের ঘটনাটি বৈদিক সাহিত্যে অত্যন্ত বিখ্যাত।** এটি প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্র অঞ্চলের মানুষেরা সামবেদের সুর ও ছন্দের ওপর অসামান্য অধিকার রাখতেন।** সামবেদের বিভিন্ন স্তোত্র এই অঞ্চলের মানুষের কণ্ঠে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল, যা পরবর্তীতে পূর্ব ভারতের ধ্রুপদী সংগীতের ভিত্তি স্থাপন করে ।

বৈদিক যুগে পৌণ্ড্ররা যে একটি সুশৃঙ্খল ও বীরত্বপূর্ণ জাতি ছিল, তার উল্লেখ বিভিন্ন ঋষি-গাথায় পাওয়া যায়। যদিও তাদের ওপর অভিশাপের কথা বলা হয়েছে, তবে সেই অভিশাপই তাদের পূর্ব ভারতে বৈদিক ধ্বজা বহনকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল।

পৌণ্ড্ররা পুরোপুরি বৈদিক আর্য বর্ণাশ্রমের অংশ ছিল। বিশ্বামিত্রের ঋষিকুলের রক্ত তাদের মূলে থাকায় তারা অত্যন্ত দ্রুত বৈদিক আভিজাত্যকে প্রসার করতে সক্ষম হয়। **আধুনিক ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এবং ও'ম্যালি পৌণ্ড্রদের উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম**

ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যারা বৈদিক যুগের কৃষি ও স্থাপত্যে অসামান্য অবদান রেখেছিল।

পৌণ্ড্রদের প্রধান নগরী ছিল 'পৌণ্ড্রবর্ধন' বা 'পুণ্ড্রনগর' (বর্তমান মহাস্থানগড়)। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্বে এটি একটি বিশাল বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। **'পৌণ্ড্রবর্ধন' নামের মধ্যেই 'বর্ধন' বা বৃদ্ধির বিষয়টি জড়িয়ে আছে—অর্থাৎ যেখানে বৈদিক জ্ঞান ও পুণ্যকর্মের নিরন্তর বৃদ্ধি ঘটে। বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং যজ্ঞীয় ঐতিহ্যের প্রসারের ফলেই এই নগরীটি উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠগুলোর সমান্তরালে নিজের স্থান করে নিয়েছিল।** বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থানের বহু আগেই পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল বৈদিক মানুষদের (পৌণ্ড্রদের) বিচরণক্ষেত্র এবং শুক্ল যজুর্বেদের চর্চাকেন্দ্র।

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরে পৌণ্ড্রদের ক্রমবিবর্তন ও বিশিষ্ট অবস্থান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আদি বৈদিক যুগে রচিত **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ**-এ পৌণ্ড্রদের মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঋষি বংশধারা হিসেবে উল্লেখ করে প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী মধ্য বৈদিক যুগে **শতপথ ব্রাহ্মণ**-এর বিবরণে দেখা যায়, আর্যাবর্তের পূর্ব সীমানায় বৈদিক সংস্কৃতি ও যজ্ঞাগ্নি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতি।

উত্তর বৈদিক যুগে পৌণ্ড্রদের এই ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়; শৌনক প্রণীত **'চরণব্যূহ'** গ্রন্থে নিজস্ব যজুর্বেদীয় শাখা হিসেবে **'পৌণ্ড্র-বৎস'** শাখার প্রবর্তনের প্রমাণ মেলে। সবশেষে উপনিষদীয় যুগে **বাসুদেব উপনিষদ** ও **গরুড় উপনিষদ**-এর মতো ধর্মগ্রন্থগুলোতে পৌণ্ড্র পরিচয় বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক গভীর দার্শনিক রূপ ধারণ করে, যেখানে **'উর্ধ্বপুণ্ড্র'** তিলক একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ঐতিহাসিক বিবর্তনই প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্ররা আর্য এবং প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় সমৃদ্ধির অংশীদার ছিল।**

সামগ্রিক পর্যালোচনায় এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, **বৈদিক সাহিত্যে পৌণ্ড্রদের স্থান কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং তা অত্যন্ত ইতিবাচক ও গৌরবোজ্জ্বল।** ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিশ্বামিত্র আখ্যান তাদের একটি পবিত্র ও প্রাচীন ঋষি বংশপরম্পরার সাথে যুক্ত করে, যা তাদের সামাজিক আভিজাত্যের মূল ভিত্তি। শুক্ল যজুর্বেদের **'পৌণ্ড্র-বৎস'** শাখার অস্তিত্ব এবং চরণব্যূহের স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্ররা কেবল বৈদিক সংস্কৃতির অনুসারী ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন বৈদিক সাহিত্যের স্রষ্টা ও সংরক্ষক।**

উপনিষদীয় ধারায় **'পুণ্ড্র'** শব্দটির আধ্যাত্মিক ও তান্ত্রিক ব্যবহার এই জনপদের মানুষের আত্মিক ও যোগতাত্ত্বিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়। করতোয়া নদীর তীরে সদানীয়া

অগ্নির স্পর্শে যে সভ্যতার পুনঃজাগরণ ঘটেছিল, পৌণ্ড্ররা ছিল তার প্রধান কারিগর। তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (ইক্ষু ও রেশম চাষ) এবং সামরিক ও আধ্যাত্মিক শৌর্য (ভীমের পৌণ্ড্র শঙ্খ) বৈদিক ভারতের মানচিত্রকে এক পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছিল।

সুতরাং, পৌণ্ড্রদের বৈদিক ইতিহাস কেবল প্রান্তিকতার ইতিহাস নয়; এটি হলো সমন্বয়, প্রগতি এবং ঋষি-পরম্পরার এক অনন্য বিজয়ের আখ্যান। প্রাচীন ঋষিদের দৃষ্টিতে পৌণ্ড্ররা ছিলেন সেই **'পূর্বসূর্য'** যারা আর্যাবর্তের পূর্ব দিগন্ত থেকে বৈদিক সভ্যতার আলোক রশ্মিকে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন এবং সহস্রাব্দ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাও সেই বৈদিক আর্য উত্তারিধিকার বহন করে চলেছেন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্র

শ্রী বাসুদেব বৈদ্য

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মানচিত্রে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক অনন্য ও অপরিহার্য আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ঋগ্বেদের শৌনক শাখার সাথে সম্পৃক্ত এই ব্রাহ্মণটি কেবল যাগযজ্ঞের বিধিবদ্ধ সংকলন নয়, বরং এটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যাবর্তের পূর্ব সীমান্ত ও সংলগ্ন জনজাতিগুলোর প্রথম প্রামাণিক দলিল হিসেবে ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই মহতী গ্রন্থের আলোচনায় 'পৌণ্ড্র' জাতির উল্লেখ প্রাচীন বাংলার তথা সামগ্রিকভাবে পূর্ব ভারতের ইতিহাসের আদি সোপান নির্মাণ করে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হলো ঋগ্বেদের হোতৃ-শ্রেণীর ঋত্বিকদের জন্য সংকলিত একটি ধর্মীয় ও দার্শনিক নির্দেশিকা। প্রাচীন ঐতিহ্যে এর গুরুত্ব এতটাই অপরিসীম যে, একে বেদের সারমর্ম হিসেবে গণ্য করা হতো। **সায়নাচার্য তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাষ্য' উপক্রমণিকায় এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে মহিদাস ঐতরেয়র নাম উল্লেখ করেছেন।** সায়নাচার্যের বিবরণ অনুসারে, মহিদাস ছিলেন জনৈক ঋষির পত্নী 'ইতরা'র পুত্র। সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে (সায়ণাচার্য, 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাষ্য', আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, ১৯০০, পৃষ্ঠা ১-৫)

উল্লেখ করেছেন যে, মহিদাস তাঁর মাতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে তপস্যার মাধ্যমে পৃথিবীর বর লাভ করেন এবং এই ব্রাহ্মণের জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

এই গ্রন্থের গঠনশৈলী অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। এটি আটটি 'পঞ্চিকা'য় বিভক্ত, যার প্রতিটি পঞ্চিকায় পাঁচটি করে 'অধ্যায়' রয়েছে, অর্থাৎ মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ৪০টি। প্রতিটি অধ্যায় আবার অসংখ্য 'খণ্ড' বা অনুচ্ছেদে বিভক্ত, যার মোট সংখ্যা ২৮৫টি । এই সুদীর্ঘ কলেবরের মধ্যে সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয় অধ্যায়েই মূলত পৌণ্ড্রদের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে, যা বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকাল নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক বিদ্যমান। এই বিতর্কের নিরসন করা প্রয়োজন কারণ পৌণ্ড্রদের প্রথম উল্লেখের সময়কাল নির্ধারণের ওপরই বাংলার আদি ইতিহাসের ভিত্তি নির্ভর করে। বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা বর্তমানে মহাভারতের যুদ্ধের কাল হিসাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দকে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ে বেদ বিভক্ত হয় অর্থাৎ তাঁর আগেই বেদ রচিত হয়। বেদবীর আর্য কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ "The Chronology of India: From Manu To Mahabharata" গ্রন্থে বৈদিক যুগের কালসীমা নির্দেশ করা হয়েছে ১৪৫০০ থেকে ১০৫০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দ। তার আগে বেদ শুনে শুনে মনে রাখা হত। ফলে বেদ আরও আগে রচিত হয়। সেইসূত্রে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকাল প্রায় ১৬০০০ হাজার বছরের পুরানো এবং **পৌণ্ড্ররা ১৬০০০ হাজার বছরের একটি পুরানো জাতি বা সম্প্রদায়। কারণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ আছে।**

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার ৩৩.৬ খণ্ডে (বা ৭.১৮) **শুনঃশেপ** নামক এক বালকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যা পৌণ্ড্রদের ইতিহাসের জন্য এক অনন্য দলিল। উপাখ্যানটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এর সমাপ্তি ঘটে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের একশত এক জন পুত্রের বংশপরিচয় ঘোষণার মাধ্যমে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন শুনঃশেপকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তাকে **'দেবরাত'** নাম দিয়ে বংশের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, তখন তাঁর **জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ জন পুত্র এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। ক্রুদ্ধ মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন তাঁর সেই অবাধ্য পুত্রদের অভিশাপ দেন যে, তাদের বংশধররা আর্যাবর্তের প্রান্তসীমায় বসবাস করবে এবং তথাকথিত 'অন্তজ' শ্রেণীতে পরিণত হবে।**

এই অভিশপ্ত সন্তানদের থেকেই অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিবদের উৎপত্তি হয়েছে বলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে । শ্লোকাংশটি নিম্নরূপ:

"ত উদেতবা এতেহন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা ভবন্তি বহবো বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ"।

("তাঁরাই হলেন এই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতীব জাতি—যাঁরা সীমার প্রান্তে (আর্যাবর্তের বাইরে সীমান্ত অঞ্চলে) বাস করেন; দস্যুদের (অনার্য বা অন্ত্যজদের) অধিকাংশই বিশ্বামিত্রের বংশধর।")

এই বিবরণটি যদিও আপাতদৃষ্টিতে একটি অভিশাপের কাহিনী, কিন্তু ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এর একটি গভীর ইতিবাচক দিক রয়েছে। আর. সি. মজুমদার তাঁর 'The History of Bengal, Volume 1: Hindu Period' (The University of Dacca, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৮-১০) গ্রন্থে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, **এই কাহিনীটি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্ররা আদতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের রক্তজাত অর্থাৎ আর্য বংশের একটি শাখা ছিল। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণে তারা প্রধান স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের জাতিগত মূল (Ethnic core) ছিল উচ্চমার্গীয় বৈদিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত।** ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্রদের 'দস্যু' বলা হয়েছে। **প্রাচীন বৈদিক পরিভাষায় 'দস্যু' শব্দটির অর্থ কেবল শত্রু বা দস্যু নয়, বরং যারা বৈদিক যজ্ঞীয় সংস্কৃতির বাইরে ছিল বা যারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলত, তাদেরই এই অভিধা দেওয়া হতো।** নীহাররঞ্জন রায় তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস: আদি পর্ব' (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৬১-৭৬৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আর্যরা যখন নতুন অঞ্চলে প্রবেশ করত, তখন সেখানকার আদিবাসীদের সাথে তাদের সংঘাত ও মিলনের একটি পর্যায় চলত। পৌণ্ড্রদের বিশ্বামিত্রের সন্তান হিসেবে বর্ণনা করার মাধ্যমে আসলে তাদের বৈদিক সমাজের একটি **'বিচ্ছিন্ন কিন্তু রক্তসম্পর্কিত'** অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিবরণ অনুসারে পৌণ্ড্ররা ভারতের পূর্বপ্রান্তে (উদন্ত্যা) বসবাস করত। এই ভৌগোলিক নির্দেশিকাটি আধুনিক ঐতিহাসিকদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। গৌরব দত্ত তাঁর গবেষণাপত্র 'Rise and Growth of Pundravardhana: A Study on 5th Century B.C.E to 5th Century A.D' (Journal of Historical Studies and Research, ২০২৩, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭) এ উল্লেখ করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা মূলত উত্তরবঙ্গের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত

পলল সমভূমিতে তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা ছিল প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক দ্বারা সুসংজ্ঞায়িত, যা আর. সি. মজুমদার তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পৌণ্ড্রবর্ধনের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নদীসমূহের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

পূর্ব সীমানা: করতোয়া নদী ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব সীমা, যা এই অঞ্চলকে কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য থেকে পৃথক করেছিল ।

উত্তর-পশ্চিম সীমানা: কৌশিকী নদী (বর্তমান কোশি) হিমালয়ের বরাহ ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে এই অঞ্চলের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমানা নির্ধারণ করত।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা: গঙ্গা নদী পৌণ্ড্রবর্ধনকে দক্ষিণ ও পশ্চিমের অঙ্গ এবং মগধ অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

এই সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানটি প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্ররা কেবল একটি যাযাবর উপজাতি ছিল না, বরং তারা একটি সুসংহত ভূখণ্ডে তাদের শাসন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্রদের যে অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক সত্যতা পরবর্তীতে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে **বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে তাঁর ভ্রমণ প্রতিবেদনে মহাস্থানগড়কেই প্রাচীন 'পুণ্ড্রনগর' বা পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী হিসেবে শনাক্ত করেন।** মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহ প্রমাণ করে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগে যে পৌণ্ড্রদের কথা বলা হয়েছিল, তারা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এক অকল্পনীয় সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। **১৯৩১ সালে মহাস্থানগড়ের একটি ঢিবি থেকে একটি ক্ষুদ্র চুনাপাথরের ফলক আবিষ্কৃত হয়। এটি প্রাচীন বাংলার তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম লিখিত প্রমাণ হিসেবে গণ্য।** এই শিলালিপিটি প্রাকৃত ভাষায় এবং মৌর্য আমলের ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই করা। ড. সুস্মিতা বসু মজুমদার তাঁর 'Mahasthan Record Revisited: Querying the Empire from a Regional Perspective' (Indian Museum, ২০১৬) গ্রন্থে এই লিপিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। শিলালিপিটিতে উল্লেখ আছে যে, পুণ্ড্রনগরের **'মহামাত্র' (প্রাদেশিক প্রশাসক)** তাঁর অধীনস্থদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন দুর্ভিক্ষ বা কোনো জরুরি অবস্থার সময় রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে

জনগণকে ধান ও মুদ্রা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয় এবং সুদিন ফিরে এলে তা আবার রাজকোষে ফিরিয়ে আনা হয়। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক আদেশ নয়, এটি প্রমাণ করে যে - খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্ধন একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে ছিল। এখানকার সমাজব্যবস্থা ছিল পরোপকারী এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার মতো উন্নত পরিকল্পনা তাদের ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই 'প্রান্তিক' পৌণ্ড্ররা মৌর্য যুগে এসে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল ।

মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে প্রাপ্ত ১৮টি সাংস্কৃতিক স্তর প্রমাণ করে যে, এখানে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় তেরোশ শতাব্দী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন জনবসতি ছিল। এই দীর্ঘ ইতিহাস প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্ররা তাদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্রদের জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও পরবর্তী বৈদিক ও ধ্রুপদী সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে তাদের এক বিস্ময়কর অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া যায়। পৌণ্ড্ররা কেবল শক্তিশালী যোদ্ধা বা প্রশাসক ছিল না, তারা ছিল দক্ষ কৃষক ও কারিগর। প্রাচীন ভারতে ইক্ষু বা আখের চাষে পৌণ্ড্রদের অবদান চিরস্মরণীয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মহান পন্ডিত সুশ্রুত তাঁর 'সুশ্রুত সংহিতা'য় বারো প্রকার আখের বর্ণনা দিয়েছেন। সুশ্রুত (Sushruta Samhita, Sutrasthana, Chapter 45) উল্লেখ করেছেন যে, **'পৌণ্ড্রক' (Paundraka) নামক আখের জাতটি ছিল সবচেয়ে মিষ্ট ও পুষ্টিকর।** এই আখের নাম থেকেই স্পষ্ট হয় যে এটি পৌণ্ড্র দেশে উৎপাদিত হতো। বর্তমান উত্তরবঙ্গের চিনি শিল্পের শেকড় যে এই প্রাচীন পৌণ্ড্রদের মধ্যেই নিহিত ছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য ।

প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম সেরা বস্ত্র উৎপাদক ছিল এই পৌণ্ড্ররা। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' (Kautilya's Arthashastra, Book 2, Chapter 11) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পৌণ্ড্রবর্ধনে উৎপন্ন 'ক্ষৌম' (Kshauma) এবং 'দুকুল' (Dukula) বস্ত্র ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। **দুকুল:** এটি ছিল এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র, যা শ্বেতশুভ্র ও কোমল ছিল। **পত্রোর্ণ:** এটি ছিল বন্য রেশম থেকে তৈরি কাপড়, যার উৎপাদন কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্র ও মগধ। **কার্পাসিকা:** সুতি বস্ত্র উৎপাদনেও পৌণ্ড্রদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। এই উন্নত বস্ত্র ও চিনি শিল্পের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে,

পৌণ্ড্ররা একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ 'অর্থনৈতিক জানপদ' হিসেবে বৈদিক সমাজকাঠামোতে তাদের অবস্থান করে নিয়েছিল।

মহাভারতের বনপর্ব ও দিগ্বিজয় পর্বে দেখা যায়, পাণ্ডবদের সাথে পৌণ্ড্র রাজাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ভীম পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে পরাজিত করলেও পরে তাকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। **আর. সি. মজুমদার তাঁর 'History of Ancient Bengal' (G. Bharadwaj & Co., ১৯৭১)** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা একটি অত্যন্ত সম্মানিত 'ক্ষত্রিয়' জানপদ হিসেবে আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি পুরাণসমূহে (যেমন—বিষ্ণু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণ) পৌণ্ড্রদের সূর্যবংশীয় বা চন্দবংশীয় রাজাদের সাথে সম্পর্কিত করে তাদের আভিজাত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় পৌণ্ড্রবর্ধন একটি সুবৃহৎ 'ভুক্তি' বা প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। এটি কেবল উত্তরবঙ্গ নয়, বরং সময়ে সময়ে সমতট ও বঙ্গকেও নিজের আওতাভুক্ত করেছিল। **দামোদরপুর তাম্রশাসন (Damodarpur Copper Plates)** থেকে জানা যায় যে, গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে পুণ্ড্রনগর ছিল পূর্ব ভারতের প্রধান প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই তথাকথিত 'সীমান্তবাসী' পৌণ্ড্ররা মধ্যযুগীয় বাংলার শিল্প, স্থাপত্য এবং জ্ঞানের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক **হিউয়েন সাং (Xuanzang)** পুণ্ড্রনগর ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে (Si-Yu-Ki, Translated by Samuel Beal, ১৮৮৪) লিখেছেন যে, পুণ্ড্রনগরে ২০টি বৌদ্ধ মঠ এবং ১০০টি দেব মন্দির ছিল। তিনি মহাস্থানগড়ের ভাসু-বিহারে সম্রাট অশোক নির্মিত একটি বিশাল স্তূপের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই বিবরণগুলো প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্ররা ধর্মীয় উদারতা এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ কেবল একটি জনগোষ্ঠীর নামোল্লেখ নয়, এটি ছিল বাংলার সুসংগঠিত ইতিহাসের অঙ্কুরোদগম। মহিদাশ ঐতরেয়র লেখনীতে যে পৌণ্ড্রদের আমরা প্রথমবার চাক্ষুষ করি, তারা সময়ের আবর্তে নিজেদের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত সন্তান হিসেবে কাহিনী শুরু হলেও, ইতিহাসের পাতায় তারা আবির্ভূত হয়েছেন এক উন্নত নগর সভ্যতার নির্মাতা, সুদক্ষ কৃষক এবং বিশ্ববিশ্রুত বস্ত্র শিল্পের কারিগর হিসেবে।

পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর ছিল প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার। তাদের কৃষিপ্রযুক্তি, বিশেষত চিনি ও বস্ত্র শিল্প, প্রাচীন ভারতের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত মহাস্থানগড়ের গৌরব আজও সেই পৌণ্ড্রদের সাক্ষ্য বহন করে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পৌণ্ড্র প্রসঙ্গটি কেবল একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক নয়, এটি আমাদের বাঙালিত্বের আদি শিকড়ের সন্ধান। এই ঐতিহাসিক বিবর্তনই প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্ররা ছিল প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী আর্য জনগোষ্ঠী, যারা তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে আধুনিক বাংলার ভিত্তি নির্মাণ করে দিয়েছিল।**

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

"আমি একা গিয়ে কি করবো বা আমার একার দ্বারা কি হবে এরূপ নেতিবাচক ভাবনা অনেক ভালো কাজের অন্তরায়। বরং এটাই ভাবুন আমি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য যতটুকু পারবো তত টুকু করব, কারুর মুখাপেক্ষী না হয়ে করব। মনে রাখতে হবে, আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মজাগরণ ঘটে। তাই আত্মজাগরণ হল স্বজাতি জাগরণের প্রাধান উপায়। নিজের পকেটে পয়সা না থাকলে যেমন অপরকে পয়সা দেওয়া যায় না, তেমনি নিজেকে আত্মজাগরিত করতে না পারলে অপরকে জাগরিত করা সম্ভব নয়। তাই নিজেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য কাজ করা শুরু করুন। তারপর দেখবেন অনেকেই আপনাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে।"

-পত্রিকা সম্পাদক।।

অষ্টাদশ মহাপুরাণে পৌণ্ড্র

- শ্রীসৎকৃত করণ

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক বাস্তবতার অন্যতম প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় উৎস হলো অষ্টাদশ মহাপুরাণ। এই পুরাণসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণীতে প্রাচ্য ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ জনপদ হিসেবে **'পৌণ্ড্র' (বা পুণ্ড্র)** বিশেষ মর্যাদায় উদ্ভাসিত। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিতের কাঠামোতে প্রাচ্যের এই ভূখণ্ড কেবল কোনো ভৌগোলিক প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে উল্লিখিত হয়নি, বরং এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত **ক্ষত্রিয় রাজবংশ, সামরিক শক্তিসম্পন্ন নৃগোষ্ঠী এবং সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। পৌরাণিক সাহিত্যে পৌণ্ড্রদের স্থানিক ও সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত গৌরবময় ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়িত হয়েছে।**

অষ্টাদশ পুরাণের **'বংশানুচরিত'** অংশে আর্যাবর্তের মূলধারার রাজন্যবর্গের সঙ্গে প্রাচ্য ভারতের নিবিড় আত্মীয়তা ও সামাজিক সংহতি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, অগ্নি পুরাণ এবং ব্রহ্মা পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদ ও জাতির উৎপত্তি বিষয়ে এক সুসংহত ও ইতিবাচক বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। চন্দ্রবংশের অন্যতম প্রধান শাখা অনু বা অনব বংশের অধিপতি ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা

বলি। তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও তপোবলে সুবিদিত ছিলেন। নিঃসন্তান বলি স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকার ও বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আমন্ত্রণ জানান। ঋষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে এবং মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে তেজোদৃপ্ত পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পঞ্চ রাজকুমার হলেন: অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং সুহ্ম।

পরবর্তীকালে রাজা বলি স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্য এই পাঁচ তেজস্বী পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এই ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ও স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। **কুমার পৌণ্ড্রের নামানুসারে তাঁর শাসিত অঞ্চল পৌরাণিক ভূগোল ও সাহিত্যে 'পৌণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্র দেশ' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।** এই পৌরাণিক আখ্যানটি অত্যন্ত অর্থবহ; এটি নির্দেশ করে যে প্রাচীন ভারতীয় ভূরাজনৈতিক ভাবনায় পৌণ্ড্র কোনো বহিরাগত বা বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড ছিল না, বরং মূলধারার পবিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য এবং বৈদিক আর্য ঋষি-পরম্পরার সম্মিলনে এই জনপদের রাষ্ট্রিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের বিভিন্ন পাঠে পৌণ্ড্রদের উৎপত্তি, ভৌগোলিক সীমানা এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থানের যে প্রামাণ্য রূপ সংরক্ষিত রয়েছে, তা বেশ উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক আখ্যান ও ভুবনকোষ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচ্য মণ্ডলে পৌণ্ড্র জনপদ এক গৌরবোজ্জ্বল রাজবংশীয় ঐতিহ্য, সার্বভৌম রাজনৈতিক প্রভাব ও আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থ অংশের অষ্টাদশ অধ্যায় এবং পঞ্চম অংশের ৩৪তম অধ্যায়ে অনব শাখা ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে যে, মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে উৎপন্ন রাজা বলির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম ছিলেন পৌণ্ড্র; পরবর্তীকালে যিনি শক্তিশালী পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মৎস্য পুরাণের ৪৮ ও ১১৪তম অধ্যায়ে যযাতি-বংশ ও ভুবনকোষের বর্ণনায় অনব বংশীয় ধারায় পৌণ্ড্রের ক্ষত্রিয় মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একে প্রাচ্য মণ্ডলের অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বায়ু পুরাণের ৪৫ ও ৯৯তম অধ্যায়ে ভুবনকোষ ও প্রাচীন রাজবংশাবলীর ধারায় প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে পৌণ্ড্রের অবস্থান এবং মহর্ষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে পৌণ্ড্র জাতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক বিস্তারের ধারাবাহিকতা মেলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মধ্যভাগ ও উত্তরভাগে, যেখানে প্রাচীন রাজন্যবর্গের বিস্তার প্রসঙ্গে বলি-সুদেষ্ণার ক্ষেত্রজ পুত্র পৌণ্ড্র কর্তৃক পুণ্ড্রবর্ধন ও তৎসংলগ্ন উর্বর নদী অববাহিকায় নিজস্ব স্বাধিকার ও আধিপত্য বিস্তারের ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রাজনৈতিক ও সামরিক পরাক্রমের পাশাপাশি পৌণ্ড্র জনপদের শাসকদের আধ্যাত্মিক ও ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্যও বিভিন্ন পুরাণে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ভাগবত

পুরাণের দশম স্কন্ধের ৬৬তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রাধিপতি পৌণ্ড্রকের বীরত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজকীয় ঐশ্বর্য এবং অবিচল বৈরভাবাপন্ন ধ্যানের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পরম গতি বা সাযুজ্য লাভের বিবরণ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে অগ্নি পুরাণের ২৭৪তম অধ্যায়ে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের সমান্তরালে প্রাচ্যের প্রধান পঞ্চ শক্তির অন্যতম হিসেবে পৌণ্ড্রের সার্বভৌম স্থায়িত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। তদুপরি ব্রহ্ম পুরাণের ত্রয়োদশ ও ২০৭তম অধ্যায়ে চন্দ্রবংশ চরিত ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বর্ণনায় প্রাচ্য দেশের পরাক্রমশালী শাসক হিসেবে পৌণ্ড্রের প্রতিষ্ঠা এবং সমসাময়িক রাজনীতিতে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সুদৃঢ় প্রভাবের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে।

শুধু রাজবংশীয় শৌর্যেই নয়, সনাতন তীর্থপরম্পরাতেও পৌণ্ড্রভূমির অবস্থান ছিল অত্যন্ত পবিত্র। স্কন্দ পুরাণের অবন্ত্যখণ্ড ও রেবাখণ্ডের তীর্থমাহাত্ম্য ও শক্তিপীঠ তালিকায় পুণ্ড্রবর্ধনে দেবী পাটলার অধিষ্ঠানের উল্লেখ করে পৌণ্ড্রকে সর্বভারতীয় সনাতন শাক্ত তীর্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই পৌরাণিক আখ্যানগুলি নিশ্চিত করে যে, প্রাচীন ভারতে পৌণ্ড্র জনপদ অনব ক্ষত্রিয় মর্যাদায় ভূষিত হয়ে ভৌগোলিক বিস্তার, সামরিক পরাক্রম এবং শাক্ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এক অবিচ্ছেদ্য ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের **'ভুবনকোষ'** অধ্যায়সমূহে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক গঠন, নদ-নদী, পর্বতমালা এবং জনপদসমূহের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৭ ও ৫৮তম অধ্যায়, বায়ু পুরাণের ৪৫তম অধ্যায় এবং মৎস্য পুরাণের ১১৪তম অধ্যায়ে সমগ্র দেশকে মধ্যদেশ, উদীচ্য, প্রাচ্য, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি প্রধান মণ্ডলসমূহে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ভৌগোলিক বিন্যাসে পৌণ্ড্রকে **'প্রাচ্যদেশ'** অর্থাৎ পূর্ব ভারতীয় মণ্ডলের একটি বিশিষ্ট ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভৌগোলিক বাস্তবতায় পৌণ্ড্র জনপদের অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে করতোয়া নদীর অববাহিকা, গঙ্গার পূর্ব শাখা এবং প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীকে কেন্দ্র করে। **করতোয়া নদীকে পুরাণে অত্যন্ত পবিত্র ও মাহাত্ম্যপূর্ণ নদী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অববাহিকায় পৌণ্ড্রদের মূল সামাজিক ও নাগরিক জীবন বিকশিত হয়েছিল।** পৌরাণিক লিপিকারগণ পৌণ্ড্র অঞ্চলের জলবায়ু, জলপথের বিস্তার এবং কৃষিজ প্রাচুর্যের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

পুরাণসাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে যে পৌণ্ড্র অঞ্চল উৎকৃষ্ট ইক্ষু বা আখের জন্য বিখ্যাত ছিল, যা শাস্ত্রীয়ভাবে **'পৌণ্ড্রক ইক্ষু'** নামে পরিচিত। ভূপ্রকৃতির উর্বর পলিমাটি এবং নদীব্যবস্থার প্রাচুর্যের কারণে এই অঞ্চল কৃষিকাজে অসামান্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ভুবনকোষের প্রামাণ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, পৌণ্ড্র কেবল রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিল

না, বরং তার অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থা ও নদীবাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

অষ্টাদশ পুরাণে পৌণ্ড্রদের রাজনৈতিক তেজস্বিতা ও রাজকীয় আত্মমর্যাদার এক অনন্য আখ্যান হলো **পৌণ্ড্রক বাসুদেবের উপাখ্যান**। এই ঘটনাটি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের ৬৬তম অধ্যায়, বিষ্ণু পুরাণের পঞ্চম অংশের ৩৪তম অধ্যায়, ব্রহ্ম পুরাণের ২০৭তম অধ্যায় এবং পদ্ম পুরাণে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। পৌণ্ড্রের অধিপতি পৌণ্ড্রক ছিলেন এক দিগ্বিজয়ী ও অপরাজেয় নরপতি। তিনি সমগ্র প্রাচ্য ভারতে নিজস্ব আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। **পদ্ম পুরাণের বর্ণনা অনুসারে, পৌণ্ড্রক দেবাদিদেব মহাদেবের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন এবং বারো বছরব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যা দ্বারা ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করে চতুর্ভুজ রূপ, দিব্য শ্রী এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত রূপ লাভ করেছিলেন। এই বরলাভের পর তিনি নিজেকে 'বাসুদেব' ও জগতের অধীশ্বর 'পুরুষোত্তম' হিসেবে ঘোষণা করেন।**

বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, পৌণ্ড্রক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দূত মারফত বার্তা প্রেরণ করেন এবং কৃষ্ণের ব্যবহৃত দৈব প্রতীকসমূহ ত্যাগের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তিনি কাশীরাজের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলে দুই অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখোমুখি হন। কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই যুদ্ধ পৌরাণিক সাহিত্যে দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক বলয়ের সংঘাতের প্রতীক।

ভাগবত ও বৈষ্ণব দর্শনের দিক থেকে পৌণ্ড্রকের এই উপাখ্যানটি গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। বাহ্যিকভাবে এটি একটি সামরিক সংঘাত মনে হলেও, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় পৌণ্ড্রকের মানসিকতাকে 'তন্ময়তা' বা বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-চিন্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **পৌণ্ড্রক অহর্নিশ বাসুদেবের রূপ, অস্ত্র, উত্তরীয় ও লাবণ্য ধ্যান করতেন। যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে যখন তিনি দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি সেই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের ফলস্বরূপ পরম 'সাযুজ্য মুক্তি' ও 'সারূপ্য' লাভ করেন।** পুরাণে কোনো চরিত্রের শ্রীকৃষ্ণের হাতে দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ অত্যন্ত ইতিবাচক ও পরম আধ্যাত্মিক সিদ্ধি হিসেবে স্বীকৃত। এর মাধ্যমে পৌণ্ড্রাধিপতির সুদৃঢ় সংকল্প, তেজস্বী অহংকার এবং অন্তিম আধ্যাত্মিক পরমার্থ প্রাপ্তির রূপটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পৌণ্ড্রদেশ কেবল রণকৌশল ও রাজবংশীয় শক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, অষ্টাদশ পুরাণে এটি এক পরম পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবেও পূজিত হয়েছে। সর্বভারতীয় তীর্থপরিক্রমার তালিকায় পৌণ্ড্রের প্রধান মহানগরী **পুণ্ড্রবর্ধন** একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

স্কন্দ পুরাণের অবন্ত্যখণ্ড ও রেবাখণ্ডের অন্তর্গত তীর্থমাহাত্ম্যে ভারতবর্ষের প্রধান দেবীক্ষেত্রসমূহের তালিকায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: **"পুণ্ড্রবর্ধনে পাটলা"**। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, **দেবী ভগবতী পুণ্ড্রবর্ধন নগরে 'দেবী পাটলা' নামে মহাশক্তি রূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন**। অষ্টাদশ পুরাণের এই সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্র অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই শক্তি উপাসনার এক মহিমান্বিত পীঠস্থান হিসেবে সমাদৃত ছিল এবং দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে পুণ্য অর্জনের জন্য সমবেত হতেন।

তদুপরি, স্কন্দ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও অগ্নি পুরাণে ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ হিসেবে যে **'ঊর্ধ্বপুণ্ড্র' এবং 'ত্রিপুণ্ড্র' তিলক ধারণের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেখানে 'পুণ্ড্র' শব্দটির আধ্যাত্মিক অর্থ দেহের পবিত্রতা ও ভগবানের আলয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পৌণ্ড্র জনপদের নাম এবং এই পবিত্র আধ্যাত্মিক প্রতীকের সংযোগ পৌরাণিক পরিমণ্ডলে পৌণ্ড্রেদের সাংস্কৃতিক পবিত্রতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।**

অষ্টাদশ মহাপুরাণে প্রাপ্ত তথ্যাবলি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় পৌণ্ড্রের একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সুদৃঢ় ও ইতিবাচক পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যায়। পুরাণের বংশলতিকায় পৌণ্ড্রদের চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত করে মহর্ষি দীর্ঘতমা ও মহাত্মা বলির পবিত্র রক্তধারার উত্তরাধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রাচীন সমাজের মূল্যায়নে তাদের পূর্ণ ক্ষত্রিয়ত্ব ও রাজকীয় বৈধতা প্রদান করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ ও কাশীর মতো প্রধান আঞ্চলিক মহাশক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে পৌণ্ড্র রাজন্যবর্গ প্রাচ্য ভারতের ভূরাজনীতি পরিচালনা করতেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভুবনকোষে বর্ণিত করতোয়া নদীর পললগঠিত উর্বর ভূমি এবং বিখ্যাত 'পৌণ্ড্রক ইক্ষু'র উৎপাদন পৌণ্ড্রকে একটি স্বনির্ভর ও ঐশ্বর্যশালী জনপদে রূপান্তরিত করেছিল। একই সাথে স্কন্দ পুরাণে দেবী পাটলার পীঠস্থান হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধনের স্বীকৃতি এই জনপদকে ভারতীয় শাক্ত ও শৈব ঐতিহ্যের এক প্রধান তীর্থকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। সুতরাং, অষ্টাদশ মহাপুরাণের আলোকে পৌণ্ড্র কোনো সাধারণ বা প্রান্তিক ভূখণ্ড ছিল না; বরং তা ছিল শৌর্য, ধর্মীয় সমন্বয়, উন্নত কৃষি এবং আধ্যাত্মিক মহিমায় সমুজ্জ্বল প্রাচীন ভারতের এক ঐতিহাসিক ও প্রাণবন্ত জনপদ এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, শৌর্য, সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক জ্যোতির্ময় স্তম্ভ।

তথ্যসূত্রঃ

১. Bhatt, G. P., editor. The Agni Purana. Translated by N. Gangadharan, Ancient Indian Tradition and Mythology Series, vols. 27–30, Motilal Banarsidass, 1984.

২. Debroy, Bibek, translator. The Brahmanda Purana. Vol. 2, Penguin Random House India, 2022.

৩. Deshpande, N. A., translator. The Padma Purana. Ancient Indian Tradition and Mythology Series, vols. 39–48, Motilal Banarsidass, 1988–1992.

৪. Mani, Vettam. Puranic Encyclopaedia: A Comprehensive Dictionary with Special Reference to the Epic and Puranic Literature. Motilal Banarsidass, 1975.

৫. Pargiter, F. Eden, translator. The Markandeya Purana. The Asiatic Society of Bengal, 1904.

৬. Prabhupāda, A. C. Bhaktivedanta Swami, translator. Śrīmad-Bhāgavatam (Bhagavata Purana). Tenth Canto, Bhaktivedanta Book Trust, 1988.

৭. Tagare, G. V., translator. The Brahma Purana. Ancient Indian Tradition and Mythology Series, vols. 33–36, Motilal Banarsidass, 1955.

৮. Tagare, G. V., translator. The Skanda Purana. Ancient Indian Tradition and Mythology Series, vols. 49–68, Motilal Banarsidass, 1992–2003.

৯. Tagare, G. V., translator. The Vayu Purana. Ancient Indian Tradition and Mythology Series, vols. 37–38, Motilal Banarsidass, 1987.

১০. Vasu, Srisa Chandra, translator. The Matsya Puranam. The Panini Office, 1916.

১১. Wilson, Horace Hayman, translator. The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and Tradition. Edited by Fitzedward Hall, vols. 1–5, Trübner & Co., 1864–1877.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সতর্ক থাকুন

১. মুসলিম মৌলবাদীদের কখনও বিশ্বাস নয়।

২. হালাল খাবার এড়িয়ে চলুন ও এই বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

৩. লাভ জিহাদ সম্পর্কে বাবা-মা সতর্ক থাকুন ও ছেলে-মেয়েদের সতর্ক রাখুন।

৪. ল্যান্ড জেহাদ বা জমি জেহাদ বিষয়ে সচেতন থাকুন।

৫. অনুপ্রবেশ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকুন এবং অনুপ্রবেশকারীকে মদত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৬. মুসলিম মৌলবাদীরা কোনও এলাকায় সংখ্যালঘু হলে সম্প্রীতির কথা বলে কিন্তু সংখ্যাগুরু হলে ইসলামিক রীতিনীতি কায়েম করার চেষ্টা করে। তাই কোনও কুসুমের গল্পে বিশ্বাস নয়।

৭. খ্রিষ্টানদের অর্থনৈতিক প্রলোভন থেকে দূরে থাকুন।

৮. ধর্মান্তরকরণের যেকোনোও চেষ্টা হলে সবাই মিলে প্রতিরোধ করুন।

৯. সর্বদা সচেতন থাকতে যে কোনও একটি হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকুন।

১০. হিন্দু বিরোধী কমিউনিস্টদের থেকে দূরে থাকুন।

উপপুরাণে পৌণ্ড্র

- শ্রীপরাণ মণ্ডল

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অলিগলিতে ‘পৌণ্ড্র’ বা ‘পুণ্ড্র’ নামটি একটি স্বয়ংপ্রভ মহিমায় ভাস্বর। বৈদিক সাহিত্যের প্রান্তিক উল্লেখ থেকে শুরু করে মহাকাব্য এবং বিশেষত পরবর্তীকালের উপপুরাণ সাহিত্যে পৌণ্ড্রদের বিবর্তন এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক যাত্রার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলার আদি জনপদগুলোর মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন কেবল ভৌগোলিক বিচারে বৃহত্তম ছিল না, বরং এটি ছিল একটি উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাণকেন্দ্র। উপপুরাণসমূহ, যা মূলত খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানে পৌণ্ড্র জাতির পরিচয় ও তাদের অবদানকে অত্যন্ত ইতিবাচক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা বিভিন্ন উপপুরাণ, বিশেষত বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মহাভাগবত পুরাণ এবং দেবীভাগবত পুরাণের আলোকে পৌণ্ড্র জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সামাজিক মর্যাদাকে বিশ্লেষণ করব।

ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে আঠারোটি মহাপুরাণের পাশাপাশি উপপুরাণসমূহ এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। মহাপুরাণগুলি যখন সর্বভারতীয় আর্য সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত ছিল, উপপুরাণগুলি তখন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় লৌকিক আচার এবং প্রান্তিক জনপদগুলোর মাহাত্ম্য কীর্তনে নিবেদিত ছিল। বিশেষত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি বুঝতে উপপুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ অনেক উপপুরাণ এই অঞ্চলেই রচিত হয়েছে এবং এখানকার জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে ।

উপপুরাণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ‘পুরাণম্ আখ্যাণম্’, যা প্রাচীন কিংবদন্তি ও লোককাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত এক ঐতিহাসিক বয়ান। ঐতিহাসিকদের মতে, উপপুরাণসমূহ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উৎস, যেখানে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পৌণ্ড্র জনপদের ক্ষেত্রে এই পুরাণগুলি কেবল একটি ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করেনি, বরং একটি বীর ও কর্মঠ জাতির উত্থানের কাহিনী বর্ণনা করেছে যারা প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বনিয়াদ তৈরি করেছিল।

পৌণ্ড্র জাতির উৎপত্তি নিয়ে পৌরাণিক সাহিত্যে যে কাহিনীটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তা হলো রাজা বলি ও মহর্ষি দীর্ঘতমার উপাখ্যান। এই কাহিনীটি পৌণ্ড্রদের এক অতি উন্নত ও রাজকীয় আভিজাত্যের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মহাভারত, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং পরবর্তীকালের একাধিক উপপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, মগধের নিকটবর্তী গিরিব্রজ অঞ্চলের অধিপতি রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচজন তেজস্বী পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্র হলেন— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং সুহ্ম । এই পাঁচ রাজপুত্রের নামানুসারেই প্রাচ্যের পাঁচটি শক্তিশালী জনপদ ও জাতির নামকরণ হয়েছে। এই বংশতালিকাগত বর্ণনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্ররা কোনো অখ্যাত গোষ্ঠী নয়, বরং তারা এক মহান ঋষি ও রাজকীয় রক্তের উত্তরাধিকারী । এই কাহিনী আর্য সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে কাজ করে, যা পৌণ্ড্রদের সামাজিক মর্যাদাকে উচ্চকিত করে তোলে। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬৮২) এই ঐতিহাসিক ঐক্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলার উপ-অঞ্চলগুলি তাদের আদিম জনজাতির নামেই পরিচিতি লাভ করেছে ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় রচিত **'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ'** তৎকালীন বাংলার সমাজকাঠামোর এক অনবদ্য দলিল। এই উপপুরাণে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি ও তাদের সামাজিক অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই পুরাণের একটি বিশেষ দিক হলো এটি আর্য-বহির্ভূত বা প্রান্তিক জাতিসমূহকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাতার তলায় নিয়ে আসার একটি সার্থক চেষ্টা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তৎকালীন বাংলার সমাজকে মূলত ব্রাহ্মণ এবং বিভিন্ন স্তরের 'সংকর' (Mixed Castes) জাতির মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। এই সংকর জাতিগুলোকে তাদের পেশা ও সামাজিক গুরুত্ব অনুযায়ী তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে: উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর এবং অধম সংকর বা অন্ত্যজ। পৌণ্ড্র বা তাদের উত্তরসূরি গোষ্ঠীসমূহ (যেমন পুণ্ডারী) এই কাঠামোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। যদিও মধ্যযুগের কঠোর বর্ণব্যবস্থায় অনেক ভূমিপুত্র জাতিকে 'শূদ্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তাদের 'সৎ-শূদ্র' বা 'উত্তম সংকর' হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক

প্রতিপত্তিরই প্রমাণ। পৌণ্ড্ররা মূলত কৃষি ও কারিগরি পেশার সাথে যুক্ত ছিল, যা তাদের একটি স্বনির্ভর ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই বর্ণবিন্যাসকে ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে কামরূপ বা বঙ্গদেশে রচিত **'কালিকা পুরাণ'** শাক্ত ধর্মের প্রসারে এবং বাংলার ভৌগোলিক মাহাত্ম্য বর্ণনায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এই পুরাণে পৌণ্ড্রবর্ধনকে কেবল একটি ভূখণ্ড হিসেবে নয়, বরং একটি পবিত্র ও বৈজ্ঞানিক চর্চার কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কালিকা পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমানা ছিল করতোয়া নদী পর্যন্ত, যার অপর তীরেই ছিল সমৃদ্ধ পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদ। **করতোয়া নদীকে এই পুরাণে অত্যন্ত পবিত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই নদীতে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ করা যায়।** (K. L. Barua, Early History of Kamarupa, Published by the Author, 1933) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলটি আর্য সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক ঢেউ আসার অনেক আগে থেকেই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। কালিকা পুরাণের এই বর্ণনা পৌণ্ড্র জনপদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কালিকা পুরাণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো **'প্রাগজ্যোতিষপুর'** নামের উৎপত্তি সংক্রান্ত বর্ণনা। পুরাণে বলা হয়েছে যে, **চিত্রাচল পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত নবগ্রহ মন্দির ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র থেকেই এই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে।** পৌণ্ড্রবর্ধন এই উন্নত বৈজ্ঞানিক ও তান্ত্রিক চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার অধিপতিরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, যা এই অঞ্চলকে তৎকালীন ভারতের জ্ঞানচর্চার মানচিত্রে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছিল।

উপপুরাণ সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শাক্ত দর্শনের প্রভাব। দেবীভাগবত এবং মহাভাগবত পুরাণে সতীর দেহত্যাগের পর তাঁর অঙ্গচ্ছেদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিদ্ধপীঠের সৃষ্টি হয়। দেবীভাগবত পুরাণের সপ্তম স্কন্ধের ৩০তম অধ্যায়ে ১০৮টি সিদ্ধপীঠের একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, **বাংলার অত্যন্ত অল্প কয়েকটি স্থানের মধ্যে 'পুণ্ড্রবর্ধন' অন্যতম প্রধান পীঠ হিসেবে স্থান পেয়েছে।** ঐতিহ্যগতভাবে বাংলায় ৫১টি

পীঠের কথা প্রচলিত থাকলেও, দেবীভাগবত ১০৮টি পীঠের কথা বলে এবং সেখানে পৌণ্ড্রবর্ধনকে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। **"পুণ্ড্রবর্ধন হলো বাংলার সেই বিরল সিদ্ধপীঠ যা দেবীভাগবতের ১০৮ পীঠের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের প্রাচীন পবিত্রতাকে উচ্চকিত করে।"**

মহাভাগবত পুরাণেও দেবী পার্বতীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই অঞ্চলের পবিত্রতা ও শাক্ত উপাসনার গভীরতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পুরাণে পৌণ্ড্রবর্ধনকে কেবল একটি রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবে নয়, বরং আধ্যাত্মিক মুক্তির স্থান হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। (R. C. Hazra, Studies in the Upapuranas, Sanskrit College, 1958, Page 377) এই ভৌগোলিক ও ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় পৌণ্ড্র জনপদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে **'পৌণ্ড্রক বাসুদেব'**-এর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। হরিবংশ এবং বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণে তাঁর বীরত্ব ও প্রভাবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ।

হরিবংশের বর্ণনা অনুযায়ী, পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজা বাসুদেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনি মগধের সম্রাট জরাসন্ধের পরম মিত্র এবং অন্যতম প্রধান শক্তিস্তম্ভ ছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে 'প্রকৃত বাসুদেব' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, যা তাঁর অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দেয়। পৌণ্ড্রক বাসুদেব কেবল পৌণ্ড্রদেরই নয়, বরং বঙ্গ ও কিরাত জাতির মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে পৌণ্ড্রবর্ধন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করত। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, পৌণ্ড্র জনপদের এই রাজনৈতিক উত্থান বাংলার আদি ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় । R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, (G. Bharadwaj & Co., 1971) উল্লেখ করেছেন যে, পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজতন্ত্র ।

উপপুরাণ ও অন্যান্য সমকালীন সাহিত্যে পৌণ্ড্রদের কেবল যোদ্ধা হিসেবেই নয়, বরং এক অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী জাতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি ও শিল্পে তাদের অবদান ছিল অতুলনীয়। 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' শব্দের একটি অন্যতম অর্থ হলো আখ বা ইক্ষু। এটি

ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, প্রাচীন পুণ্ড্র দেশে (বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা) অত্যন্ত উন্নত মানের আখের চাষ হতো। এখান থেকেই সম্ভবত 'পৌণ্ড্রক' নামের আখের জাতটি সারা ভারতে পরিচিতি লাভ করে। মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতেও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় শস্য ও অর্থ মজুত রাখার কথা বলা হয়েছে, যা পৌণ্ড্র জনপদের উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রমাণ দেয় ।

পৌণ্ড্ররা কেবল চাষিই ছিল না, তারা রেশম চাষ (Sericulture) এবং রেশম বস্ত্র বুননেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। ও'ম্যালি (O'Malley) এবং হান্টারের (W.W. Hunter) বর্ণনা অনুযায়ী, পৌণ্ড্রদের উত্তরসূরি সম্প্রদায়গুলো আজও উত্তরবঙ্গে রেশম চাষ ও বস্ত্র বয়ন শিল্পের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। (W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Trubner & Co., 1876, Page 11) এই শিল্পের প্রাচীনত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। বাংলার কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির ওপর রচিত **'কৃষিপরাশর'** গ্রন্থটি পৌণ্ড্র জনপদের কৃষি চেতনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও এটি সরাসরি একটি উপপুরাণ নয়, তবে এর আদর্শসমূহ বৃহদ্ধর্ম পুরাণের কৃষি-দর্শনের সাথে মিলে যায়। এই গ্রন্থে কৃষিকে একটি পবিত্র এবং মহাজাগতিক কাজ হিসেবে দেখা হয়েছে। পৌণ্ড্ররা যেহেতু কৃষি সভ্যতার প্রবর্তক ছিল, তাই কৃষিপরাশর এর নির্দেশাবলী তাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, **একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণও যদি কৃষি কাজ অবহেলা করেন, তবে তাঁর গৃহে লক্ষ্মী বাস করেন না।** এই দৃষ্টিভঙ্গি পৌণ্ড্রদের কৃষি কাজকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল।

উপপুরাণের বর্ণনা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ সমন্বয় করলে দেখা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর ছিল প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন ও বৃহত্তম নগর। মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে, এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত দুর্গ-নগরী। পৌণ্ড্রবর্ধনের স্থাপত্য ছিল মূলত পোড়ামাটির ফলক (Terracotta) এবং ইটের তৈরি। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত সমাজ বিন্যাসে স্থপতি ও কারিগরদের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় পৌণ্ড্রবর্ধনের নগর পরিকল্পনায়। ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে, গুপ্ত ও পাল আমলে পুণ্ড্রনগর ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মেরই এক মহামিলন ক্ষেত্র। এখানকার মন্দির ও মঠগুলোর কারুকার্য প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্র জাতি শিল্পকলা ও স্থাপত্যে অত্যন্ত উন্নত রুচির অধিকারী ছিল। (R. C. Majumdar,

History of Ancient Bengal, G. Bharadwaj & Co., 1971) দেখিয়েছেন কীভাবে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি (প্রদেশ) হিসেবে বিশাল অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করত। এখানকার নাগরিক জীবন ছিল বাণিজ্য ও ধর্মীয় উৎসবে মুখরিত। পৌণ্ড্রদের ধর্মীয় জীবন ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং বিবর্তনশীল। উপপুরাণগুলোতে এই বিবর্তনের চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রাগার্য তান্ত্রিক বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়।

কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে, **পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে শৈব ও শাক্ত ধর্মের এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটেছিল।** এখানে একদিকে যেমন মহাদেব শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব পালিত হতো, অন্যদিকে দেবী কামাখ্যা ও দুর্গার আরাধনাও ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যা মহাভাগবত পুরাণের বর্ণনায় স্পষ্ট। পৌণ্ড্ররা মূলত প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক ছিল, যা পরবর্তীতে শাস্ত্রীয় ধর্মের সাথে মিশে এক নতুন রূপ লাভ করে। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩) উল্লেখ করেছেন যে, **মধ্যযুগে মুসলমান আগমনের পরেও বাঙালির এই ধর্মীয় পরম্পরা ও তান্ত্রিক ভিত্তি অবিকৃত ছিল। এই সাংস্কৃতিক স্থায়িত্বই পৌণ্ড্রদের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।**

আধুনিক ঐতিহাসিকরা পৌণ্ড্রদের বাংলার ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং নীহাররঞ্জন রায়—উভয়েই পৌণ্ড্র জনপদকে বাংলার সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পৌণ্ড্ররা ছিল একটি আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) গোষ্ঠী যারা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে বাংলাকে বাসযোগ্য ও উর্বর কৃষিজমিতে পরিণত করেছিল। তাদের এই সংগ্রামী ও সৃজনশীল মানসিকতাই বর্তমান বাঙালি জাতির মূল শক্তি। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'History of Ancient Bengal' গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্ধনকে প্রাচীন বাংলার **'সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' (Cultural Hub)** হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মৌর্য আমল থেকেই পুণ্ড্রনগর ছিল উত্তর ভারতের সাথে বাংলার যোগাযোগের প্রধান সেতুবন্ধ।

বিভিন্ন উপপুরাণ বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৌণ্ড্ররা কেবল একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী নয়, বরং তারা ছিল বাংলার কৃষি-সভ্যতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার অন্যতম প্রধান কারিগর। যদিও প্রাচীন আর্য সাহিত্যে তাদের

প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছিল, কিন্তু উপপুরাণসমূহ—বিশেষ করে বাংলার প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থগুলি—তাদের সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। পৌণ্ড্রদের বীরত্ব পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কাহিনীতে অমর হয়ে আছে, তাদের শিল্পনৈপুণ্য মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষে প্রদীপ্ত, এবং তাদের কঠোর পরিশ্রম উত্তরবঙ্গের সোনার ফসলে আজও বর্তমান। উপপুরাণে বর্ণিত পুণ্ড্রবর্ধনের **'সিদ্ধপীঠ'** মর্যাদা এই অঞ্চলের মাটিকে দিয়েছে এক অলৌকিক পবিত্রতা। প্রকৃতপক্ষে, পৌণ্ড্র জাতির এই ইতিবাচক ইতিবৃত্ত বাংলার সামগ্রিক ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। বর্তমান বাঙালি জাতির জাতিগত ও সাংস্কৃতিক গঠনের মূলে এই পৌণ্ড্রদের অবদান চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং ধর্মীয় ঔদার্য আধুনিক সমাজকেও অনুপ্রেরণা দেয়। পৌণ্ড্রদের এই ইতিবাচক গাথা কেবল অতীতের ধূসর স্মৃতি নয়, বরং এটি বাংলার ভবিষ্যতের এক আলোকবর্তিকা।

তথ্যসূত্রঃ

1. Barua, K. L. Early History of Kamarupa. Published by the Author, 1933.
2. Bṛhaddharma Purāṇa. Edited by Haraprasad Shastri, Bibliotheca Indica, The Asiatic Society, 1897.
3. Chattopadhyaya, Annapurna. The People and Culture of Bengal: A Study in Origins. Firma KLM, 2002.
4. Hazra, R. C. Studies in the Upapuranas. Vol. 2, Sanskrit College, 1963.
5. Hunter, W. W. A Statistical Account of Bengal: Districts of Rajshahi and Bogra. Vol. VIII, Trübner & Co., 1876.
6. Kālikā Purāṇa. Text, introduction, and translation by Biswanarayan Shastri, 3 vols., Nag Publishers, 1991.
7. Kṛṣi-Parāśara. Edited and translated by Girija Prasanna Majumdar and Sures Chandra Banerji, The Asiatic Society, 1960.
8. Majumdar, R. C. History of Ancient Bengal. G. Bharadwaj & Co., 1971.
9. Ray, Niharranjan. Bāngālīr Itihās: Ādi Parba. Dey's Publishing, 1993.
10. The Śrīmad Devībhāgavatam. Translated by Swami Vijnanananda, Munshiram Manoharlal Publishers, 1996.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

মৎস্য পুরাণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

- শ্রীমতী রত্নগর্ভা রায়

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে মৎস্য পুরাণ প্রাচীনতম, সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ আকর গ্রন্থ হিসেবে ভারততত্ত্ববিদদের কাছে স্বীকৃত। এই মহাপুরাণটি কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংকলন নয়, বরং প্রাচীন ভারতের রাজবংশীয় বংশলতিকা (বংশানুচরিত), ভৌগোলিক বিন্যাস এবং আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের এক জীবন্ত দলিল। প্রাচীন ভারতের মানচিত্রে প্রাচ্য জনপদসমূহের—বিশেষ করে ‘পৌণ্ড্র’ জনপদ এবং ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়’ জাতির—উৎপত্তি, রাজসিক গরিমা ও সামরিক আধিপত্যের এক অত্যন্ত ইতিবাচক ও গৌরবময় আলেখ্য এই পুরাণে উপস্থাপিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণ-এ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আলোচনা প্রধানত দুটি সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয়েছে—প্রথমত, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বলির ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে পৌণ্ড্র রাজবংশের পবিত্র ক্ষত্রিয় উৎপত্তি এবং দ্বিতীয়ত, ভুবনকোষ বা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণীতে এক পরাক্রমশালী ও বিস্তৃত সামরিক শক্তি হিসেবে পৌণ্ড্রদের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি।

মৎস্য পুরাণ-এর ৪৮তম অধ্যায়ে চন্দ্রবংশের অন্তর্গত পুরুবংশীয় রাজাদের বংশলতিকা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাচ্য ভারতের মহান জনপদসমূহের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বলির কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। রাজা তিতিক্ষুর বংশে জাত মহারাজ বলি ছিলেন একজন মহাযোগী, ধর্মপ্রাণ এবং অপরাজেয় সম্রাট। মৎস্য পুরাণ-এর বর্ণনা অনুসারে, পূর্বজন্মের সুকৃতি ও কঠোর তপস্যার ফলে ভগবান ব্রহ্মা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে মহাতপস্বিত্ব, কল্পকালব্যাপী দীর্ঘায়ু, রণক্ষেত্রে অজেয়ত্ব, ত্রিলোক দর্শন এবং ধর্ম-প্রবর্তকত্বের বর প্রদান করেছিলেন। এই মহান রাজর্ষি বলির বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রহ্মর্ষি গৌতম দীর্ঘতমার তপোবল ও আশীর্বাদে রানী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচজন তেজস্বী পুত্রের জন্ম হয়। মৎস্য পুরাণ-এর ৪৮তম অধ্যায়ের (৪৮.২৩–২৫) শ্লোকসমূহ এই ঐতিহাসিক ও পবিত্র উৎপত্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে:

শ্লোক:

তস্য সুদেষ্ণা মহিষী তস্যাং জজ্ঞে স ধর্মবিৎ ।

বলেরঙ্গাদয়ঃ পুত্রাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রজসংজ্ঞিতাঃ ॥ ২৩

অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ ।

পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চৈব হি বলেঃ পুত্রাঃ স ক্ষেত্রজাঃ ॥ ২৪

বালেয়াঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বালেয়া ব্রাহ্মণাস্তথা ।

বালেয়স্য তু রাজর্ষের্বংশে তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৫

(বাংলা অনুবাদ: ধর্মজ্ঞ মহর্ষি দীর্ঘতমা মহারাজ বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ প্রমুখ পাঁচজন ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে অঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন, এবং তৎপরে যথাক্রমে বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র এবং কলিঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সকলেই মহারাজ বলির ক্ষেত্রজ ক্ষত্রিয় পুত্র। সেই মহাত্মা রাজর্ষি বলির বংশে 'বালেয় ক্ষত্রিয়' এবং 'বালেয় ব্রাহ্মণ' উভয়ই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।)

এই শ্লোকগুলোর ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় তাৎপর্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পৌণ্ড্র জনপদের প্রতিষ্ঠাতা 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' ছিলেন একজন বিশুদ্ধ 'ক্ষেত্রজ' ক্ষত্রিয় সন্তান, যাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছিল এক মহান ব্রহ্মর্ষির আধ্যাত্মিক তেজ এবং এক সার্বভৌম রাজর্ষির ক্ষত্রিয় শৌর্য। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী, ক্ষেত্রজ পুত্র পিতার বৈধ উত্তরাধিকারী এবং তাঁরই বর্ণ ও গোত্রের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। তদুপরি, মৎস্য পুরাণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, মহারাজ বলির এই বংশধরগণ **'বালেয় ক্ষত্রিয়'** হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতিকে এক অকাট্য আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান করে।

মৎস্য পুরাণের বর্ণনা অনুসারে রাজা বলির পঞ্চ পুত্রের মাধ্যমে প্রাচীন প্রাচ্য ভারতে পাঁচটি প্রধান জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক মর্যাদা। এই আখ্যান অনুযায়ী, জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন 'অঙ্গ দেশ' এবং তিনি সম্মানিত হন এক গৌরবময় ক্ষত্রিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। দ্বিতীয় পুত্র বঙ্গ গড়ে তোলেন 'বঙ্গ দেশ' এবং তিনি পরিচিতি পান এই ভূখণ্ডে আর্য সংস্কৃতির প্রসারের মূল নায়ক রূপে। বীর যোদ্ধা ও ধার্মিক শাসক হিসেবে স্বীকৃত কলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'কলিঙ্গ দেশ'। অন্যদিকে, 'পৌণ্ড্র (বা পুণ্ড্র) দেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা পৌণ্ড্রকে মৎস্য পুরাণে এক শুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও পরম পরাক্রমশালী রাজা হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে, প্রাচীন প্রাচ্য জনপদের দক্ষ নির্মাতা হিসেবে সুহ্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐতিহাসিক 'সুহ্ম দেশ'। তাঁদের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই জনপদসমূহ প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও রাজনীতির মূল স্রোতকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমৃদ্ধ করেছে।

মৎস্য পুরাণ-এর ৪৮তম অধ্যায়ের আরও একটি শ্লোকে (৪৮.২৬) এই পাঁচ

ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়:

শ্লোক:

চত্বারস্তু ততো দেশাঃ পুণ্যাঃ প্রখ্যাতকীর্তয়ঃ ।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ সুহ্মাঃ পুণ্ড্রাস্তথৈব চ ॥ ২৬

(বাংলা অনুবাদ: অতঃপর তাঁদের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র—এই পাঁচটি পুণ্যভূমি ও প্রখ্যাত কীর্তিসম্পন্ন দেশের সৃষ্টি হলো।)

এখানে লক্ষণীয় যে, **মৎস্য পুরাণ পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র দেশকে 'পুণ্যাঃ' (পুণ্যভূমি) এবং 'প্রখ্যাতকীর্তয়ঃ' (যাঁদের কীর্তি সর্বত্র প্রখ্যাত) বিশেষণে ভূষিত করেছে।** পরবর্তীকালে কোনো কোনো রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচ্য দেশকে বা পৌণ্ড্রদের যে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল, মৎস্য পুরাণ-এর এই প্রাচীন ও অকৃত্রিম শ্লোকটি তাকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেয়। **পুরাণের দৃষ্টিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমি ছিল পবিত্র এবং তাঁদের রাজকীয় কীর্তি ছিল ভারতবর্ষজুড়ে সমাদৃত।** প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ **ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল গ্রন্থে** উল্লেখ করেছেন যে, রাজা বলির পঞ্চ পুত্রের এই পৌরাণিক আখ্যানটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জনপদগুলোর সাথে উত্তর ভারতের বৈদিক আর্য সংস্কৃতির এক সম্মানজনক ও ইতিবাচক সংহতির ঐতিহাসিক প্রতিফলন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভৌগোলিক বিস্তার এবং সামরিক আধিপত্য কেবল প্রাচ্য ভারতের গঙ্গা ও করতোয়া নদীর অববাহিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁদের শৌর্য মধ্য ভারতের দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। মৎস্য পুরাণ-এর ১১৪তম অধ্যায়ে (ভুবনকোষ বা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা অংশে) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তিশালী ক্ষত্রিয় জনপদসমূহের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রাচ্য বিভাগের পাশাপাশি বিন্ধ্য পর্বতের মালভূমি অঞ্চলেও পৌণ্ড্রদের সুদৃঢ় অবস্থানের উল্লেখ রয়েছে। মৎস্য পুরাণ-এর (১১৪.৫৩–৫৪) শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে:

শ্লোক:

বোন্দ্রা (পৌণ্ড্রা) মাষদশানিশ্চ ভোজঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ ।

এতে জনপদাঃ খ্যাতা বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ ॥ ৫৪

(বাংলা অনুবাদ: পৌণ্ড্র (বা বোণ্ড্র), মাষদশা এবং কিষ্কিন্ধকদের সহিত ভোজ—এই সকল প্রসিদ্ধ জনপদ বিন্ধ্য পর্বতের পৃষ্ঠদেশে বা উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী হিসেবে খ্যাত।)

এই শ্লোকটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামরিক ও ভৌগোলিক ইতিহাসের এক যুগান্তকারী দলিল। **প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ড. দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর স্টাডিজ ইন দ্য জিওগ্রাফি অব অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিভ্যাল ইন্ডিয়া** গ্রন্থে পুরাণের ভুবনকোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, একটি শক্তিশালী জাতির বিভিন্ন শাখা যখন সামরিক অভিযান বা রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করত, তখন পুরাণকারগণ উভয় অঞ্চলেই তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করতেন। ভোজ এবং কিষ্কিন্ধকদের মতো প্রাচীন ভারতের প্রথম সারির যোদ্ধা গোষ্ঠীর সাথে পৌণ্ড্রদের একাসনে উল্লেখ করা প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা প্রাচ্যের মূল কেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধন শাসন করার পাশাপাশি মধ্য ভারতের বিন্ধ্য অঞ্চলের কৌশলগত ভূ-রাজনীতিতেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা মৎস্য পুরাণ-এর এই বিবরণকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। **ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া** গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদ সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মগধ ও কাশীর মতো মহাজনপদগুলোর সমকক্ষ ছিল। **বগুড়ার মহাস্থানগড়ে (প্রাচীন পুণ্ড্রনগর)** প্রাপ্ত মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী শিলালিপি, গুপ্ত যুগের তাম্রশাসন এবং সুসংগঠিত দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজাদের শাসনাধীনে এই অঞ্চলটি উন্নত নগর পরিকল্পনা, সমৃদ্ধ কৃষি ও বিলাসবহুল ক্ষৌম বা পট্টবস্ত্র শিল্পের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। **ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীহাররঞ্জন রায়ের** গবেষণাতেও প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র গঠনে পৌণ্ড্রদের এই অগ্রণী ভূমিকার কথা স্বীকৃত হয়েছে।

আধুনিক যুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মপরিচয় ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও মৎস্য পুরাণ-এর এই প্রামাণিক শ্লোকসমূহ প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। উনিশ ও বিশ শতকে **পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ করণ** প্রমুখ গবেষক ও সমাজসংস্কারকগণ মৎস্য পুরাণ, হরিবংশ এবং মহাভারত-এর শ্লোক উদ্ধৃত করে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেন যে, পৌণ্ড্ররা কখনোই নিম্নবর্ণ বা অনার্য ছিলেন না; বরং তাঁরা মহারাজ বলির ঔরসজাত ও মহর্ষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদপুষ্ট ‘বালেয় ক্ষত্রিয়’। রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব এবং পরবর্তীকালের সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতার কারণে তাঁরা সাময়িকভাবে উপবীত ও রাজকীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত

হলেও, তাঁদের ধমনীতে প্রাচীন ক্ষত্রিয় রক্তের ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মৎস্য পুরাণ-এ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা একাধারে পবিত্র, ইতিবাচক এবং গৌরবোজ্জ্বল। মহারাজ বলির তপস্যার উত্তরাধিকার, মহর্ষি দীর্ঘতমার ব্রহ্মতেজ, প্রাচ্যের পুণ্যভূমি পুণ্ড্রবর্ধনের সার্বভৌম শাসন এবং বিন্ধ্য পর্বতের মালভূমি পর্যন্ত সামরিক বিস্তার—এই সমস্ত কিছুই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রাচীন ভারতের এক প্রথম সারির রাজন্যশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মৎস্য পুরাণ তাঁদেরকে কেবল 'ক্ষত্রজ' বা 'বালেয় ক্ষত্রিয়' বলেই সম্মান জানায়নি, বরং তাঁদের রাজ্যকে পুণ্যভূমি ও প্রখ্যাত কীর্তির আধার বলে অভিহিত করেছে। প্রাচীন বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই গৌরবময় উত্তরাধিকার আজও তাঁদের আত্মপরিচয় ও ঐতিহাসিক মর্যাদার এক অক্ষয় স্তম্ভ হিসেবে বিরাজমান।

তথ্যসূত্রঃ

১. করণ, মহেন্দ্রনাথ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ। কলিকাতা, ১৯১৯।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

৩. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মৎস্যপুরাণম্ (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। অনুবাদ ও সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

৪. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

৫. Majumdar, R. C., editor. The History of Bengal: Volume I (Hindu Period). The University of Dacca, 1943.

৬. Pargiter, F. Eden. Ancient Indian Historical Tradition. Oxford University Press, 1922.

৭. Raychaudhuri, Hemchandra. Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. 5th ed., University of Calcutta, 1953.

৮. Sircar, D. C. Studies in the Geography of Ancient and Medieval India. Motilal Banarsidass, 1960.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র

-শ্রী হিরণ্যনাভ জানা

হরিবংশ পুরাণ, যা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত মহাভারতের এক অবিচ্ছেদ্য 'খিল' বা পরিশিষ্ট অংশ হিসেবে সুপরিচিত, প্রাচীন ভারতের মানচিত্রে প্রাচ্য জনপদসমূহের বিশেষ করে 'পৌণ্ড্র' জনপদের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক আলেখ্য উপস্থাপন করে। এই মহাপুরাণটি কেবল যদুবংশের ইতিহাস বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান নয়, বরং এটি আর্যাবর্তের পূর্ব প্রান্তের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের এক প্রামাণিক দলিল হিসেবে কাজ করে। হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদের আলোচনা দুটি প্রধান প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত—প্রথমত, রাজা বলির বংশধর হিসেবে পৌণ্ড্র জনপদের পবিত্র উৎপত্তি এবং দ্বিতীয়ত, পৌণ্ড্রক বাসুদেবের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরণ। এই জনপদটি প্রাচীন ভারতের এমন এক সমৃদ্ধ ভূখণ্ড হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, যা কৃষি, সংস্কৃতি এবং রাজতান্ত্রিক গৌরবে অনন্য ছিল।

হরিবংশ পুরাণের হরিবংশ পর্বের ৩১তম অধ্যায়ে পুরু বংশের রাজকীয় বংশলতিকা বর্ণনা করতে গিয়ে রাজা বলির কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এই কাহিনীটি কেবল একটি রাজবংশের সূচনা নয়, বরং এটি একটি বিশাল জনপদীয় সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আখ্যান। রাজা তিতিক্ষুর বংশে রাজা বলির জন্ম হয়েছিল, যিনি ছিলেন একজন মহাযোগী এবং অসীম প্রতাপশালী শাসক। হরিবংশের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি ধার্মিকতায় ছিলেন অটল এবং প্রজাপালনে ছিলেন বিষ্ণুর ন্যায়। রাজা বলির সন্তান লাভের কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। ঋষি গৌতম দীর্ঘতমা এবং রানী সুদেষ্ণার মাধ্যমে যে পাঁচজন বীর পুত্রের জন্ম হয়েছিল, তাঁরাই ছিলেন প্রাচ্য ভারতের পাঁচটি মহান জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। হরিবংশ পুরাণের (১.৩১.৩৩-৩৫) শ্লোকসমূহ এই ঘটনার সাক্ষী প্রদান করে:

বলির্নাম মহাযোগী প্রাগাসীনমর্ত্যধর্মবান্। স জজ্ঞে মানুষে লোকে সুবর্ণমযকোষবান্ ॥ ৩৩
তস্য পঞ্চ সুতা রাজন্ জজ্ঞিরে কুলবর্ধনাঃ। অঙ্গঃ প্রথমতস্তেষাং বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥ ৩৪
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চৈবেতি বলেঃ পুত্রাঃ স ক্ষত্রজাঃ। ব্রাহ্মণাশ্চৈব বলিনো জজ্ঞিরে চ মহীতলে॥ ৩৫

(অনুবাদ: প্রাচীনকালে মহাযোগী বলি নামে এক মর্ত্যধর্ম্মা রাজা ছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে সুবর্ণময় তূণীরধারী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে রাজন! তাঁর বংশ রক্ষার জন্য পাঁচটি বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের

মধ্যে অঙ্গ প্রথম, তারপর যথাক্রমে বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং কলিঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা বলির ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন এবং এই পৃথিবীতে তাঁরা ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও বলির বংশে অনেক বলবান ব্রাহ্মণও আবির্ভূত হয়েছিলেন।)

এই শ্লোকগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পৌণ্ড্র জনপদের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্ড্র ছিলেন একজন **'ক্ষত্রজ'** সন্তান, যাঁর জন্ম হয়েছিল এক ব্রহ্মর্ষির তেজে এবং এক রাজর্ষির আশ্রয়ে। এই সংমিশ্রণটি পৌণ্ড্র জনপদকে এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান করে। ঐতিহাসিক আর. সি. মজুমদার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাজা বলির সন্তানদের এই আখ্যানটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন উপজাতি বা জনপদের আর্যিকরণ প্রক্রিয়ার একটি ইতিবাচক প্রতিফলন। এই পুত্রগণ যে অঞ্চলে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নামানুসারেই সেই দেশগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল।

রাজা বলি তাঁর তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মা বা পরমপিতার কাছ থেকে যে বরসমূহ লাভ করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে পৌণ্ড্র জনপদের শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল। হরিবংশ পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, বলির পুত্রগণ কেবল বীর ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন অজেয় এবং ধার্মিক। মহারাজ বলির প্রাপ্ত বরসমূহ পৌণ্ড্র জনপদের শাসনব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সামগ্রিক ঐতিহ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর **'মহাতপস্বিত্ব'** লাভের ফলে পৌণ্ড্র অঞ্চলে আধ্যাত্মিক চেতনা ও তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বলির 'কল্পকালব্যাপী দীর্ঘায়ু'র প্রভাবে এই জনপদে গড়ে উঠেছিল এক দীর্ঘস্থায়ী ও সুদৃঢ় রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য। রণক্ষেত্রে তাঁর **'অজেয়ত্ব'** পৌণ্ড্র সেনাবাহিনীর মাঝে সঞ্চারিত করেছিল অদম্য বীরত্ব ও অপরাজেয় মানসিকতা। পাশাপাশি, তাঁর **'ধর্মীয় নেতৃত্ব'** (Dharma-Pravertakatva) রাজ্যজুড়ে বর্ণাশ্রম ধর্মের সুরক্ষা এবং একটি ন্যায়নিষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। সর্বোপরি, বলির 'ত্রিলোক দর্শন ও শ্রেষ্ঠ শক্তি'র প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল তৎকালীন কৌশলগত ভূ-রাজনীতিতে পৌণ্ড্র জনপদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমত্তা ও আধিপত্যের বিকাশে। এই বরসমূহের ফলে পৌণ্ড্র জনপদ কেবল একটি সাধারণ জনপদ থাকেনি, বরং এটি আর্যাবর্তের পূর্বভাগে একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছিল। **হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী** তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, **পৌণ্ড্ররা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং মগধের রাজাদের সাথে সমমর্যাদায় অবস্থান করত।**

হরিবংশ পুরাণের 'বিষ্ণু পর্ব' এবং 'ভবিষ্য পর্ব'-এ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কাহিনী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আলোচিত হয়েছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব কেবল পুণ্ড্র দেশের একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজেকে

'বাসুদেব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অনুকারী বলা হলেও, হরিবংশের ভাষ্যে তাঁর মধ্যে এক বিশাল আত্মপ্রত্যয় ও বীরত্বের ছাপ পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রক বাসুদেব বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই প্রকৃত অবতার এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ আসলে তাঁরই প্রাপ্য। এই বিশ্বাসটি নিছক অহংকার ছিল না, বরং এটি ছিল এক প্রকারের আধ্যাত্মিক আচ্ছন্নতা। তিনি কৃষ্ণের মতোই পীতবস্ত্র পরিধান করতেন, হাতে চক্র ও গদা ধারণ করতেন এবং গরুড় চিহ্নে চিহ্নিত রথে ভ্রমণ করতেন। হরিবংশ পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব তাঁর সারা জীবন কৃষ্ণের ধ্যানেই অতিবাহিত করেছিলেন, যদিও তা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে। বৈষ্ণব দর্শনে এই ভাবটিকে **'বিদ্বেষ ভক্তি' বা 'প্রতিকূল ভক্তি'** বলা হয়।

হরিবংশ পুরাণের ভবিষ্যৎ পর্বের ১০১তম অধ্যায়ে (পাউণ্ড্রকবধ অধ্যায়) এই দুই মহাপ্রতাপশালী বীরের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই যুদ্ধটি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না, বরং এটি ছিল দুটি আদর্শের মিলন। যুদ্ধের প্রারম্ভে পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তা অত্যন্ত নাটকীয় এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি দাবি করেছিলেন যে, প্রকৃত বাসুদেব তিনিই এবং কৃষ্ণ যেন তাঁর চিহ্নগুলো পরিত্যাগ করেন। যুদ্ধে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পরাক্রম দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হয়েছিলেন। হরিবংশ পুরাণের (৩.১০১.১৭) শ্লোকে এর স্বীকৃতি মেলে:

> **ততো বিস্ময়মাপন্নো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ১৭ অহো বীর্যমহো ধৈর্যমস্য পৌণ্ড্রস্য দুঃসহম্ ।**
>
> **(অনুবাদ: তখন দেবকীপুত্র ভগবান কৃষ্ণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তিনি বললেন, অহো! পৌণ্ড্রক কী অসাধারণ বীরত্ব এবং দুঃসহ ধৈর্য ধারণ করেছেন!)**

পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সাথে সমানে সমান যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি কেবল একজন সাধারণ রাজা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এক উচ্চস্তরের যোদ্ধা যিনি দিব্য অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন। এই বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্র জনপদের সামরিক শিক্ষা এবং রাজার বীরত্ব তৎকালীন ভারতে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিল।** পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কাহিনীর সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা। হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণের বর্ণনানুসারে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণের চক্রের দ্বারা নিহত হলেন, তখন তাঁর দেহ থেকে এক জ্যোতি নির্গত হয়ে শ্রীকৃষ্ণে লীন হলো। যেহেতু তিনি সর্বদা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন (অনুকরণের মাধ্যমে হলেও), তাই তিনি **'সারূপ্য মুক্তি'** লাভ করেছিলেন। সারূপ্য মুক্তি হলো এমন এক অবস্থা যেখানে ভক্ত ভগবানের ন্যায় রূপ

এবং গুণ লাভ করেন। হরিবংশ পুরাণের (৩.১০১.২৩-২৪) শ্লোকে বলা হয়েছে:

বিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্তথা শার্ঙ্গী নিত্যযুক্তঃ সদা হরিঃ । জঘান তেন গোবিন্দঃ পৌণ্ড্রকং নৃপসত্তমম্ ॥ ২৩ তস্য দেহং বিদার্যাশু চক্রং পিশিতভোজনম্ । কৃষ্ণস্যাথ করং ভূয়ঃ প্রাপ সর্বেশ্বরস্য হ ॥ ২৪

(অনুবাদ: বিষ্ণুস্বরূপ কৃষ্ণ, যিনি শার্ঙ্গ ধনু ধারণ করেন এবং সর্বদা যোগযুক্ত থাকেন, সেই গোবিন্দ তাঁর চক্রের দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রককে নিহত করলেন। সেই রক্তপায়ী চক্র পৌণ্ড্রকের দেহ বিদীর্ণ করে পুনরায় সর্বেশ্বর কৃষ্ণের হাতে ফিরে এল।)

এই মৃত্যুর পর পৌণ্ড্রক বাসুদেব বৈকুণ্ঠ লোকে স্থান পেয়েছিলেন বলে বৈষ্ণব আচার্যরা মত প্রকাশ করেন। এটি পৌণ্ড্র জনপদের রাজার এক অনন্য আধ্যাত্মিক গৌরব। তাঁর কাহিনী আমাদের শেখায় যে, **ভগবানের প্রতি নিরন্তর একাগ্রতা, তা যেকোনো ভাব থেকেই আসুক না কেন, তা পরম মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।**

হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদকে একটি সমৃদ্ধ ভূখণ্ড হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের মানচিত্রে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচ্য দেশের প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলটি ইক্ষু বা আখের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল, যেখান থেকেই 'পুণ্ড্র' শব্দটির উৎপত্তি বলে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন। হরিবংশের বিভিন্ন বর্ণনায় এই অঞ্চলের উর্বরতা এবং নদীমাতৃক সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। এই অঞ্চলের নদীমাতৃক পরিবেশ—বিশেষ করে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর অববাহিকায় অবস্থানের কারণে—এখানে কৃষিকাজে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৌণ্ড্র দেশের ক্ষৌম বস্ত্র ও রেশম, বিশেষত উন্নতমানের পট্টবস্ত্র বা দুকূল বস্ত্র, তৎকালীন প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত সমাদৃত ও বিলাসবহুল পণ্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। সামরিক শক্তিমত্তার দিক থেকে রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সমৃদ্ধ হস্তী ও রথ বাহিনী এবং রণসরঞ্জামের প্রাচুর্য এক অপরাজেয় ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর পরিচয় দেয়। এছাড়া, এই জনপদের সুসংগঠিত রাজধানী ও সুরক্ষিত দুর্গসমূহ এর উন্নত নগর পরিকাঠামো এবং প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরের সমৃদ্ধ স্থাপত্যরীতির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। **আর. সি. মজুমদার তাঁর 'দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, **পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন এবং শক্তিশালী কেন্দ্র।** হরিবংশ পুরাণের আখ্যানগুলো এই ঐতিহাসিক সত্যকেই সমর্থন করে যে, পৌণ্ড্র জনপদ ছিল একাধারে সম্পদশালী এবং বীরত্বপূর্ণ।

হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদকে আর্য সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করার একটি সুন্দর মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। হরিবংশ পৌণ্ড্রদের রাজা বলির ক্ষত্রিয় সন্তান হিসেবে মর্যাদা দিয়ে মূলধারার সামাজিক কাঠামোয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি একটি ইতিবাচক সামাজিক সংহতির নিদর্শন। **পৌণ্ড্র জনপদ ছিল বৈদিক ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলনস্থল।** রাজা বলির মহাযোগী হওয়ার বিবরণ এবং তাঁর পুত্রদের মাধ্যমে জনপদ স্থাপনের ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, এই অঞ্চলের শাসকরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। **আধুনিক ভারততত্ত্ববিদ ডি. সি. সরকার** তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, **পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।**

হরিবংশ পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সাথে কাশীরাজের অত্যন্ত গভীর মিত্রতা ছিল। কাশীরাজার পুত্র **সুদক্ষিণ** তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্র জনপদ তৎকালীন আর্যাবর্তের অন্যান্য প্রধান রাজ্যগুলোর সাথে দৃঢ় রাজনৈতিক ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। এই আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক পৌণ্ড্র জনপদকে একটি আঞ্চলিক শক্তি থেকে সর্বভারতীয় শক্তিতে উন্নীত করেছিল। হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্রদের **'বালীয়' বা বলির বংশধর** হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা তাঁদের এক বিশেষ আভিজাত্য প্রদান করে। এই বংশের রাজারা কেবল শাসনই করেননি, বরং তাঁরা ধর্মের রক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পৌণ্ড্র জনপদকে ভারতীয় পৌরাণিক ইতিহাসে এক সম্মানের আসনে বসিয়েছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা হরিবংশ পুরাণের এই কাহিনীগুলোকে নিছক গল্প হিসেবে দেখেন না। **হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাজা বলির পাঁচ পুত্রের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি প্রধান জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তারের রূপক মাত্র। আবার আর. সি. মজুমদার মনে করেন যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেবের শ্রীকৃষ্ণের সাথে দ্বন্দ্বটি আসলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তির সাথে দ্বারকা বা মথুরার ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি চিত্রায়ণ। হরিবংশ পুরাণ এই দ্বন্দ্বকে একটি মহান সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে, যেখানে বিজয়ী এবং পরাজিত উভয় পক্ষই এক দিব্য ঐক্যে লীন হয়েছে। এটিই ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক—যেখানে শত্রুও ভগবানের হাতে নিহত হয়ে মুক্তি লাভ করে।

হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদ এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যান আমাদের এক সমৃদ্ধ ও বীরত্বপূর্ণ অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা বলির তপস্যায় ধন্য এই ভূখণ্ড, যা মহর্ষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে পুষ্ট

হয়েছিল, তা চিরকালই ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। পৌণ্ড্র জনপদ কেবল আখের চাষ বা রেশম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল না, বরং এটি ছিল এমন এক দেশ যেখানে রাজারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্য চরম আত্মত্যাগ করতেও দ্বিধা করতেন না। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কাহিনী তাঁর চরিত্রের এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিবর্তনকে তুলে ধরে। **তাঁর 'বাসুদেব' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আসলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা দিব্যত্বেরই এক প্রতিফলন। হরিবংশ পুরাণ তাঁকে 'নৃপসত্তম' বা রাজশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে তাঁর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।**

পরিশেষে বলা যায়, হরিবংশ পুরাণে পৌণ্ড্র জনপদের বর্ণনা অত্যন্ত ইতিবাচক, তথ্যবহুল এবং সাংস্কৃতিক গরিমায় উজ্জ্বল। এটি প্রাচীন বাংলার এবং বৃহত্তর ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় যা আমাদের আত্মপরিচয় গঠনে আজও এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এই মহাপুরাণের প্রতিটি শ্লোক এবং আখ্যান আমাদের ঐতিহ্যের গভীরতাকে স্পর্শ করে এবং আমাদের এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে গর্বিত করে।

তথ্যসূত্রঃ

১. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। হরিবংশম্ (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। অনুবাদ ও সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

২. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ (বঙ্গানুবাদসহ)। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৮।

৩. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ (বঙ্গানুবাদসহ)। ইস্কন, মায়াপুর।

8. Majumdar, R. C., editor. The History of Bengal: Volume I (Hindu Period). The University of Dacca, 1943.

৫. Raychaudhuri, Hemchandra. Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. 5th ed., University of Calcutta, 1953.

৬. Sircar, D. C. Studies in the Geography of Ancient and Medieval India. Motilal Banarsidass, 1960.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

মনুসংহিতায় পৌণ্ড্র জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও সামাজিক মর্যাদা

- শ্রী সর্বদৃক সানা

মনুসংহিতা বা মানবধর্মশাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, আইন এবং আধ্যাত্মিক অনুশাসনের এক অনন্য আকর। এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বিভিন্ন সংকর জাতি এবং ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'পৌণ্ড্র' বা 'পুন্ড্র' জাতির উল্লেখ ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, পৌণ্ড্রদের আদি ক্ষত্রিয় বংশমর্যাদার স্বীকৃতি এবং তাঁদের 'ব্রাত্য' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মনুসংহিতা পৌণ্ড্রদের অত্যন্ত উচ্চবংশীয় এবং প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠী হিসেবেই চিত্রিত করেছে।

মনুসংহিতা কেবল একটি দণ্ডবিধি নয়, বরং এটি মানবজীবনের সামগ্রিক ‘ধর্ম’ বা কর্তব্যের পথনির্দেশিকা। এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য হলো চতুর্বর্ণের বিন্যাস—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। মনু স্পষ্টতই বলেছেন যে, এই চারটি বর্ণের বাইরে পঞ্চম কোনো বর্ণ নেই (মনুসংহিতা ১০.৪)। তবে সময়ের বিবর্তনে এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিচ্যুতির কারণে এই মূল বর্ণসমূহ থেকে বিভিন্ন উপবর্ণ বা উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে। **পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে মনুসংহিতার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ—তারা কোনো নিচু জাত বা সংকর বর্ণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেননি, বরং তারা ছিলেন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় যারা কালক্রমে বিশেষ কিছু কারণে ‘ব্রাত্য’ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।**

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে এই সামাজিক বিবর্তনের চিত্রটি ফুটে ওঠে। সেখানে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সকল জাতির তালিকায়, যারা মূলত ক্ষত্রিয় আভিজাত্যের অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতিই পৌণ্ড্রদের সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩ এবং ৪৪ নম্বর শ্লোক দুটি পৌণ্ড্রদের ইতিহাস পুনর্গঠনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। এখানে মনু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পৌণ্ড্রদের **‘ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ’ বা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দশম অধ্যায়ের ৪৩ নম্বর শ্লোকটি হলো:

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ । বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥"

অনুবাদ: পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত 'মনুসংহিতা' (নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ২৬৮) গ্রন্থে এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন: **"এই (বক্ষ্যমাণ) ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে (উপনয়নাদি) সংস্কারলোপ হেতু এবং বেদাংশ রূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের দর্শনাভাবে (অথবা ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শের অভাবে) শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।"**

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে তিনটি প্রধান বিষয় বেরিয়ে আসে যা পৌণ্ড্রদের মর্যাদাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে:

১. ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ (Kṣatriyajātyah): মনু এখানে সরাসরি 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো পৌণ্ড্রদের আদি উৎস বা বীজ হলো রাজকীয় ক্ষত্রিয় কুল। তাঁরা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল গোষ্ঠী নন। **২. শনকৈঃ (Śanakaiḥ):** এই শব্দটি নির্দেশ করে যে, পৌণ্ড্রদের এই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন একদিনে ঘটেনি। এটি একটি দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছিল। অর্থাৎ, তাঁদের আভিজাত্য দীর্ঘকাল ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। **৩. ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণাদর্শন:** এখানে পতন বা অবনমনের কারণ হিসেবে কোনো নৈতিক স্খলন বা হীন কাজের কথা বলা হয়নি। কারণটি সম্পূর্ণ আচারগত। তাঁরা উপনয়ন আদি সংস্কার করতে পারেননি এবং ব্রাহ্মণদের পরামর্শ বা সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিলেন। এটি মূলত তাঁদের ভৌগোলিক দূরত্ব বা স্বাধীনচেতা মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

পরবর্তী শ্লোকে মনু সেই সুউচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন জাতিগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন যারা পৌণ্ড্রদের সমগোত্রীয়:

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ । পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪ ॥"

অনুবাদ: পঞ্চানন তর্করত্ন (মনুসংহিতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ২৬৮) অনুযায়ী: **"পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ—এই সকল জাতি মূলত ক্ষত্রিয় ছিল।"**

এই শ্লোকে পৌণ্ড্রদের নাম তালিকার প্রথমেই রাখা হয়েছে। এটি পৌণ্ড্রদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের এক

বিরাট নিদর্শন। লক্ষ্যণীয় যে, পৌণ্ড্রদের সমান্তরালে যাঁদের নাম রয়েছে—যবন (গ্রীক), শক (সিদিয়ান), পহলব (পারস্যীয়) এবং চীন—তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বজয়ী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত। পৌণ্ড্রদের এই শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে একই সারিতে স্থান দেওয়া প্রমাণ করে যে, তৎকালীন ভারতের সমাজ-তাত্ত্বিকরা পৌণ্ড্রদের শৌর্য-বীর্য এবং আভিজাত্যকে কতটা সম্মানের চোখে দেখতেন। **পৌণ্ড্ররা কোনো বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ছিলেন না, বরং তাঁরা একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষত্রিয় নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।**

মনুসংহিতায় 'বৃষল' বা 'শূদ্রত্ব প্রাপ্ত' শব্দগুলো অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে একাডেমিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি কোনো জন্মগত হীনতা নয়, বরং একটি ধর্মীয় মর্যাদার পরিভাষা।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাত্যদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

"আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে । আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য আ চতুর্বিংশতেবির্শঃ ॥ ৩৮ ॥ অত ঊর্ধ্বং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ । সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ ॥ ৩৯ ॥"

অনুবাদ: পঞ্চানন তর্করত্ন (মনুসংহিতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৩৮) অনুযায়ী: **"ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে ২২ বছর বয়স পর্যন্ত উপনয়ন বা সাবিত্রী সংস্কারের সময় থাকে। এই সময় অতিক্রান্ত হলে সেই ব্যক্তি সংস্কারহীনতার কারণে 'ব্রাত্য' বা সাবিত্রী-পতিত হন।"**

পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে এই 'ব্রাত্য' অভিধাটি আসলে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্বেরই প্রমাণ। কারণ, একজন শূদ্রের কখনোই উপনয়ন হয় না, তাই তাঁর 'সাবিত্রী-পতিত' হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। কেবলমাত্র একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই সম্ভব যথাসময়ে সংস্কার না করার কারণে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হয়ে ওঠা। **মেধাতিথি** তাঁর ভাষ্যে (Manubhashya) স্পষ্ট করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা 'বৃষলত্ব' প্রাপ্ত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে এসে ধর্মীয় বিধিবিধানগুলো পুনরায় জাগ্রত করেননি। কিন্তু মেধাতিথি এও বলেন যে, এঁরা জাতিগতভাবে ক্ষত্রিয়ই রয়ে গেছেন, কেবল তাঁদের 'পদমর্যাদা' বা 'title' পরিবর্তন হয়েছে। এটি একটি

সংস্কারযোগ্য অবস্থা, কোনো স্থায়ী নিম্নজাত নয়।

মনুসংহিতার ভাষ্যকারদের মতে, **'বৃষল' শব্দের অর্থ এখানে 'ধর্মহীন' বা 'যিনি ধর্মীয় ক্রিয়া থেকে বিচ্যুত'**। পৌণ্ড্ররা শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য শাসন করতেন (যেমন পৌণ্ড্রবর্ধন)। এই স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তাঁরা হয়তো মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের কঠোর অনুশাসন মেনে চলেননি। মনুসংহিতা তাঁদের এই বীরত্ব এবং স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েও ধর্মীয় সংহতির খাতিরে তাঁদের 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসেবে চিহ্নিত করেছে ।

মনুসংহিতার দুজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার—**মেধাতিথি এবং কুল্লুক ভট্ট**—পৌণ্ড্রদের পরিচয় সম্পর্কে যে আলোকপাত করেছেন, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তথ্যসমৃদ্ধ। ৯ম শতাব্দীর মেধাতিথি তাঁর 'মনুভাষ্য'-এ (১০.৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বলেছেন যে, **'পৌণ্ড্র' মূলত দেশের নাম হলেও এখানে তা ক্ষত্রিয় জাতিকেই নির্দেশ করছে। তিনি পাণিনির ব্যাকরণ ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, এঁরা 'ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ' হিসেবেই সর্বজনবিদিত।** মেধাতিথি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন—তিনি বলেছেন যে, আর্যাবর্তের সীমান্তে বসবাসকারী এই জাতিগুলো (যেমন কিরাত, দরদ এবং পৌণ্ড্র) চতুর্বর্ণের কঠোর বিভাজনের বাইরে নিজেদের এক স্বতন্ত্র সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। এটি তাঁদের হীনতা নয়, বরং তাঁদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতারই পরিচয়।

১২শ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম প্রধান স্মৃতিশাস্ত্রবিদ **কুল্লুক ভট্ট** তাঁর **'মন্বর্থ-মুক্তাবলী'** ভাষ্যে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্বকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পৌণ্ড্রদের অবনমন কোনো স্থায়ী অভিশাপ নয়। তিনি এবং মেধাতিথি উভয়েই একমত যে, **এই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ না করার কারণেই 'শূদ্রবৎ' আচরণ প্রাপ্ত হয়েছেন।** কুল্লুক ভট্টের এই ব্যাখ্যা বাংলার পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়দের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দলিল, কারণ এটি প্রমাণ করে যে **জন্মসূত্রে তাঁদের রক্তে ক্ষত্রিয়ের বীরত্বই প্রবহমান।**

মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রদের এই উচ্চবংশীয় স্বীকৃতির নেপথ্যে রয়েছে এক বিশাল ঐতিহাসিক বাস্তবতা। পৌণ্ড্ররা প্রাচীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী জনপদ 'পুন্ড্র' বা 'পৌণ্ড্রবর্ধন'-এর শাসক

ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল উত্তর ও পূর্ব বাংলার এক সমৃদ্ধ অঞ্চল যার রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়। ঐতিহাসিক গবেষণা অনুযায়ী, এই অঞ্চলের শাসকরা শৌর্য-বীর্যে অন্য যে কোনো ক্ষত্রিয় বংশের সমকক্ষ ছিলেন। মনুসংহিতা যখন তাঁদের 'যবন' বা 'শক'-দের সঙ্গে তুলনা করে, তখন এটি আসলে তাঁদের সেই রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতাপেরই স্বীকৃতি দেয়। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রদের সম্পর্কে করা মন্তব্য কোনো কাল্পনিক কথা নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতির সামাজিক অবস্থানের শাস্ত্রীয় মূল্যায়ন।

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিশাল পরিবর্তন আসে। রাজবংশী এবং পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের হারানো ক্ষত্রিয় গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার ছিল মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের সেই ৪৩-৪৪ নম্বর শ্লোক। **মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং পঞ্চানন তর্করত্নের** মতো মহান পণ্ডিতগণ মনুসংহিতা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, **পৌণ্ড্ররা মূলত ক্ষত্রিয় ছিলেন যারা 'ব্রাত্য' বা 'সংস্কারহীন' অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা দেখান যে: ১. ব্রাত্যত্ব একটি সাময়িক অবস্থা। ২. 'ব্রাত্য-স্তোম' যজ্ঞের মাধ্যমে পুনরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব ফিরে পাওয়া সম্ভব। ৩. মনুসংহিতা নিজেই এই পুনরুদ্ধারের পথ বাতলে দিয়েছে।** এই ইতিবাচক ব্যাখ্যার ফলে হাজার হাজার পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় পুনরায় পৈতা গ্রহণ করেন এবং সমাজের মূলধারায় বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেন। এটি সম্ভব হয়েছিল কেবল মনুসংহিতায় তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ ছিল বলে।

মনুসংহিতা কেবল বংশের কথা বলে না, বরং কর্মের গুরুত্বও তুলে ধরে। পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে মনুর বক্তব্য হলো— বীর্যবান ক্ষত্রিয়ের যদি আচারগত ত্রুটি থাকে, তবে সমাজ তাঁকে 'বৃষল' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে, কিন্তু তাঁর ধমনীতে থাকা ক্ষত্রিয়ের রক্ত ও গুণকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় মনুসংহিতার এই নমনীয়তা এবং গতিশীলতাকে (Social Mobility) অত্যন্ত উচ্চমূল্যে দেখা হয়। মনুসংহিতা ১০.৬৫ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, **তপস্যা ও সৎকর্মের দ্বারা একজন ব্যক্তি তাঁর বর্ণের উৎকর্ষ ঘটাতে পারেন।** পৌণ্ড্রদের

জন্য এটি ছিল এক বিশাল আশার বাণী। তাঁরা তাঁদের শৌর্য, কৃষি এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে তাঁরাই এই মাটির আসল রক্ষক বা ক্ষত্রিয়।

মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রদের সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই তাঁদের অবমাননা নয়, বরং তাঁদের আভিজাত্যের এক অকাট্য শাস্ত্রীয় দলিল। মনু অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পৌণ্ড্রদের সেই সকল বিশ্বখ্যাত যোদ্ধা জাতির সমগোত্রীয় করেছেন যাদের শৌর্য সমকালীন বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল। 'ব্রাত্য' বা 'বৃষল' হওয়ার যে তাত্ত্বিক বর্ণনা মনু দিয়েছেন, তা মূলত পৌণ্ড্রদের স্বাধীনচেতা চরিত্র এবং ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বাইরে থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য শাসনেরই ফলশ্রুতি। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের মতো মনীষীদের অনুবাদ এবং মেধাতিথির ভাষ্য আমাদের শিখিয়েছে যে, মনুসংহিতার প্রতিটি শ্লোক গভীর অর্থবাহী। **পৌণ্ড্ররা 'ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ'—এই সত্যটি মনুসংহিতায় চিরস্থায়ীভাবে খোদাই করা আছে।** আধুনিক ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানও এই সত্যকে স্বীকার করে নেয় যে, **পৌণ্ড্ররা ছিলেন প্রাচীন বাংলার এক অপরাজেয় ক্ষত্রিয় শক্তি ও আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।** তাই মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রদের উল্লেখ তাঁদের ঐতিহাসিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের এবং আত্মপরিচয়ের এক সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।

তথ্যসূত্র:

১. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক ও অনুবাদক): মনুসংহিতা, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (১৯৮৮ খ্রি.), পৃষ্ঠা ২৬৮ (শ্লোক ১০.৪৩-৪৪)।

২. মেধাতিথি (ভাষ্যকার): মনুভাষ্য, অনুবাদ: গঙ্গানাথ ঝা (Wisdom Library, 2018), শ্লোক ১০.৪৩ ও ১০.৪৪-এর ব্যাখ্যা।

৩. মনুসংহিতা ২.৩৮-৩৯: ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সংজ্ঞা ও উপনয়ন কাল, পৃষ্ঠা ৩৮ (পঞ্চানন তর্করত্ন সংস্করণ)।

৪. মহাভারত ১৩.৩৩.২১ ও ১৩.৩৫.১৭-১৮: পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৃষলত্ব সম্পর্কিত তুলনা।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

রামায়ণে পৌণ্ড্র

- শ্রীঅমৃতপ সোম

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ কেবল ভারতীয় সাহিত্যের আদি মহাকাব্যই নয়, এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের এক আকর ঐতিহাসিক দলিল। রামায়ণের বিবরণী মহাকাব্যিক ইতিবৃত্তের কাঠামোয় তৎকালীন জম্বুদ্বীপের সুসংহত ভৌগোলিক মানচিত্রকে নিখুঁতভাবে ধারণ করেছে। এই বিস্তৃত ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন ভূখণ্ড হিসেবে ‘পৌণ্ড্র’ (বা পুণ্ড্র) বিশেষ মর্যাদায় উপস্থাপিত হয়েছে। মহাকাব্যে পৌণ্ড্রকে কোনো দুর্গম বা সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন জনপদ হিসেবে চিত্রিত করা হয়নি; বরং এটি কৃষি প্রাচুর্য, নাগরিক সভ্যতা, উন্নত কুটির ও বস্ত্রশিল্প এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ইতিবাচক জনপদ হিসেবে প্রতিভাত।

বাল্মীকি রামায়ণের মূল পাঠ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমগ্র কাব্যের মধ্যে ‘কিষ্কিন্ধাকাণ্ড’-এর সীতা-অন্বেষণ পর্বে পৌণ্ড্র জনপদের ভৌগোলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক সীমান্ত এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সুস্পষ্ট বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র ও বানররাজ সুগ্রীব যখন নিখিল ভারতের চার প্রান্তে তাঁর অভিযাত্রী বাহিনীকে প্রেরণ করেন, তখন প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের তালিকায় পৌণ্ড্রকে এক অগ্রগণ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মহাকাব্যের এই বিবরণ পৌণ্ড্র সভ্যতার প্রাচীনত্ব, ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক ভিত্তিকে প্রামাণ্য রূপ দান করে।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪০তম সর্গে বানররাজ সুগ্রীব **প্রধান সেনাপতি বিনতের** নেতৃত্বে এক লক্ষ অভিজ্ঞ বানর সেনাকে পূর্ব দিকের জনপদসমূহে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেন। এই পর্বে সুগ্রীব হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অববাহিকা অতিক্রম করে পূর্ব সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ দেন। গঙ্গা (ভাগীরথী), সরযূ, কৌশিকী, যমুনা এবং শোণ নদের মতো প্রধান নদনদী অতিক্রম করে প্রাচ্যের যে সকল শক্তিশালী ও বর্ধিষ্ণু রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে পৌণ্ড্র অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত:

"ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্
কাশিকোসলান্।
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রান্
বঙ্গাংস্তথৈব চ॥
পত্তনং কোশকারাণাং ভূমিং চ
রজতাকরাম্॥"
(বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪০.২২-২৩)

বাংলা উচ্চারণ:

ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্
কাশিকোশলান্।

মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রান্ বঙ্গাংস্তথৈব চ॥

পত্তনং কোশকারাণাং ভূমিং চ রজতাকরাম্॥

বাংলা অনুবাদ:

"[সীতার সন্ধানে পূর্বদিকে গিয়ে তোমরা] ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী ও কোশল; এবং মগধের বিশাল ও সমৃদ্ধ জনপদসমূহ, পুণ্ড্র ও সেইরূপ বঙ্গদেশে অন্বেষণ করবে; এবং যেখানে রেশমকীটপালক বস্ত্রশিল্পীদের প্রধান নগর/বন্দর রয়েছে সেই ভূমি এবং রৌপ্যের খনির ন্যায় সমৃদ্ধ ভূখণ্ডেও [অনুসন্ধান চালাবে]।"

উক্ত মূল সংস্কৃত শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে পৌণ্ড্রের অবস্থানগত তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এখানে পৌণ্ড্রকে বিদেহ, কাশী, কোশল ও মহাশ্রামযুক্ত মগধের পরেই এবং বঙ্গের সমান্তরালে স্থাপন করা হয়েছে। ভৌগোলিক অনুক্রম অনুসারে এটি আধুনিক উত্তরবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন নদীমাতৃক সমভূমিকে নির্দেশ করে। মহাকাব্যে পৌণ্ড্রকে একটি একক ও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে মগধ ও বঙ্গের সাথে একই মর্যাদায় চিত্রিত করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে **রামায়ণ যুগে পৌণ্ড্র ছিল পূর্ব ভারতের প্রধান জনপদসমূহের অন্যতম চালিকাশক্তি।**

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪১তম সর্গে যুবরাজ অঙ্গদ, নীল এবং হনুমানের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিশায় প্রেরিত বাহিনীর যাত্রাপথের বিবরণেও পৌণ্ড্রের নাম পুনরুল্লেখিত হয়েছে। গোদাবরী ও অন্যান্য দক্ষিণী নদী অববাহিকা এবং দণ্ডকারণ্য অতিক্রমের নির্দেশনায় বলা হয়েছে:

"তথা বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ।
অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্বতনদীগুহম্॥
নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যত।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্॥"
(বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৪১.১১-১২)

বাংলা উচ্চারণ:

তথা বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ।

অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্বতনদীগুহম্॥

নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যত।

তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্॥

বাংলা অনুবাদ:

"তেমনি চারিদিকের বঙ্গ, কলিঙ্গ ও কৌশিক অঞ্চলসমূহ এবং পর্বত, নদী ও গুহাসমেত সমগ্র দণ্ডকারণ্য তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ

করবে। গোদাবরী নদীর সমগ্র অববাহিকা ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে; এবং একইভাবে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল দেশসমূহেও পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান চালাবে।"

দক্ষিণের অভিযানের তালিকায় অন্ধ্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলের সাথে পৌণ্ড্রের এই সহাবস্থান প্রাচীন ভারতীয় সমুদ্রোপকূলবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটায়। **রামায়ণের বর্ণনায় দেখা যায়, পূর্ব সমুদ্রের মোহনা থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় বাণিজ্যিক পথে পৌণ্ড্রের নৌ-যোগাযোগ ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্প্রসারিত ছিল। মহাকাব্যে একই সাথে পূর্ব ও দক্ষিণের অভিযাত্রী তালিকায় পৌণ্ড্রের অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রমাণ করে যে এর ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও কৌশলগত গুরুত্ব উভয় দিকেই স্বীকৃত ছিল।**

বাল্মীকি রামায়ণে পৌণ্ড্র ভূখণ্ডের চিত্রায়নে কেবল রাজনৈতিক সীমারেখাই টানা হয়নি, বরং এই জনপদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিবাচক লক্ষণসমূহ প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহাকাব্যে পৌণ্ড্র সম্পর্কিত বিবরণ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। মহাকাব্যের শ্লোকে মগধ ও পৌণ্ড্রের ক্ষেত্রে **"মহাগ্রামান্" (মহাশ্রামযুক্ত)** অভিধা প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় মহাশ্রাম বলতে বোঝাত বিপুল আয়তনের জনবহুল, স্থায়ী ও শস্য-শ্যামল পল্লিপ্রধান বসতি। গঙ্গা ও কৌশিকীর পলিবিধৌত পৌণ্ড্র অঞ্চলের মাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর, যা প্রাচ্য ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত দান করেছিল। এই বর্ণনা নিশ্চিত করে যে রামায়ণ যুগে পৌণ্ড্র ছিল খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত ও সমৃদ্ধ এক সুরক্ষিত ভৌগোলিক অঞ্চল।

পৌণ্ড্র ও বঙ্গের বর্ণনার অব্যবহিত পরেই রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে "पत्तनं कोशकाराणां"। সংস্কৃত সাহিত্যে ‘কোশকার’ বলতে রেশমকীট প্রতিপালনকারী এবং রেশম বস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। ‘পত্তন’ শব্দের অর্থ সুসংগঠিত বাণিজ্যিক নগরী বা বন্দর। রামায়ণের এই সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্র ও তার সংলগ্ন ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক মানের রেশম উৎপাদন কেন্দ্র ও বাণিজ্য নগরী। **তৎকালীন যুগে পট্টবস্ত্র ও রেশম ছিল পরম আভিজাত্যের প্রতীক, যা পৌণ্ড্রের অধিবাসীদের কারিগরি দক্ষতা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির ইতিবাচক পরিচায়ক।**

মহর্ষি বাল্মীকি পৌণ্ড্র সংলগ্ন অঞ্চলকে "भूमिं च रजताकराम्" অর্থাৎ রূপার খনি বা রৌপ্যভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ভূমি হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন অর্থনীতির ভিত্তি ছিল মূল্যবান ধাতু ও মুদ্রা ব্যবস্থা। পূর্ব ভারতে

রূপার খনির এই উল্লেখ প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্র কেবল কৃষিজীবী অঞ্চল ছিল না, বরং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য একে তৎকালীন জম্বুদ্বীপের অন্যতম ধনী ও স্বনির্ভর রাজ্যে পরিণত করেছিল। রৌপ্য ও ধাতব বাণিজ্যের সংযোগস্থল হিসেবে পৌণ্ড্র ছিল অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

বাল্মীকি রামায়ণে সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি সংহত সাংস্কৃতিক বলয় হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি জনপদের নিজস্ব সামাজিক ও ভৌগোলিক সত্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই মহাকাব্যিক ভূগোলে পৌণ্ড্র জনপদের মর্যাদা অত্যন্ত সুউচ্চ। **প্রথমত,** শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ বা সুগ্রীবের সীতা-অন্বেষণ—উভয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই ভারতের যে রাষ্ট্রসমূহের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, পৌণ্ড্র তার মধ্যে অগ্রগণ্য। সুগ্রীবের ভূ-জ্ঞান রামায়ণে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে, এবং তিনি তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পৌণ্ড্রের নদী, গিরি-দুর্গ ও নগরসমূহে অতি সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান চালাতে। এটি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রের ভূখণ্ড ছিল সুবিস্তীর্ণ এবং এর নগর ও শাসনব্যবস্থা ছিল সুসংগঠিত।

দ্বিতীয়ত, পৌণ্ড্র জনপদ প্রাচীন ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের সেতুবন্ধন হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। পূর্বের অভিযানে এটি যেমন গঙ্গা-কৌশিকী অববাহিকার শেষ প্রান্তের শক্তি হিসেবে দেখা দেয়, তেমনই দক্ষিণের তালিকায় এটি সামুদ্রিক উপকূলীয় পথ ধরে দক্ষিণ ভারতের সাথে যুক্ত হয়। কোনো প্রকার হীনতা বা নেতিবাচকতা ব্যতিরেকে বাল্মীকি রামায়ণে পৌণ্ড্রকে একটি স্বতন্ত্র, মর্যাদাপূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রবর্তী দেশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণে পৌণ্ড্র জনপদের বিবরণ প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ ও ইতিহাসসম্মত ভূগোলের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। মহাকাব্যের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, পৌণ্ড্র ছিল কৃষিভিত্তিক ‘মহাশ্রাম’, রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র ‘কোশকার পত্তন’ এবং বহুমূল্য ‘রৌপ্য আকর’-এ সমৃদ্ধ এক অগ্রগামী রাষ্ট্র। আর্যাবর্তের মূল জনপদ কাশী, কোশল ও মগধের পাশাপাশি পৌণ্ড্রের সমমর্যাদাপূর্ণ উল্লেখ নিশ্চিত করে যে, **মহাকাব্যিক যুগে এই অঞ্চল সভ্যতা, বাণিজ্য ও ভৌগোলিক বিস্তৃতির দিক থেকে এক গৌরবোজ্জ্বল শিখরে অবস্থান করছিল এবং আর্য সভ্যতার অন্তর্গত ছিল।** মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর সুনিপুণ লেখনীতে পৌণ্ড্রকে যে ইতিবাচক ও শ্রদ্ধাশীল স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা প্রাচ্য ভারতের এই প্রাচীন জনপদের ঐতিহাসিক মর্যাদা ও সার্বভৌম অস্তিত্বের এক চিরন্তন সাক্ষ্য বহন করে।

তথ্যসূত্রঃ

১. দেবরয়, বিবেক, অনুবাদক। দ্য বাল্মীকি রামায়ণ. ভলিউম ২, পেঙ্গুইন বুকস ইন্ডিয়া, ২০১৭।

২. শাস্ত্রী, হরি প্রসাদ, অনুবাদক। দ্য রামায়ণ অব বাল্মীকি (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড). শান্তি সদন, লন্ডন, ১৯৫২।

৩. শ্রীমদ্বাল্মীকি-রামায়ণম্ (মূল সংস্কৃত ও হিন্দি অনুবাদ সহ). গোরখপুর: গীতা প্রেস, সংস্করণ ২০২১।

৪. মজুমদার, রমেশচন্দ্র. দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দ্য ইন্ডিয়ান পিপল: দ্য বৈদিক এজ. ভারতীয় বিদ্যা ভবন, ১৯৫১।

৫. সরকার, দীনেশচন্দ্র. স্টাডিজ ইন দ্য জিওগ্রাফি অব এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মেডিভাল ইন্ডিয়া. মতিলাল বনারসীদাস, ১৯৭১।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

ভারতবর্ষে প্রায় ৩ হাজারের বেশি খ্রিষ্টীয় সংস্থা এবং প্রায় ২৭০০-এর বেশি ইসলামী সংস্থা ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে (অবক্ষয়িত তপশিলী সমাজ- শ্রী প্রশান্ত প্রামানিক) অথচ আমরা সব ধর্ম সমান বা যত পথ তত মত জপ করে চলেছি। যদি সব ধর্ম সমান হয় বা সব পথে ইশ্বরকে পাওয়া যায় তবে ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন কোথায় ? তাহলে কেন ধর্মান্তরকরণ করা হয় ? এ বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে এবং নিজ দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।

-পত্রিকা সম্পাদক।।

মহাভারতে পৌণ্ড্র

- শ্রীপুস্করাক্ষ পৌণ্ড্র

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসপ্রণীত মহাকাব্য **'মহাভারত'** কেবল কুরু-পাণ্ডবদের গৃহবিবাদের বিবরণ নয়, বরং এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র, সামাজিক বিবর্তন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক জনপদের শৌর্য ও মর্যাদার এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল। মহাকাব্যের এই বিশাল ক্যানভাসে প্রাচ্য ভারতের যে জনপদটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে, তা হলো 'পৌণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্র'। মহাভারতের আদিপর্ব থেকে শুরু করে সভাপর্ব, বনপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব এবং শান্তিপর্ব পর্যন্ত পৌণ্ড্রদের রাজবংশীয় কৌলীন্য, অপরাজেয় সামরিক সক্ষমতা, সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিধৃত রয়েছে। প্রাচ্যের অন্যান্য শক্তির ন্যায় পৌণ্ড্ররা কোনো গৌণ বা প্রান্তিক সত্তা ছিল না; বরং মহাকাব্যিক ভূগোলে তারা একটি সুসংহত, সার্বভৌম এবং আর্য ক্ষাত্রধর্মের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত 'সম্ভবপর্বে' পৌণ্ড্র জনপদের আদিপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বর্ণিত হয়েছে (*মহাভারত*, আদিপর্ব ১০৪তম অধ্যায়)। মহাকাব্যের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী, প্রখ্যাত বালেয়

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বলি ছিলেন অপুত্রক। চন্দ্রবংশের অন্যতম প্রধান শাখা অনু বা অনব বংশের অধিপতি ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা বলি। বংশরক্ষার নিমিত্তে তিনি মহর্ষি উতথ্য ও মমতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বেদজ্ঞ মহাতপস্বী দীর্ঘতমাকে আহ্বান করেন এবং নিজ পত্নী রানী সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের অনুরোধ জানান। মহর্ষি দীর্ঘতমার কঠোর ব্রহ্মতেজ এবং মহিষী সুদেষ্ণার ক্ষত্রিয় রক্তের শুভ সংযোগে পাঁচটি মহাতেজস্বী পুত্রের জন্ম হয়। এই পঞ্চপুত্র হলেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। মহর্ষি দীর্ঘতমা সন্তুষ্ট হয়ে এই পঞ্চপুত্রকে আশীর্বাদ করেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান, অজেয় ও নীতিবান নরপতি হবেন এবং তাঁদের নামানুসারেই পৃথিবীর পাঁচটি সমৃদ্ধ জনপদ চিরস্মরণীয় থাকবে। মহাকাব্যে এই ভ্রাতৃবৃন্দ ও তাঁদের উত্তরসূরিদের সম্মিলিতভাবে 'বালেয় ক্ষত্রিয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। (আধুনিক যুগে মেদিনীপুরের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ারা ‘বালেয়’ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত) মহাভারতের এই বিবরণ স্পষ্ট নির্দেশ করে যে পৌণ্ড্রদের রাজবংশটি অঙ্গিরস গোত্রীয় ঋষির তপঃপ্রসূত জ্ঞান এবং প্রাচ্য রাজকীয় ক্ষমতার সংমিশ্রণে গঠিত। ফলে মহাকাব্যের প্রারম্ভেই পৌণ্ড্রদের কৌলীন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

পরবর্তীতে আদিপর্বের 'স্বয়ংবরপর্বে' পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের শীর্ষস্থানীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে পৌণ্ড্রাধিপতিকে একই রাজমর্যাদায় সমাসীন দেখা যায়। কলিঙ্গ, বঙ্গ, মদ্র এবং কৌরব রাজকুমারদের পাশাপাশি পৌণ্ড্র নরপতির উপস্থিতি তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে পৌণ্ড্রদের স্বীকৃত আভিজাত্য ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

মহাভারতের সভাপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সার্বভৌম রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি উপলক্ষে পাণ্ডবদের চতুর্দিক জয়ের অভিযান বর্ণিত হয়েছে। সভাপর্বের ৩০তম অধ্যায়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের পূর্ব দিগ্বিজয়ের বিবরণে পৌণ্ড্র জনপদের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও সামরিক সক্ষমতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভীমসেন সুহ্মদেশ ও মগধের নিকটবর্তী অঞ্চল জয় করে সমুদ্রোপকূলবর্তী ও কৌশিকী (কোশী) নদী তীরবর্তী পূর্বপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হলে পৌণ্ড্র রাজশক্তি তাঁকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি করে। মহাভারতের সংস্কৃত পাঠে এই সংঘাতের বর্ণনা অত্যন্ত ইতিবাচক বিশেষণে চিত্রিত হয়েছে:

"স পৌণ্ড্রকাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ। নির্জিত্য সমরে বীরো..."(মহাভারত, সভাপর্ব ৩০.১৯-২০)

বঙ্গানুবাদ:

"সেই বীর (ভীমসেন) পুণ্ড্রদেশের অধিপতি মহাবলবান বীর বাসুদেব (পৌণ্ড্রক বাসুদেব) এবং কৌশিকী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী মহাতেজস্বী রাজা—এই উভয় সৈন্যবলসম্পন্ন ও তীব্র পরাক্রমশালী বীরকে যুদ্ধে পরাজিত করে..."

মহাকাব্যকার এখানে **পৌণ্ড্রাধিপতিকে "মহাবল", "বীর" এবং "তীব্রপরাক্রমী" যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।** কৌশিকী নদীর কূলবর্তী অঞ্চল থেকে বর্তমান উত্তর ও মধ্যবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত পৌণ্ড্র জনপদটি ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। ভীমসেনের ন্যায় অমিতবিক্রমী বীরকেও পৌণ্ড্রাধিপতি এবং কৌশিকী অঞ্চলের শাসকের সম্মিলিত প্রতিরোধ ভাঙতে পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর পৌণ্ড্ররাজ যুধিষ্ঠিরের সার্বভৌমিকতাকে স্বীকৃতি দেন এবং মিত্রতা স্থাপন করে রাজসূয় যজ্ঞের জন্য বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন প্রদান করেন। এই আখ্যান প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্র রাজ্য কোনো দুর্বল প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল না, বরং তাদের সীমান্ত প্রতিরক্ষা ও সামরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত।

মহাভারতের **রাজনীতিতে পৌণ্ড্রদের** অন্যতম প্রভাবশালী রূপ প্রকাশিত হয়েছে মগধরাজ জরাসন্ধের মৈত্রীজোটের প্রেক্ষাপটে। সভাপর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সমকালীন ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানান যে, পৌণ্ড্র রাজ্যের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন পূর্ব ভারতের একজন একচ্ছত্র শক্তিশালী সম্রাট। তিনি মগধের জরাসন্ধের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা স্থাপন করে নিজস্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলয় তৈরি করেছিলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পরাক্রম এতই অপ্রতিরোধ্য ছিল যে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন শক্তির অক্ষ গড়ে উঠেছিল। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর সাথে কৃষ্ণের সংঘাতের আভাস পাওয়া যায়, তথাপি মহাভারতের মূল বয়ানে পৌণ্ড্রাধিপতির রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রতাপ ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত।

রাজনীতির পাশাপাশি মহাভারতে **পৌণ্ড্রদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও** স্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে। সভাপর্বের অর্ঘ্যাহরণ ও দ্যূতপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজন্যবর্গের প্রদত্ত উপহারের তালিকায় পৌণ্ড্রদের উপঢৌকন ছিল চোখধাঁধানো। তারা ইন্দ্রপ্রস্থের রাজদরবারে নিয়ে এসেছিল সমুদ্র ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত উজ্জ্বল মণিমাণিক্য, সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত বহুমূল্য বস্ত্র, উৎকৃষ্ট প্রজাতির রণহস্তী এবং রত্নখচিত স্বর্ণপাত্র। মহাভারতের এই তথ্য নির্দেশ করে যে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, হস্তিশিল্প ও বস্ত্রশিল্পে এক ঈর্ষণীয় সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

মহাভারতে পৌণ্ড্রদের দেশ কেবল রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং মহাকাব্যের ধর্মতাত্ত্বিক ভূগোলে এটি একটি **পবিত্র তীর্থভূমি** হিসেবেও পূজিত হয়েছে। বনপর্বের 'তীর্থযাত্রা পর্বে' দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি পুলস্ত্যের কথোপকথনে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে পৌণ্ড্র জনপদের প্রধান নদী করতোয়ার মাহাত্ম্য অসামান্য মর্যাদায় উপস্থাপিত হয়েছে (*মহাভারত*, বনপর্ব ৮৩তম অধ্যায়):

"করতোয়াং সমাসাদ্য
ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি
প্রজাপতিকৃতো বিধিঃ॥"
(মহাভারত, বনপর্ব ৮৩.২)

শ্লোকটিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, **পুণ্যতোয়া করতোয়া নদীতে উপনীত হয়ে তিন রাত্রি সংযম ও উপবাস পালন করলে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য পরম ফল লাভ করে, যা স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়েছে।** মহাভারতে যে কয়েকটি মাত্র নদীকে অশ্বমেধের ন্যায় সর্বোচ্চ বৈদিক যজ্ঞের ফলপ্রদায়িনী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, করতোয়া তাদের অন্যতম। **পৌণ্ড্র জনপদের হৃদয় ভেদ করে প্রবাহিত এই নদীর মহিমা সমগ্র পৌণ্ড্র ভূমিকেই আর্যাবর্তের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় তীর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।**

কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিনের ধর্মযুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের সাথে পৌণ্ড্র যোদ্ধারাও তাঁদের সুবিশাল রণহস্তী বাহিনী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের সামরিক ইতিহাসে পৌণ্ড্ররা তাদের সুপ্রশিক্ষিত হস্তিসেনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্বের যুদ্ধবর্ণনায় পৌণ্ড্রদের রণনৈপুণ্য বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব সেনাপতিদের অন্যতম ভরসা ছিল প্রাচ্যের হস্তীবাহিনী। দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্বে দেখা যায়, কৌরব অক্ষৌহিণীর ব্যূহমুখে পৌণ্ড্র, মাগধ ও তাম্রলিপ্তের হস্তীসেনারা অভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল:

"পৌণ্ড্রাশ্চ মাগধাশ্চৈব
তাম্রলিপ্তকাস্তথা..." (মহাভারত,
কর্ণপর্ব ২২.৩)

পর্বতপ্রমাণ রণহস্তীর পিঠে চড়ে পৌণ্ড্র ধনুর্ধর ও তোমরচালকেরা পাণ্ডব মহারথীদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শানিয়েছিলেন। কর্ণপর্বের অষ্টম ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, **পৌণ্ড্র অধিপতি ও তাঁর অনুগত বীরেরা অর্জুন, ভীম ও সাত্যকির মতো অপরাজেয় মহাবীরদের ব্যূহ ভেদ করতে সম্মুখ সমরে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন।** যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা কৌরবপক্ষে ক্ষাত্রধর্মের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং সমরাঙ্গনে আত্মোৎসর্গ করে বীরস্বর্গ লাভ করেন। মহাভারতে পৌণ্ড্রদের এই যুদ্ধরীতিকে কোনো সাধারণ লড়াই হিসেবে নয়, বরং রাজধর্মের প্রতি

বিশ্বস্ত ও শৌর্যমণ্ডিত আত্মবলিদান হিসেবে মূল্যায়িত করা হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বের **'রাজধর্মানুশাসন পর্বে' পিতামহ ভীষ্ম রাজা মান্ধাতা ও দেবরাজ ইন্দ্রের একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথন** উদ্ধৃত করেছেন (*মহাভারত*, শান্তিপর্ব ৬৫তম অধ্যায়)। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের জনপদসমূহের সমাজ ও ধর্মীয় কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রদের নাম গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্দ্রের নীতিবাক্য অনুসারে, **পৌণ্ড্র জনপদের অধিবাসীরা কোনোভাবেই ধর্মের অধিকার থেকে বিচ্যুত নন। তারা মাতা-পিতার সেবা, গুরুভক্তি, বেদবিহিত যাগযজ্ঞের আনুকূল্য, সততা এবং অহিংসার মতো সার্বজনীন গুণাবলী অনুশীলনের মাধ্যমে পরম শ্রেয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করতে সক্ষম। মহাভারতের নৈতিক দর্শনে পৌণ্ড্রদের এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে যে, মহাকাব্যীয় সমাজব্যবস্থায় পৌণ্ড্ররা ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমমর্যাদাপ্রাপ্ত এক বিশিষ্ট আর্য জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত ছিল।**

মহাভারতের আখ্যানভাগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৌণ্ড্র জনপদ ও এর অধিবাসীরা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আদিপর্বের সম্ভবপর্বে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হয়েছে যে, ঋষি দীর্ঘতমা ও রানী সুদেষ্ণার ঔরসে পৌণ্ড্রদের আদিপুরুষ পুণ্ড্রের জন্ম হয়, যা সনাতন ঐতিহ্যে ঋষিতুল্য ব্রহ্মতেজ ও বালেয় রাজকীয় শৌর্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক মিলনকে নির্দেশ করে। পরবর্তীতে স্বয়ংবরপর্বে (১৮৬ অধ্যায়) দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় সমগ্র ভারতবর্ষের শীর্ষ রাজন্যবর্গের সাথে পৌণ্ড্রপতির সমমর্যাদায় উপস্থিতি তৎকালীন সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজে তাদের সমকক্ষ সার্বভৌম রাজনৈতিক স্বীকৃতিরই প্রতিফলন ঘটায়।

সভাপর্বের বিবরণীতে পৌণ্ড্রদের ভূ-রাজনৈতিক পরাক্রম ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জরাসন্ধবধ পর্বে (১৪ অধ্যায়) পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ভূ-রাজনৈতিক শক্তি ও মৈত্রীজোটের মধ্য দিয়ে পূর্ব ভারতে এক শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। দিগ্বিজয় পর্বে (৩০ অধ্যায়) পাণ্ডব বীর ভীমসেনের পূর্ব অভিযানের বিরুদ্ধে পৌণ্ড্রদের প্রতিরোধ তাদের সুসংগঠিত সামরিক শক্তি ও বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক আধিপত্যকে প্রমাণ করে। সামরিক শক্তির পাশাপাশি এই জনপদ যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রগণ্য ছিল, তার প্রমাণ মেলে অর্ঘ্যাহরণ ও দ্যূতপর্বে (৫১-৫২ অধ্যায়); যেখানে রাজসূয় যজ্ঞে মহার্ঘ রত্ন, হস্তিদন্ত ও সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদের বিপুল অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে।

শুধু রাজনীতি বা সমরনীতি নয়, মহাকাব্যিক ভূগোল ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলেও পৌণ্ড্রভূমি ছিল অত্যন্ত সমাদৃত। বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বে (৮৩ অধ্যায়) পৌণ্ড্রভূমির অন্তর্গত পবিত্র করতোয়া নদীতে তিন রাত্রি বাসের মাহাত্ম্যকে বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞতুল্য পুণ্যপ্রদায়িনী তীর্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ভীষ্মপর্বের জম্বুখণ্ড-বিনির্মাণ পর্বে (৯ অধ্যায়) ভারতবর্ষের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ জনপদসমূহের তালিকায় পুণ্ড্রের অন্তর্ভুক্তি মহাকাব্যিক অখণ্ড ভারতের মূল ভূখণ্ডীয় সংহতিতে এর অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধেও পৌণ্ড্র যোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। দ্রোণপর্ব (১৯ অধ্যায়) এবং কর্ণপর্বে (৮ ও ২২ অধ্যায়) কৌরব পক্ষের বিভিন্ন সামরিক ব্যূহে পৌণ্ড্র হস্তীবাহিনী ও ধনুর্ধরদের মরণপণ লড়াই রণহস্তী পরিচালনায় তাদের অদ্বিতীয় রণনৈপুণ্য ও বীরোচিত আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করেছে। পরিশেষে, শান্তিপর্বের রাজধর্মানুশাসনে (৬৫ অধ্যায়) চক্রবর্তী রাজা মান্ধাতার প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের উপদেশে পৌণ্ড্রদের নিজস্ব ধর্মাচরণ ও আধ্যাত্মিক বিধির উল্লেখ নিশ্চিত করে যে, প্রাচীন ভারতের বৃহৎ সমাজব্যবস্থা ও সনাতন ঐতিহ্যে পৌণ্ড্ররা কোনো প্রান্তিক গোষ্ঠী ছিলেন না, বরং পূর্ণাঙ্গ ও ইতিবাচক মর্যাদায় স্বীকৃত এক গৌরবোজ্জ্বল জাতি ছিলেন। মহাভারতের সামগ্রিক টেক্সট পর্যালোচনা করলে এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট হয় যে, পৌণ্ড্রদের চিত্রায়ন মহাকাব্যে অত্যন্ত ইতিবাচক, বীরত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত। মহাভারতের পাতায় পৌণ্ড্র তাই কেবল একটি প্রাচ্য জনপদ নয়, বরং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, শৌর্য, সমৃদ্ধি এবং বৈদিক আর্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক জ্যোতির্ময় স্তম্ভ।

তথ্যসূত্রঃ

১. The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Translated into English Prose from the Original Sanskrit Text by Kisari Mohan Ganguli, 18 vols., Bharata Press, 1883–1896. Sacred Texts Archive.

২. The Mahabharata: Text as Constituted in its Critical Edition. Edited by Vishnu S. Sukthankar et al., 19 vols., Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI), 1933–1966.

৩. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 1 (Adi Parva), edited by Vishnu S. Sukthankar, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933.

৪. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 2 (Sabha Parva), edited by Franklin Edgerton, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1944.

৫. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 3 & 4 (Aranyaka Parva), edited by Vishnu S. Sukthankar, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1942.

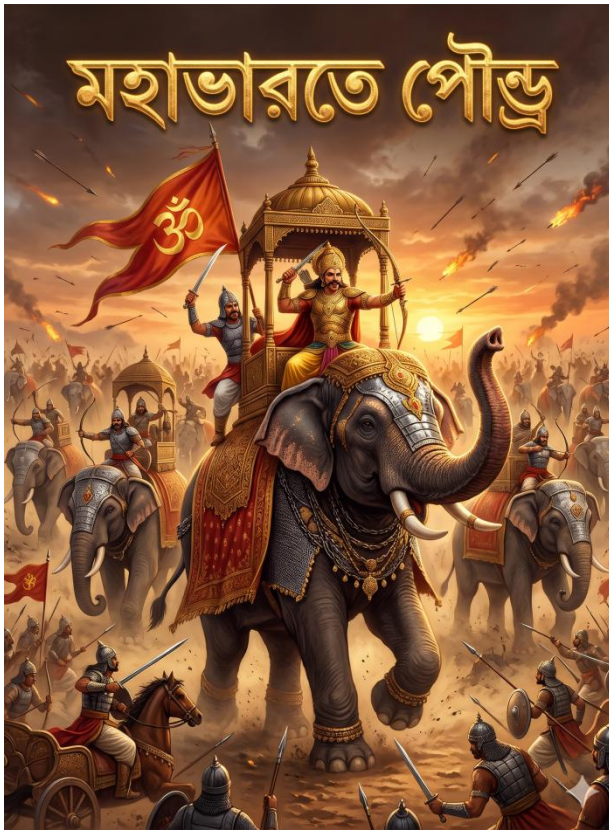
৬. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 7 (Bhishma Parva), edited by S. K. Belvalkar, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1947.

৭. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 8 & 9 (Drona Parva), edited by S. K. De, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1958.

৮. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 10 (Karna Parva), edited by P. L. Vaidya, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954.

৯. The Mahabharata: For the First Time Critically Edited. Vol. 13–16 (Santi Parva), edited by S. K. Belvalkar, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1949–1954.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



বৌদ্ধ সাহিত্যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়

- শ্রীসহশ্রাংশু সেন

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতির বিবর্তন অনুধাবনে বৌদ্ধ ত্রিপিটক, জাতক, অবদান সাহিত্য এবং মহাযানী ও বজ্রযানী সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ এক অনন্য ও প্রামাণিক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ভগবান গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং ছিলেন শাক্যবংশীয় একজন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, এবং তাঁর প্রবর্তিত দর্শন মূলত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের আত্মমর্যাদা, যুক্তিবাদ ও সার্বভৌম চেতনার ওপর ভিত্তি করেই প্রাচ্য ভারতে প্রসার লাভ করেছিল। প্রাচীন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ ‘পুণ্ড্রবর্ধন’ বা ‘পৌণ্ড্র দেশ’ এবং এর শাসক জাতি ‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়’ বৌদ্ধ সাহিত্যে এক অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল, ইতিবাচক ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত। পরবর্তীকালের কিছু রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রে পৌণ্ড্রদের প্রতি যে সংকীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়, বৌদ্ধ সাহিত্যের বিপুল তথ্যভাণ্ডার তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এক সুসভ্য, জ্ঞানানুরাগী, সমৃদ্ধ ও স্বাধীনচেতা ক্ষত্রিয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই মহিমান্বিত অবস্থান মূলত তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক

প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়েছে—প্রথমত, বৌদ্ধ শাস্ত্রে ক্ষত্রিয় বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌণ্ড্র ভূমিকে পবিত্র 'মধ্যদেশ'-এর অন্তর্ভুক্তকরণ; দ্বিতীয়ত, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, সুমগধাবদান ও দিব্যাবদান-এ স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের পুণ্ড্রবর্ধন পরিভ্রমণ এবং এখানকার রাজন্যবর্গের ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা; এবং তৃতীয়ত, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই গভীর অনুরাগের কারণেই গোঁড়া স্মৃতিকারদের সাথে তাঁদের মতাদর্শগত বিরোধের ঐতিহাসিক স্বরূপ উন্মোচন।

বৌদ্ধ দর্শনের সামাজিক কাঠামোয় বর্ণাশ্রম প্রথার গোঁড়ামিকে অস্বীকার করা হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়দের স্থান ছিল সবার ওপরে। **পালি ত্রিপিটকের দীঘ নিকায়-এর অন্তর্গত 'অম্বট্ঠ সুত্ত' ও 'অগ্গঞ্ঞ সুত্ত' এবং সংযুক্ত নিকায়-এ ভগবান বুদ্ধ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, মানবসমাজে বংশমর্যাদা ও শৌর্যের বিচারে ক্ষত্রিয়গণই সর্বশ্রেষ্ঠ।** প্রাচ্য ভারতের পৌণ্ড্র, মগধ, অঙ্গ ও বৃজি জনপদের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ বুদ্ধের এই ক্ষত্রিয়-মহিমান্বিত দর্শনকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। দীঘ নিকায় (অম্বট্ঠ সুত্ত, ৩.১.২৮) এবং সংযুক্ত নিকায়-এর সেই বিখ্যাত পালি গাথাটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় সমাজের আত্মমর্যাদার মূলমন্ত্র হিসেবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

শ্লোক বা গাথা:

খত্তিয়া সেট্ঠা জনেতস্মিং যে গোত্তপটিসারিনো ।

বিজ্জাচরণসম্পন্নো সো সেট্ঠো দেবমানুসে ॥

(সংস্কৃত ছায়া: ক্ষত্রিয়াঃ শ্রেষ্ঠা জনতাস্মিন্ যে গোত্রপ্রতিসারিণঃ । বিদ্যাচরণসম্পন্নঃ স শ্রেষ্ঠো দেবমানুষে ॥)

(বাংলা অনুবাদ: যাঁরা বংশ ও গোত্রের মর্যাদা অনুসরণ করেন, সেই মনুষ্যসমাজে ক্ষত্রিয়গণই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ; এবং যিনি বিদ্যা ও সদাচারে পরিপূর্ণ, তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।)

এই দর্শনের প্রভাবেই প্রাচীন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ নিজেদের রাজসিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চা ও সদাচারের পথে অগ্রসর হয়েছিল। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত কোনো কোনো গ্রন্থে যেখানে প্রাচ্য দেশকে আর্যাবর্তের প্রান্তিক অঞ্চল বলে মনে করা হতো, সেখানে বৌদ্ধ বিনয়পিটক (মহাবগ্গ, ৫.১৩.১২) এবং দিব্যাবদান-এ পবিত্র 'মধ্যদেশ' (মজ্ঝিমদেস)-এর পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে সরাসরি 'পুণ্ড্রবর্ধন' (পালি ভাষায় পুণ্ডকচ্ছ বা পুণ্ড্রবর্ধন)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ,

বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই রাজ্যটি কোনো প্রান্তিক বা অনার্য ভূমি ছিল না, বরং তা ছিল ভারতের মূলধারার পবিত্র 'মধ্যদেশ'-এরই এক অবিচ্ছেদ্য ও সমৃদ্ধ অংশ।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৯৩তম পল্লব)** এবং প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ **সুমগধাবদান-এ** পৌণ্ড্র জনপদ ও তার রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনের নাগরিক সমৃদ্ধি, রাজন্যবর্গের উদারতা এবং আধ্যাত্মিক উত্তরণের এক অপূর্ব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই আখ্যান অনুসারে, **শ্রাবস্তীর প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ধর্মপ্রাণা কন্যা সুমগধার বিবাহ হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধন নগরের এক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারে। সুমগধার একান্ত প্রার্থনা ও আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভগবান গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর প্রধান শিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন ও আনন্দকে সাথে নিয়ে অলৌকিক ঋদ্ধিবলে আকাশপথে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে শুভাগমন করেন। বুদ্ধের এই আগমন উপলক্ষে পুণ্ড্রবর্ধনের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও নাগরিকগণ যে বিপুল সংবর্ধনা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন রেখেছিলেন, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৯৩.৯–১০ ও সুমগধাবদান পরম্পরা)-র শ্লোকে তার উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়:**

শ্লোক:

পুণ্ড্রবর্ধনসংজ্ঞং তদ্ নগরং সর্বসম্পদাম্ ।

বভূব ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শেন পাবনম্ ॥

তত্রত্যৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পৌরৈঃ সাদরং সমুপাসিতঃ ।

দেশয়ামাস সদ্ধর্মং ভগবান্ লোকনায়কঃ ॥

(বাংলা অনুবাদ: সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ সেই পুণ্ড্রবর্ধন নগরী ভগবান বুদ্ধের চরণকমলের স্পর্শে পরম পবিত্রতা লাভ করল। সেখানকার ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ এবং পৌরজনগণ কর্তৃক সাদরে পূজিত ও উপাসিত হয়ে লোকনায়ক ভগবান বুদ্ধ তাঁদের উদ্দেশ্যে পবিত্র সদ্ধর্ম উপদেশ করলেন।)

এই শ্লোকটি প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি সুগঠিত, সর্বসম্পদশালী মহানগরী এবং এখানকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শাসক ও নাগরিকগণ ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ও সত্যসন্ধানী। ভগবান বুদ্ধ কেবল সেখানে গমনই করেননি, বরং দীর্ঘ সময় অবস্থান করে পৌণ্ড্রবাসীদের সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (যুয়ান জাং) যখন পুণ্ড্রবর্ধন (পুন-ন-ফা-তান-ন) পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি সেখানে

সম্রাট অশোক নির্মিত একটি বিশাল স্তূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ এই স্থানে তিন মাস অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শাসিত এই ভূখণ্ড সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। **বৌদ্ধ আকর গ্রন্থ দিব্যাবদান-এর 'অশোকাবদান' অংশে মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনকালে পুণ্ড্রবর্ধনকে পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।** শুধু সাহিত্যিক উপাদানই নয়, মধ্যপ্রদেশের সাঁচী স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণে উৎকীর্ণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দুটি ব্রাহ্মী শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, **পুণ্ড্রবর্ধনের দুই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 'ধর্মদত্ত' এবং 'ঋষিনন্দন' (ইসিনন্দন) সুদূর মধ্যভারতের সাঁচী মহাস্তূপ নির্মাণে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছিলেন (শিলালিপির পাঠ: 'পুণবধনস ধমদতস দানং' এবং 'পুণবধনস ইসিনংদনস দানং')।** এই প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য বৌদ্ধ সাহিত্যের বিবরণকে সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণ করে এবং দেখায় যে, পৌণ্ড্র দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত ছিল।

মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক গ্রন্থ **আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প**-এ প্রাচীন বাংলা ও পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানে **পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র জনপদকে ক্ষত্রিয় রাজাদের এক অজেয় শক্তিকেন্দ্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।** এই গ্রন্থে প্রাচ্যের জনপদসমূহ ও তার শাসকদের শৌর্যবীর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে:

শ্লোক:

প্রাচ্যাং দিশি মহাবীর্যাঃ পুণ্ড্রাখ্যায়াং নৃপোত্তমাঃ।

ক্ষত্রিয়াঃ শূরবীর্য্যঢ্যা বৌদ্ধধর্মপরায়ণাঃ ॥

(আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, রাজব্যাকরণ পরিচ্ছেদ পরম্পরা)

(বাংলা অনুবাদ: প্রাচ্য দেশে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামক জনপদে মহাবীর্যবান শ্রেষ্ঠ রাজগণ রাজত্ব করেন; তাঁরা শৌর্য ও বীর্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীরভাবে পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান।)

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-এর এই ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আমাদের সামনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে। প্রাচীনকাল থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও

যোদ্ধারা ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং প্রগতিশীল। পাল রাজবংশের শাসনকালে এই পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমিই হয়ে ওঠে বৌদ্ধ সভ্যতার বিশ্বজনীন কেন্দ্র। পৌণ্ড্র ভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত **সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর), ভাসু বিহার (মহাস্থানগড়) এবং জগদ্দল মহাবিহারের মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পৌণ্ড্র সমাজেরই মেধা, শ্রম ও রাজসিক পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল।** প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) গ্রন্থে এবং ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধনের এই সুদীর্ঘ বৌদ্ধ ঐতিহ্যই প্রাচীন বাংলার মানবিক, উদার ও যুক্তিবাদী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

বৌদ্ধ সাহিত্যের এই প্রামাণিক তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় কেন পরবর্তীকালের রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। মনুসংহিতা (১০.৪৩–৪৪)-এ পৌণ্ড্রকদেরকে যে ‘ক্রিয়ালোপ’ বা বৈদিক যাগযজ্ঞ পরিত্যাগের কারণে অবনমিত ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিংবা সেন যুগে বল্লালসেনের আমলে রক্ষণশীল পুরোহিততন্ত্র যেভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় ও বণিক সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিল, তার মূল কারণ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবিচল নিষ্ঠা। যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ ভগবান বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী ও প্রজ্ঞার আদর্শ গ্রহণ করে রক্তক্ষয়ী বৈদিক পশুযজ্ঞ ও পুরোহিততন্ত্রের সামাজিক আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেহেতু গোঁড়া স্মৃতিকারগণ তাঁদের **‘যজ্ঞবিমুখ’** বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। **ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ যথার্থই বিশ্লেষণ করেছেন যে, বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোকে বিচার করলে পৌণ্ড্রদের এই অবস্থান কোনো সামাজিক অবনমন নয়, বরং তা ছিল এক পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান ক্ষত্রিয় জাতির আদর্শগত স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদারই বহিঃপ্রকাশ।**

বৌদ্ধ সাহিত্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের যে সুমহান ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে, তা প্রাচীন ভারত ও বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পালি ত্রিপিটকে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা ও পুণ্ড্রবর্ধনকে পবিত্র ‘মধ্যদেশ’-এর অন্তর্ভুক্তকরণ, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ও সুমগধাবদান-এ স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের পদধূলিতে ধন্য পুণ্ড্রবর্ধনের ক্ষত্রিয় সমাজের প্রশস্তি এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-এ বৌদ্ধধর্মপরায়ণ মহাবীর্যবান পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়

রাজাদের শৌর্যবীর্যের স্বীকৃতি—এই প্রতিটি প্রামাণিক তথ্যই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক প্রথম সারির, সুসভ্য, জ্ঞানদীপ্ত এবং সার্বভৌম ক্ষত্রিয় জাতি। বৌদ্ধ সাহিত্যের এই নিরপেক্ষ ও ইতিবাচক সাক্ষ্য সকল ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি দূর করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে তাঁদের গৌরবময় রাজসিক ও বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের মহিমায় চিরভাস্বর করে রেখেছে।**

তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিল না, তারা সনাতন ধর্ম, শাক্ত, তন্ত্র ও জৈন ধর্মের অনুরাগীও ছিল। স্বয়ং বৌদ্ধ হিউয়েং সাং পৌণ্ড্রনগরে ২০টি বৌদ্ধ মঠ ও ১০০ টি মন্দির দেখেছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় পৌণ্ড্ররা বৌদ্ধ ধর্মকে শ্রদ্ধা করলেও তারা ছিলেন সনাতন ধর্মের অনুরাগী। আসলে বৌদ্ধ কোনও আলাদা ধর্ম ছিল না, উপনিষদীয় ধর্মের সংস্কারিত একটি রূপ হল বৌদ্ধ ধর্ম। তাই বর্তমানে যেসব পৌণ্ড্ররা বৌদ্ধকে আলাদা ধর্ম মনে করেন তারা সমাজকে বিভ্রান্ত করছেন ও ভুল বার্তা দিচ্ছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. করণ, মহেন্দ্রনাথ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস। কলিকাতা, ১৯১৯।

২. ক্ষেমেন্দ্র। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা। শরৎচন্দ্র দাস এবং হরিমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৮৮–১৯১৮।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

৪. বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনু.)। মধ্যম নিকায় (প্রথম খণ্ড)। যোগেন্দ্র রূপসী, ১৯৪০।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ২০০২।

৫. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। বৌদ্ধধর্ম। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫।

৬. Chaudhury, Binayendra Nath. Buddhist Centres of Ancient India. Calcutta Sanskrit College, 1969.

৭. Cowell, E. B., and R. A. Neil, editors. The Divyavadana: A Collection of Early Buddhist Legends. Cambridge University Press, 1886.

৮. Dutta, Gourab. "Rise and Growth of Pundravardhana: A Study on 5th Century B.C.E to 5th Century A.D." Journal of Historical Studies and Research, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 125–136.

৯. Jayaswal, K. P. An Imperial History of India in a Sanskrit Text (c. 700 B.C. – c. 770 A.D.): With a Special Commentary on Later Gupta Period [Arya-Manjusri-Mulakalpa]. Motilal Banarsidass, 1934.

১০. Majumdar, R. C., editor. The History of Bengal: Volume I (Hindu Period). The University of Dacca, 1943.

১১. Rhys Davids, T. W., translator. Dialogues of the Buddha (Translated from the Pali of the Digha Nikaya). Part I, Oxford University Press, 1899.

১২. Tokiwai, Tsuru-Matsu. Studien zum Sumagadhavadana. Buchdruckerei von Γ. Otto, 1898.

১৩. Watters, Thomas. On Yuan Chwang's Travels in India (629–645 A.D.). Royal Asiatic Society, 1904.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

জৈন সাহিত্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

- শ্রীমতি মহামায়া মৃধা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে সনাতন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের পাশাপাশি জৈন আগম সাহিত্য, সূত্রগ্রন্থ এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত জৈন চরিতগ্রন্থসমূহ এক অপরিহার্য ও নিরপেক্ষ প্রামাণিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। জৈন ধর্ম মূলত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ক্ষত্রিয় তীর্থঙ্করদের প্রবর্তিত শ্রমণ দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছিল। **প্রাচীন প্রাচ্য ভারতের অন্যতম প্রধান সামরিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে 'পৌণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' জাতি জৈন সাহিত্যে এক অত্যন্ত সম্মানজনক, ইতিবাচক এবং গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত।** পরবর্তীকালের কিছু রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচ্য দেশের স্বাধীনচেতা ক্ষত্রিয়দের প্রতি যে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, প্রাচীন জৈন শাস্ত্রসমূহ তার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে পৌণ্ড্র ভূমি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের 'ক্ষেত্রার্য' বা বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতির ধারক এবং জৈন শ্রমণ ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। জৈন সাহিত্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই মহিমান্বিত অবস্থান মূলত তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত হয়েছে—**প্রথমত,** জৈন উপাঙ্গ গ্রন্থে পৌণ্ড্র ও কোটিবর্ষ অঞ্চলকে বিশুদ্ধ আর্য ভূখণ্ড হিসেবে মর্যাদা দান; **দ্বিতীয়ত,** আচার্য

ভদ্রবাহুর *কল্পসূত্র*-এ পৌণ্ড্রবর্ধনীয় ও কোটিবর্ষীয় শাখার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি; এবং **তৃতীয়ত,** ক্ষত্রিয়-প্রধান জৈন ধর্মের প্রসারের কারণেই গোঁড়া স্মৃতিকারদের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মতাদর্শগত দূরত্বের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

জৈন ধর্মের চব্বিশজন তীর্থঙ্করই ছিলেন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত। ফলে প্রাচীন ভারতের যে সকল জনপদে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই অঞ্চলগুলোতেই জৈন ধর্ম সর্বপ্রথম গভীর শিকড় বিস্তার করে। জৈন শ্বেতাম্বর আগমের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ ***আচারাঙ্গ সূত্র*** **(আয়ারঙ্গ সুত্ত)** থেকে জানা যায় যে, চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর স্বয়ং প্রাচ্য ভারতের রাঢ় ও পুণ্ড্র সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় জৈন চতুর্থ উপাঙ্গ গ্রন্থ *প্রজ্ঞাপনা সূত্র* (পণ্ণবণা সুত্ত)-এর প্রথম পদে সমগ্র মানবজাতিকে ‘আর্য’ এবং ‘ম্লেচ্ছ’—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ভারতবর্ষের সাড়ে পঁচিশটি জনপদকে ‘ক্ষেত্রার্য’ (জন্মভূমি ও সংস্কৃতিগতভাবে বিশুদ্ধ আর্য) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বৌধায়ন ধর্মসূত্রের মতো গোঁড়া বৈদিক গ্রন্থ যেখানে প্রাচ্য দেশকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছে, সেখানে **জৈন *প্রজ্ঞাপনা সূত্র* এবং *বৃহৎকল্পসূত্র ভাষ্য* প্রাচ্যের অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের সাথে পৌণ্ড্র জনপদের কেন্দ্রভূমি ‘কোটিবর্ষ’ (পুণ্ড্রবর্ধন)-কে প্রথম সারির আর্য জনপদ বা ‘ক্ষেত্রার্য’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।** জৈন আগম ও ভাষ্য গ্রন্থের এই ঐতিহাসিক সূত্রটি নিম্নরূপ:

শ্লোক:

অঙ্গা বঙ্গা কলিঙ্গা চ কোডিবরিসা তহৈব চ ।

এএ খিত্তারিয়া দেসা পণ্ণত্তা জিনসাসণে ॥

(প্রজ্ঞাপনা সূত্র, ১.৩৭ / বৃহৎকল্পসূত্র পরম্পরা)

(সংস্কৃত ছায়া: অঙ্গা বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ কোটিবর্ষাস্তথৈব চ । এতে ক্ষেত্রার্যা দেশাঃ প্রজ্ঞপ্তা জিনশাসনে ॥)

(বাংলা অনুবাদ: অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পৌণ্ড্র দেশের প্রধান কেন্দ্র কোটিবর্ষ—এই সমস্ত জনপদ জিনশাসনে অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের প্রবর্তিত জৈন শাস্ত্রে পবিত্র ‘ক্ষেত্রার্য’ বা বিশুদ্ধ আর্য দেশ রূপে প্রজ্ঞপ্ত ও স্বীকৃত হয়েছে।)

এই শ্লোকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। **প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*** গ্রন্থে এই জৈন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের বহু পূর্ব থেকেই **পৌণ্ড্র জনপদ উন্নত নাগরিক সভ্যতা এবং আর্য সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।** জৈন শাস্ত্রকারগণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শাসিত এই জনপদকে কেবল ভৌগোলিক কারণেই ‘ক্ষেত্রার্য’ বলেননি, বরং এখানকার ক্ষত্রিয়

শাসক ও অধিবাসীদের উন্নত জীবনযাত্রা, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা এবং শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার কারণেই এই সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে মৌর্য যুগে পৌণ্ড্র জনপদ (পুণ্ড্রবর্ধন) সমগ্র পূর্ব ভারতে জৈন ধর্ম ও দর্শনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হয়। **জৈন আচার্য হরিষেণ রচিত *বৃহৎকথাকোষ* (৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) এবং আচার্য হেমচন্দ্র রচিত *পরিশিষ্টপর্বণ* বা *স্থবিরাবলীচরিত*** থেকে জানা যায় যে, **মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আধ্যাত্মিক গুরু তথা জৈন শ্রুতকেবলী আচার্য ভদ্রবাহু প্রাচীন পৌণ্ড্র দেশেরই সন্তান ছিলেন।** তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত **দেবীকোট বা কোটিবর্ষ** নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৌণ্ড্র ভূমির সমৃদ্ধি, ক্ষত্রিয় শাসকদের সুশাসন এবং আচার্য ভদ্রবাহুর জন্মস্থান হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধনের গৌরব বর্ণনা প্রসঙ্গে জৈন চরিত সাহিত্যে (বৃহৎকথাকোষ, ১৩১তম কথানক ও পরিশিষ্টপর্বণ ঐতিহ্য) উচ্চারিত হয়েছে:

শ্লোক (বাংলা উচ্চারণ):

অস্তি প্রাচ্যাং দিশি খ্যাতঃ পুণ্ড্রবর্ধনসংজ্ঞকঃ ।

দেশঃ সর্বসমৃদ্ধ্যাঢ্যঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পরিপালিতঃ ॥

পুণ্ড্রবর্ধনবিষয়ে দেবীকোটপুরোত্তমে ।

তত্রাভূদ্ ভদ্রবাহুর্বা শ্রুতকেবলিনাম্বরঃ ॥

(বাংলা অনুবাদ: প্রাচ্য দেশে পুণ্ড্রবর্ধন নামে এক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ বিদ্যমান, যা সর্বপ্রকার ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ এবং পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের দ্বারা সযত্নে পরিপালিত। সেই পুণ্ড্রবর্ধন দেশের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ নগরী দেবীকোটে শ্রুতকেবলীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভদ্রবাহু আবির্ভূত হয়েছিলেন।)

আচার্য ভদ্রবাহু স্বয়ং তাঁর অমর গ্রন্থ *কল্পসূত্র*-এর 'স্থবিরাবলী' (থেরাবলী) অংশে তৎকালীন জৈন সংঘের সাংগঠনিক কাঠামোর যে প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের এক অকাট্য দলিল। **আচার্য ভদ্রবাহুর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন গোদাস, যিনি 'গোদাস-গণ' নামক এক বিশাল জৈন সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।** প্রাচীন বাংলা ও বিহারের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই **'গোদাস-গণ' চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়, যার মধ্যে দুটি শাখার নামকরণ করা হয়েছিল সরাসরি পৌণ্ড্র জনপদের দুটি প্রধান মহানগরের নামানুসারে—'পুণ্ড্রবর্ধনীয় শাখা' এবং 'কোটিবর্ষীয় শাখা'।** *কল্পসূত্র*-এর (স্থবিরাবলী, ১২) মূল প্রাকৃত পাঠটি নিম্নরূপ:

শ্লোক বা সূত্রঃ

চত্তারি সাখাও সমুপ্পন্নাও, তং জহা—

তমলিত্তিয়া, কোডিবরিসিয়া, পোণ্ডবড্ঢণিয়া, খব্বডিয়া চেই ॥

(সংস্কৃত ছায়া: চতস্রঃ শাখাঃ সমুৎপন্নাঃ, তদ্যথা— তাম্রলিপ্তীয়া, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্ধনীয়া, খর্বটীয়া চেতি ॥)

(বাংলা অনুবাদ: গোদাস-গণ থেকে চারটি প্রসিদ্ধ শাখা উৎপন্ন হয়েছিল; সেগুলি হলো যথাক্রমে—তাম্রলিপ্তীয় শাখা, কোটিবর্ষীয় শাখা, পুণ্ড্রবর্ধনীয় শাখা এবং খর্বটীয় শাখা।)

কল্পসূত্র-এর এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, মৌর্য যুগেই পৌণ্ড্র জনপদ এতটাই প্রভাবশালী ও সুসংগঠিত ছিল যে, সর্বভারতীয় জৈন সংঘের দুটি প্রধান শাখা এই অঞ্চলের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। **ঐতিহাসিক বিনয়চন্দ্র সেন এবং ড. দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কোনো অঞ্চলে রাজশক্তি এবং প্রভাবশালী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই ধরনের সুবৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শাখা গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজারা কেবল রণক্ষেত্রেই অজেয় ছিলেন না, বরং তাঁরা তপস্যা, অহিংসা ও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধন ও কোটিবর্ষকে প্রাচ্য ভারতের প্রধান বিদ্যাপীঠে পরিণত করেছিলেন।**

জৈন সাহিত্যের এই উজ্জ্বল বিবরণী প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের এক অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দেয়। *মনুসংহিতা*-র দশম অধ্যায়ে (১০.৪৩–৪৪) পৌণ্ড্রকদেরকে যে ‘শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাস্তু ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ’—অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞের লোপ ও ব্রাহ্মণদের অদর্শনের ফলে বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে, তার প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণ লুকিয়ে রয়েছে জৈন ও শ্রমণ সাহিত্যের এই তথ্যের মধ্যেই। **প্রাচীন পৌণ্ড্ররা যে জন্মগতভাবে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা মনুও অস্বীকার করতে পারেননি।** কিন্তু তাঁরা কেন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞের পরিবর্তে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন? জৈন সাহিত্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং তাঁরা জৈন তীর্থঙ্করদের ক্ষত্রিয়-প্রধান আধ্যাত্মিক দর্শন, তপস্যা ও যোগমার্গের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ বৈদিক পশুযজ্ঞ ও পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য অস্বীকার করে জৈন শ্রমণ ও তান্ত্রিক যোগীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন, সেহেতু রক্ষণশীল স্মৃতিকারগণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের ‘ক্রিয়ালোপ’ বা যজ্ঞহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং, স্মৃতিকারদের এই বিরূপ মন্তব্য কোনোভাবেই পৌণ্ড্রদের হীনতা প্রমাণ করে না; বরং জৈন সাহিত্যের আলোকে এটি প্রমাণিত হয় যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ছিলেন এক প্রগতিশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও দার্শনিক চেতনাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় জাতি।**

প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণও জৈন সাহিত্যের এই বিবরণকে পূর্ণাঙ্গ সত্যতা দান করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে (প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত) প্রাপ্ত ৪৭৯ খ্রিস্টাব্দের (১৫৯ গুপ্তাব্দ) তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, **পুণ্ড্রবর্ধনের বটগোহালী নামক স্থানে জৈন আচার্য গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত ‘পঞ্চস্তূপনিকায়’ নামক এক**

বিশাল জৈন বিহার বিদ্যমান ছিল। এই তাম্রশাসনে জৈন বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমিদানের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা প্রমাণ করে যে খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু করে গুপ্ত যুগ এবং তৎপরবর্তী কাল পর্যন্ত প্রায় এক সহস্রাব্দ ধরে পৌণ্ড্র ভূমিতে জৈন ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত ছিল। ফরাসি পণ্ডিত ও তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথ এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (যুয়ান জাং)-এর বিবরণীতেও পুণ্ড্রবর্ধনে নির্গ্রন্থ বা জৈনদের বিপুল প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগের ইতিহাসচর্চায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো দিকপাল ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত পুণ্ড্রবর্ধন ও কোটিবর্ষের এই সমৃদ্ধ ইতিহাস মূলত পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীরই উন্নত রাষ্ট্রচিন্তা ও সাংস্কৃতিক মননের ফসল। **সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীনকাল থেকেই তপস্যা, বীরত্ব ও সত্যনিষ্ঠার পূজারী ছিলেন—যা জৈন ধর্মের মহাব্রত এবং ক্ষত্রিয় রাজধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।**

জৈন সাহিত্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তাঁদের গৌরবময় রাজসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানের এক অক্ষয় দলিল। *প্রজ্ঞাপনা সূত্র*-এ তাঁদের ভূমিকে 'ক্ষেত্রার্য' বা বিশুদ্ধ আর্য জনপদ হিসেবে স্বীকৃতি দান, *বৃহৎকথাকোষ* ও *পরিশিষ্টপর্বণ*-এ ক্ষত্রিয় শাসিত সমৃদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনের প্রশস্তি এবং আচার্য ভদ্রবাহুর *কল্পসূত্র*-এ 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়' ও 'কোটিবর্ষীয়' শাখার প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা—এই প্রতিটি তথ্যই প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক প্রথম সারির, সুসভ্য এবং অপরাজেয় ক্ষত্রিয় শক্তি। গোঁড়া স্মৃতিশাস্ত্রের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে জৈন সাহিত্যের এই উদার ও বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মপরিচয়কে এক সুদৃঢ়, বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশ্বজনীন মর্যাদার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. করণ, মহেন্দ্রনাথ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস। কলিকাতা, ১৯১৯।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

৩. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ২০০২।

৪. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

৫. Chaudhury, Binayendra Nath. Buddhist Centres of Ancient India. Calcutta Sanskrit College, 1969.

৬. Dutta, Gourab. "Rise and Growth of Pundravardhana: A Study on 5th

Century B.C.E to 5th Century A.D." Journal of Historical Studies and Research, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 125–136.

৭. Jacobi, Hermann, translator. Jaina Sutras, Part I (The Akaranga Sutra, The Kalpa Sutra). Sacred Books of the East, vol. 22, Oxford University Press, 1884.

৮. Majumdar, R. C., editor. The History of Bengal: Volume I (Hindu Period). The University of Dacca, 1943.

৯. Mukherji, Ramaranjan, and Sachindra Kumar Maity. Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal. Firma K. L. Mukhopadhyay, 1967.

১০. Sen, Benoychandra. Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal (Pre-Muhammadan Epoch). University of Calcutta, 1942.

১১. Upadhye, A. N., editor. Brihat-Kathakosha of Acharya Harishena. Singhi Jain Series, Bharatiya Vidya Bhavan, 1943.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

কৌটিল্য (বিষ্ণুগুপ্ত) বিরচিত অর্থশাস্ত্রে পৌণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

- শ্রী দেবেশ মণ্ডল

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমরনীতি এবং সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে **আচার্য চাণক্য বা কৌটিল্য (বিষ্ণুগুপ্ত) বিরচিত 'অর্থশাস্ত্র'** এক অদ্বিতীয় ও প্রামাণিক আকর গ্রন্থ। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানকালে রচিত এই মহাগ্রন্থটি কেবল সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনতান্ত্রিক নির্দেশিকা ছিল না, বরং তা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সামরিক শক্তি এবং শাসক শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এক বস্তুনিষ্ঠ দর্পণ। পৌরাণিক বা ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যে অনেক সময় আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে বাস্তববাদী, তথ্যনিষ্ঠ এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের নিরিখে রচিত এক বিজ্ঞানসম্মত দলিল। এই বাস্তববাদী গ্রন্থে প্রাচ্য ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ **'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র দেশ'** এবং এর অধিপতি ও চালিকাশক্তি **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' সমাজের** যে গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য মর্যাদার আসন দাবি করে।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই ইতিবাচক ও প্রভাবশালী অবস্থান মূলত চারটি সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়েছে—**প্রথমত,** রাজকোষে সংরক্ষণের যোগ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ও বিলাসদ্রব্যের তালিকায় 'পৌণ্ড্রক' বস্ত্র ও রেশমের একচ্ছত্র প্রাধান্য; **দ্বিতীয়ত,** চাণক্যের 'জনপদসম্পদ' তত্ত্ব ও মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপির আলোকে পুণ্ড্রনগরের উন্নত প্রশাসনিক কাঠামো; **তৃতীয়ত,** 'বার্ত্তশস্ত্রোপজীবী' ক্ষত্রিয়শ্রেণী হিসেবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কৃষি, বাণিজ্য ও সমরবিদ্যার যুগপৎ নেতৃত্ব; এবং **চতুর্থত,** অর্থশাস্ত্র-এর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরবর্তীকালের রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রের সংকীর্ণ অপপ্রচারের ঐতিহাসিক খণ্ডন।

আচার্য চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্র-এর দ্বিতীয় অধিকরণের **('অধ্যক্ষপ্রচারঃ')** একাদশ অধ্যায়ে **('কোশপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা' বা রাজকোষে প্রবেশযোগ্য মূল্যবান রত্ন ও সামগ্রীর মান যাচাই)** তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহার্ঘ্য শিল্পসামগ্রীর একটি প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করেছেন। একটি জনপদের শাসক ও নাগরিকরা কতটা সুসভ্য, রুচিশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে সার্বভৌম হতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে সেই জনপদের উৎপাদিত রাজকীয় পণ্যের মানে। চাণক্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, **তৎকালীন মৌর্য সম্রাটের রাজকোষে সংরক্ষণের জন্য প্রাচ্যের পৌণ্ড্র জনপদ থেকে সংগৃহীত 'পৌণ্ড্রক দুকূল', 'পৌণ্ড্রক ক্ষৌম' এবং 'পৌণ্ড্রিক পত্রোর্ণ' (রেশম) ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান রাজকীয় সম্পদ।** অর্থশাস্ত্র-এর (২.১১.১০২) সূত্রে 'পৌণ্ড্রক' দুকূল বস্ত্রের অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে চাণক্য লিখেছেন:

শ্লোক বা সূত্র:

বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলম্, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধম্, সুবর্ণকুড্যকং সূর্যবর্ণং মণিস্নিগ্ধোদকবানং চতুরশ্রম্ ইতি ॥

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২.১১.১০২)

(বাংলা অনুবাদ: বঙ্গদেশের দুকূল বস্ত্র শ্বেতবর্ণ ও কোমল; পৌণ্ড্র দেশের 'পৌণ্ড্রক' দুকূল বস্ত্র শ্যামবর্ণ এবং মণির ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল; আর সুবর্ণকুড্য দেশের দুকূল সূর্যের ন্যায় রক্তিম-স্বর্ণাভ এবং মণিস্নিগ্ধ জলধৌত চতুরশ্র বয়নযুক্ত।)

পৌণ্ড্র দেশের বস্ত্রকে চাণক্য **'মণিস্নিগ্ধম্' অর্থাৎ বহুমূল্য রত্ন বা মণির মতোই উজ্জ্বল, মসৃণ ও অভিজাত** বলে অভিহিত করেছেন। কেবল দুকূলই নয়, সূক্ষ্ম ক্ষৌম বস্ত্র (লিনেন জাতীয় রাজকীয় পরিধেয়)

এবং পত্রোর্ণ (রেশম বস্ত্র)-এর ক্ষেত্রেও পৌণ্ড্র জনপদ তৎকালীন ভারতের পবিত্র নগরী কাশী ও মগধের সমকক্ষ ছিল। অর্থশাস্ত্র-এর (২.১১.১০৬–১০৭) পরবর্তী দুটি সূত্রে চাণক্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন:

শ্লোক বা সূত্র:

তেষু কাশিকং পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমম্ ॥ ১০৬

মাগধিকাঃ পৌণ্ড্রিকাঃ সৌবর্ণকুড্যকাশ্চ পত্রোর্ণাঃ ॥ ১০৭

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২.১১.১০৬–১০৭)

(বাংলা অনুবাদ: ক্ষৌম বস্ত্রসমূহের মধ্যে কাশী এবং পৌণ্ড্র দেশের উৎপাদিত ‘পৌণ্ড্রক ক্ষৌম’ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। আর পত্রোর্ণ বা রেশম বস্ত্রের ক্ষেত্রে মগধ, পৌণ্ড্র দেশ (‘পৌণ্ড্রিকাঃ’) এবং সুবর্ণকুড্যের রেশমই সর্বোৎকৃষ্ট।)

এই সূত্রগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ড. রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে এই ধরনের বিশ্বমানের রাজকীয় বস্ত্র ও রেশম শিল্পের বিকাশ কোনো অনগ্রসর বা অসংগঠিত সমাজে ঘটা সম্ভব ছিল না; এর পেছনে ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, উন্নত কারিগরি প্রযুক্তি, সুশৃঙ্খল বাণিজ্যপথ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। চাণক্য যেভাবে কাশী ও মগধের সাথে পৌণ্ড্র দেশের নাম একাসনে উচ্চারণ করেছেন, তা প্রমাণ করে যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শাসিত এই ভূখণ্ড ভারতের অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এর এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিবরণ নিছক পুঁথিগত তত্ত্ব নয়; প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার একে অকাট্য ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত করেছে। ১৯৩১ সালে **প্রাচীন পৌণ্ড্র দেশের রাজধানী পুণ্ড্রনগরে (বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়)** আবিষ্কৃত মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী শিলালিপিটি প্রকৃতপক্ষে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এ বর্ণিত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নীতিরই এক জীবন্ত প্রতিফলন। অর্থশাস্ত্র-এর দ্বিতীয় অধিকরণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে (‘কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষঃ’) এবং চতুর্থ অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে (‘উপনিপাতপ্রতীকারঃ’) চাণক্য জনপদের দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজকোষ ও রাষ্ট্রীয় শস্যভাণ্ডার থেকে প্রজাদের শস্যবীজ ও অর্থ সাহায্যের যে বিধান দিয়েছেন, মহাস্থানগড় লিপিতে পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে ঠিক সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। অর্থশাস্ত্র-এর (২.১৫.২২–২৩) সেই বিখ্যাত নীতিটি হলো:

শ্লোক বা সূত্র:

ততো অর্ধং রক্ষেত্ আপদর্থং জনপদস্য ।

অর্ধম্ উপযুঞ্জীত । নবেন অনবং শোধয়েত্ ॥

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২.১৫.২২–২৩)

(বাংলা অনুবাদ: সংগৃহীত রাজস্ব ও শস্যের অর্ধেক অংশ জনপদের আপৎকালীন বা জরুরি সংকটের জন্য সংরক্ষণ করবে এবং বাকি অর্ধেক সাধারণ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করবে। প্রতি বছর নতুন শস্য দ্বারা পুরাতন শস্য প্রতিস্থাপন করবে।)

মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী শিলালিপিতে **পুণ্ড্রনগরকে ‘সুলখিতে পুণগলে’ (সুসমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত পুণ্ড্রনগরী)** হিসেবে উল্লেখ করে রাজকীয় কোষ্ঠাগার থেকে ধান এবং **‘গণ্ডক’ ও ‘কাকণিক’ মুদ্রা** বিতরণের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এর শাসনতান্ত্রিক পরিভাষার সাথে হুবহু মিলে যায়। ঐতিহাসিক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এবং ড. দীনেশচন্দ্র সরকার দেখিয়েছেন যে, পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের (প্রাচ্য পথের) অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানকার স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রশাসক ও অমাত্যগণ চাণক্যের আদর্শ রাষ্ট্রনীতির সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক অবদান হলো ক্ষত্রিয়দের পেশাগত ও সামরিক সংগঠনের বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ, যা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক জীবনযাত্রার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়গণ কেবল যুদ্ধকালেই অস্ত্র ধারণ করতেন না; শান্তির সময়ে তাঁরা জনপদের কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও বাণিজ্যের নেতৃত্ব দিতেন। চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্র-এর একাদশ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে **(‘সংঘবৃত্তম্’)** এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সামরিক চেতনাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় জাতিগুলোকে **‘বার্ত্তশস্ত্রোপজীবী’ (যাঁরা কৃষি-বাণিজ্যরূপ ‘বার্ত্তা’ এবং সমরবিদ্যারূপ ‘শস্ত্র’—উভয়ের দ্বারা জীবিকা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেন)** হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থশাস্ত্র-এর (১১.১.৪) সেই যুগান্তকারী সূত্রটি হলো:

শ্লোক বা সূত্র:

কাম্বোজসুরাষ্ট্রক্ষত্রিয়শ্রেণ্যাদয়ো
বার্ত্তশস্ত্রোপজীবিনঃ ॥

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১১.১.৪)

(বাংলা অনুবাদ: কাম্বোজ, সুরাষ্ট্র এবং ক্ষত্রিয়শ্রেণী প্রভৃতি সংঘবদ্ধ জাতিসমূহ ‘বার্ত্তা’ (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য) এবং ‘শস্ত্র’ (অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধবিদ্যা)—এই উভয় বৃত্তির

দ্বারা নিজেদের রাষ্ট্র ও জীবিকা পরিচালনা করে।)

এই সূত্রটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাসের এক চাবিকাঠি স্বরূপ। **প্রাচীন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ ছিলেন এই 'বার্ত্তশস্ত্রোপজীবী' ক্ষত্রিয়শ্রেণীরই উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি।** একদিকে তাঁরা গঙ্গা ও করতোয়া বিধৌত উর্বর পুণ্ড্রবর্ধনে উন্নত ইক্ষু (পুণ্ড্র আখ) চাষ, শস্য উৎপাদন এবং বিশ্বখ্যাত 'পৌণ্ড্রক' বস্ত্র ও রেশম শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ('বার্ত্তা') অর্জন করেছিলেন; অন্যদিকে **বহিরাক্রমণ থেকে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বিশাল পদাতিক, হস্তী ও রথবাহিনী ('শস্ত্র')।** চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্র-এর ষষ্ঠ অধিকরণে ('প্রকৃতিসম্পদঃ', ৬.১.৮) একটি আদর্শ জনপদের যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন—যেমন সুদৃঢ় দুর্গ, উর্বর কৃষিজমি, খনি ও হস্তীবন, জলপথ ও স্থলপথের বাণিজ্যিক সংযোগ, পরিশ্রমী কৃষক এবং শৌর্যবীর্যসম্পন্ন শাসক—প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদ তার প্রতিটি শর্ত পূরণ করেছিল।

সামরিক শক্তির বিচারেও চাণক্য ক্ষত্রিয় সৈন্যদের সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অর্থশাস্ত্র-এর নবম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে **('বলোপাদানকালঃ')** সৈন্যবাহিনীর গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে চাণক্য মৌলবল ও শ্রেণীবলের অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষিত ক্ষত্রিয় বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেছেন:

শ্লোক বা সূত্র:

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রসৈন্যানাং
তেজঃপ্রাধান্যাত্ পূর্বং পূর্বং শ্রেয়ো সন্নাহয়িতুম্ ইত্যাচার্যাঃ ।

ন ইতি কৌটিল্যঃ— প্রপাতেন ব্রাহ্মণবলং পরোভিজাতয়েত্ । প্রহরণবিদ্যাবিণীতং তু ক্ষত্রিয়বলং শ্রেয়ঃ, বহুলসারং বা বৈশ্যশূদ্রবলম্ ইতি ॥

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ৯.২.২১–২৪)

(বাংলা অনুবাদ: পূর্ববর্তী আচার্যগণ মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৈন্যদের মধ্যে তেজের প্রাধান্যের কারণে পূর্ববর্তী বর্ণ পরবর্তী বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কৌটিল্য তা মনে করেন না; কারণ শত্রুপক্ষ নমস্কার ও অনুনয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণ সৈন্যদের সহজেই বশীভূত করতে পারে। তাই অস্ত্রবিদ্যা ও সমরকৌশলে সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয় বাহিনীই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী।)

চাণক্যের এই সামরিক মূল্যায়ন স্পষ্ট করে দেয় কেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসারের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। গঙ্গারিডাই ও প্রাচ্য দেশের

যে বিশাল হস্তীবাহিনী ও ক্ষত্রিয় সেনাদল গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের বাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল এবং যাঁদের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও চাণক্য মগধের সিংহাসন সুদৃঢ় করেছিলেন, প্রাচীন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোদ্ধারা ছিলেন সেই অপরাজেয় সামরিক শক্তির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এর এই বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যাবলি পরবর্তীকালের রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রগুলোর একপেশে ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমূলে খণ্ডন করে। মধ্যযুগে বা প্রাক-মধ্যযুগে যখন কোনো কোনো গোঁড়া স্মৃতিকার কৃষিকাজ বা শিল্প-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত থাকার অজুহাতে প্রাচ্যের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিগুলোকে সামাজিকভাবে হেয় করার অপচেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা চাণক্যের রাষ্ট্রীয় দর্শনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র প্রমাণ করে যে, **কৃষি ও বাণিজ্যের ('বার্ত্তা') সাথে যুক্ত থাকা কোনো ক্ষত্রিয়ের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস করে না; বরং 'বার্ত্তশস্ত্রোপজীবী' ক্ষত্রিয়শ্রেণীই ছিল প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামরিক সার্বভৌমত্বের মূল ভিত্তি। ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, ড. নীহাররঞ্জন রায়** এবং আধুনিক ইতিহাসবিদগণ যথার্থই দেখিয়েছেন যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কৃষিনির্ভরতা ও শিল্পদক্ষতা ছিল তাঁদের প্রাচীন রাজসিক ও জনপদীয় অর্থনীতিরই স্বাভাবিক উত্তরাধিকার, যা চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছে।

আচার্য চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এ পৌণ্ড্র জনপদ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে, তা প্রাচীন ভারত ও বাংলার ইতিহাসে এক অক্ষয় গৌরবের দলিল। **রাজকোষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে মণিস্নিগ্ধ 'পৌণ্ড্রক' দুকূল, ক্ষৌম ও পত্রোর্ণ রেশমের স্বীকৃতি, মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপিতে প্রতিফলিত পুণ্ড্রনগরের আদর্শ মৌর্য প্রশাসন এবং 'বার্ত্তশস্ত্রোপজীবী' ও 'প্রহরণবিদ্যাবিণীত' ক্ষত্রিয়শ্রেণী হিসেবে তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য—এই সমস্ত কিছুই প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক প্রথম সারির, সুসভ্য, আত্মনির্ভরশীল এবং অপরাজেয় ক্ষত্রিয় জাতি।** পৌরাণিক সাহিত্যের পাশাপাশি চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-এর মতো নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের এই উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁদের ঐতিহাসিক ক্ষত্রিয় মর্যাদাকে এক চিরস্থায়ী ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Barua, B. M. "The Old Brahmi Inscription of Mahasthan." The Indian Historical Quarterly, vol. 10, no. 1, 1934, pp. 57–66.

২. Bhandarkar, D. R. "Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan." Epigraphia Indica, vol. 21, 1931–32, pp. 83–91.

৩. Dutta, Gourab. "Rise and Growth of Pundravardhana: A Study on 5th Century B.C.E to 5th Century A.D." Journal of Historical Studies and Research, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 125–36.

৪. Kangle, R. P., editor and translator. The Kautiliya Arthasastra. Parts 1–2, University of Bombay, 1960–63.

৫. Karan, Mahendra Nath. A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods. The All Bengal Bratya Kshattriya Samiti, 1919.

৬. Kautilya. Kautilya's Arthashastra. Translated by R. Shamasastry, Government Press, 1915.

৭. Majumdar, R. C., editor. The History of Bengal: Hindu Period. Vol. 1, The University of Dacca, 1943.

৮. Raychaudhuri, Hemchandra. Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. 6th ed., University of Calcutta, 1953.

৯. কৌটিল্য। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৫০।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। বাঙ্গালার ইতিহাস। ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

১১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ২০০২।

১২. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে পৌণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

- শ্রী পদ্মনাভ প্রজাপতি

প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-রাজনীতি, সামরিক শৌর্য এবং উন্নত নগর সভ্যতার ইতিহাসে **'পৌণ্ড্রদেশ' (বা পুণ্ড্রবর্ধন)** এবং এই ভূখণ্ডের আদি শাসক ও যোদ্ধা জনগোষ্ঠী **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** (Paundrakshatriya) এক অনন্য সাধারণ স্থানের অধিকারী। ভারতবর্ষের দেশীয় সাহিত্য—বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহে পৌণ্ড্রদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় কুল এবং রাজন্যবর্গ হিসেবে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ সরবরাহ করে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রচিত ধ্রুপদী গ্রীক ও রোমান সাহিত্য। ম্যাসিডন-বীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–৩২৫ অব্দ) এবং তৎপরবর্তী হেলেনিস্টিক ও রোমান যুগের ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ ও নাবিকদের বিবরণীতে প্রাচীন বাংলার যে পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য, সমৃদ্ধ জনপদ ও দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রাচীন পৌণ্ড্রদেশ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সামরিক শক্তি। পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের সাথে দেশীয় শাস্ত্রীয় ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন বিশ্বে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সার্বভৌমত্ব ও সামরিক গৌরবের এক অসামান্য চিত্র উন্মোচিত হয়।

গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে পৌণ্ড্রদের অবস্থান অনুধাবন করার পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাদের ভৌগোলিক ও কুলগত পরিচয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। **'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (৭/১৮)-এ সর্বপ্রথম পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়।** পরবর্তীকালে মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর আদিপর্বে (১০৪ অধ্যায়) চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় পুত্রদের মাধ্যমে পূর্ব ভারতের পাঁচটি প্রধান রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম—এই পাঁচজন ছিলেন মহারাজ বলির পুত্র। পৃথিবীতে তাঁদের নিজ নিজ নামানুসারেই পাঁচটি সমৃদ্ধ দেশ (জনপদ) প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত হয়েছিল। মহাভারতের সভাপর্বে (দিগ্বিজয় পর্ব ও রাজসূয় পর্ব) পৌণ্ড্রদেশের অধিপতি মহারাজ বাসুদেব পৌণ্ড্রককে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের একচ্ছত্র ক্ষত্রিয় সম্রাট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মহাভারতের দ্রোণপর্ব ও ভীষ্মপর্বে

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের অপরাজেয় রণকৌশলের প্রশংসা করা হয়েছে। **প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র 'মনুস্মৃতি'-এর দশম অধ্যায়ে পৌণ্ড্রকদের সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।** ঐতিহাসিকদের মতে, মনুস্মৃতি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্ররা মূলত রাজন্য ও ক্ষত্রিয় বর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব ভারতে শ্রমণ ধর্ম (বৌদ্ধ ও জৈন) এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় রাজতন্ত্রের প্রসারের ফলে তাঁরা কট্টর বৈদিক পুরোহিততন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করেননি। ঠিক এই সময়কালেই গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণীতে পূর্ব ভারতের এই স্বাধীনচেতা ক্ষত্রিয় শক্তির উত্থান লিপিবদ্ধ হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ম্যাসিডনের সম্রাট আলেকজান্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে ঝিলাম নদীর (গ্রীক সাহিত্যে Hydaspes) তীরে রাজা পুরুকে পরাস্ত করার পর আলেকজান্ডার যখন বিপাশা নদীর (গ্রীক সাহিত্যে Hyphasis) তীরে পৌঁছান, তখন তিনি পূর্ব ভারতের এক বিশাল ও দুর্ভেদ্য সামরিক শক্তির সংবাদ পান। গ্রীক ও রোমান ইতিহাসবিদরা এই শক্তিকে যৌথভাবে **'প্রাসিওই' (Prasioi বা প্রাচ্য দেশ) এবং 'গঙ্গারিডাই' (Gangaridai বা গঙ্গার তীরবর্তী ও বদ্বীপ অঞ্চল)** নামে অভিহিত করেছেন। ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে প্রাচীন বাংলার দুটি প্রধান স্তম্ভ ছিল উত্তরের পুণ্ড্রবর্ধন (পৌণ্ড্রদেশ) এবং দক্ষিণের বঙ্গ বা গঙ্গারিডাই। করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা এবং গঙ্গা-পদ্মার পবিত্র জলপ্রবাহ দ্বারা বিধৌত পৌণ্ড্রদেশ ছিল এই প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ থেকে ২৯৮ অব্দের মধ্যে **গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস (Megasthenes)** মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় অবস্থানকালে তাঁর বিখ্যাত **'ইন্ডিকা' (Indica)** গ্রন্থ রচনা করেন। মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থটি কালক্রমে বিলুপ্ত হলেও পরবর্তী গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনায় তার অংশবিশেষ সংরক্ষিত হয়েছে। মেগাস্থিনিস পূর্ব ভারতের যে সামরিক শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন, তা মূলত মগধ, পৌণ্ড্রদেশ এবং বঙ্গের সম্মিলিত ক্ষত্রিয় বাহিনীরই প্রতিচ্ছবি। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন **'পান্ডাইয়া' (Pandaia / Pandae)** নামে এবং পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ জনপদগুলির বিবরণ দিয়েছেন। আধুনিক ইতিহাসবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদদের একটি বড় অংশ মনে করেন, **গ্রীক উচ্চারণে 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র'**

শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে 'পান্ডে' (Pandae) বা প্রাচ্য (Prasioi) রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত **গ্রীক ইতিহাসবিদ ডিউডোরাস সিকুলাস (Diodorus Siculus, খ্রিস্টপূর্ব ৯০–৩০ অব্দ) তাঁর বিশ্ব-ইতিহাস গ্রন্থ 'বিবলিওথেকা হিস্টোরিকা' (Bibliotheca Historica)-এর** সপ্তদশ খণ্ডে (Book XVII, Chapter 93) উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে বিপাশা নদীর তীরে আলেকজান্ডার জানতে পারেন গঙ্গা নদীর ওপারে প্রাসিওই ও গঙ্গারিডাই নামক যে রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে, তাদের সেনাবাহিনীতে রয়েছে ২,০০,০০০ পদাতিক সৈন্য, ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৮,০০০ রথ এবং ৪,০০০ সুশিক্ষিত যুদ্ধহস্তী। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বাস্তবতায় বরেন্দ্রভূমি বা পৌণ্ড্রদেশ এবং মধুপুর ও হিমালয়ের পাদদেশীয় অরণ্য অঞ্চল ছিল যুদ্ধহস্তী সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের প্রধান ক্ষেত্র। মহাভারতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের গজবাহিনী ও রথচালনায় নিপুণ বলা হয়েছে। সুতরাং, গ্রীক সাহিত্যে বর্ণিত এই ৪,০০০ যুদ্ধহস্তী ও ২ লক্ষ পদাতিক বাহিনীর একটি বিশাল অংশই গঠিত হয়েছিল পৌণ্ড্রদেশের অকুতোভয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের নিয়ে। এই বিশাল ক্ষত্রিয় বাহিনীর রণসজ্জার সংবাদ শুনেই খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের গ্রীষ্মকালে আলেকজান্ডারের গ্রীক বাহিনী বিপাশা নদীর জল অতিক্রম করে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে এবং আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগে বাধ্য হন।

রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে পূর্ব ভারতের এই ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের শৌর্যবীর্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আলোচিত হয়েছে:

১. কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস (Quintus Curtius Rufus, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী): রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের শাসনকালে (খ্রিস্টীয় ৪১–৫৪ অব্দ) রচিত তাঁর **'হিস্টোরিয়া আলেকজান্দ্রি মাগনি' (Historiae Alexandri Magni)** গ্রন্থের নবম খণ্ডে (Book IX, Chapter 2) কার্টিয়াস রুফাস পূর্ব ভারতের গঙ্গা অববাহিকার যোদ্ধাদের পরাক্রম বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, **গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী জাতিসমূহ—যার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সমগ্র পৌণ্ড্রবর্ধন ও সমতট অন্তর্ভুক্ত ছিল—কোনো বিদেশি শক্তির অধীনতা স্বীকার করেনি।**

২. প্লিনি দ্য এল্ডার (Pliny the Elder, ২৩–৭৯ খ্রিস্টাব্দ): খ্রিস্টীয় ৭৭ অব্দে সমাপ্ত তাঁর বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ **'ন্যাচারালিস**

হিস্টোরিয়া' (Naturalis Historia)-এর ষষ্ঠ খণ্ডে (Book VI, Chapter 21–22) প্লিনি গঙ্গা নদীর গতিপথ এবং তার উভয় তীরের জনজাতি ও রাজ্যগুলির একটি তালিকা প্রদান করেছেন। প্লিনি পূর্ব ভারতের কলিঙ্গ, ম্যাকো-কলিঙ্গ (Macco-Calingae), গঙ্গারিডাই এবং গঙ্গা অববাহিকার উর্বর সমভূমির কৃষি ও সামরিক শক্তির উল্লেখ করেছেন। প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী, এই অঞ্চলের রাজারা সবসময় বিশাল পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী প্রস্তুত রাখতেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ঐতিহাসিকভাবেই একদিকে ছিলেন দক্ষ শাসক ও যোদ্ধা, এবং অন্যদিকে উর্বর নদীমাতৃক ভূমির প্রধান ভূস্বামী। করতোয়া ও গঙ্গার জল সেচকার্যে ব্যবহার করে তাঁরা যে বিপুল কৃষি-অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন, তা-ই এই বিশাল সামরিক বাহিনী ভরণপোষণের মূল ভিত্তি ছিল।

৩. প্লুটার্ক (Plutarch, ৪৬–১২০ খ্রিস্টাব্দ) ও অ্যারিয়ান (Arrian, ৮৬–১৬০ খ্রিস্টাব্দ): খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে রচিত প্লুটার্কের **'লাইফ অব আলেকজান্ডার' (Life of Alexander, Chapter 62)** এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে (আনুমানিক ১৩০–১৪৫ খ্রিস্টাব্দ) রচিত রোমান শাসনকর্তা ও **গ্রীক ঐতিহাসিক অ্যারিয়ানের 'অ্যানাব্যাসিস আলেকজান্দ্রি' (Anabasis Alexandri)** গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **পূর্ব ভারতের ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা দেহের গঠনে ছিলেন দীর্ঘকায়, সাহসী এবং সমরবিদ্যায় পারদর্শী। অ্যারিয়ান তাঁর 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে ভারতীয় সমাজে যোদ্ধাদের (ক্ষত্রিয়) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যাঁরা শান্তির সময়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উপভোগ করতেন এবং যুদ্ধের সময়ে দেশরক্ষায় প্রাণপাত করতেন। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ঐতিহাসিক জীবনধারার সাথে হুবহু মিলে যায়।**

৪. টলেমির ভূগোল, পেরিপ্লাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে পৌণ্ড্রদেশের নগরায়ণ ও রোমান বাণিজ্যঃ গ্রীক ও রোমান সাহিত্য কেবল সামরিক ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইন্দো-রোমান বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পৌণ্ড্রদেশের উন্নত নগর সভ্যতা ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথাও ধ্রুপদী সাহিত্যে স্থান পায়। **পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সি (Periplus of the Erythraean Sea, আনুমানিক ৬০–৮০ খ্রিস্টাব্দ),** এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা এই সামুদ্রিক নির্দেশিকায় প্রাচীন বাংলার গঙ্গা বন্দর, তাম্রলিপ্ত এবং উত্তরবঙ্গের সাথে সংযুক্ত নদীপথের বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, **এই অঞ্চল থেকে বিশ্বসেরা মসলিন বস্ত্র**

(Gangetic Muslin), তেজপাতা (Malabathrum) এবং শস্য রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি হতো। হিমালয়ের পাদদেশীয় পৌণ্ড্রদেশ থেকে করতোয়া ও গঙ্গার জলপথে এই পণ্যসামগ্রী সমুদ্রবন্দরে পৌঁছাত।

ক্লডিয়াস টলেমির 'জিওগ্রাফিয়া' (Claudius Ptolemy's Geographia, আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টাব্দ): আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ টলেমি তাঁর গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে (Book VII, Chapter 1) গঙ্গা নদীর বদ্বীপ এবং তার উত্তরাঞ্চলের নদী ও নগরগুলির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ বিবরণ দিয়েছেন। টলেমি গঙ্গার পাঁচটি মোহনা এবং অভ্যন্তরীণ নদীপথের তীরে অবস্থিত সমৃদ্ধ নগরগুলির উল্লেখ করেছেন। **ঐতিহাসিকদের মতে, টলেমির মানচিত্রে প্রদর্শিত গঙ্গার উত্তরাঞ্চলীয় নগরগুলি তৎকালীন পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।**

প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন (মহাস্থানগড় বা পুণ্ড্রনগর): গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের এই বিবরণ যে কোনো কল্পকাহিনী নয়, তার অকাট্য প্রমাণ মিলেছে বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় অবস্থিত **মহাস্থানগড় (প্রাচীন পুণ্ড্রনগর বা পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী)** এবং **পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় ও বাণগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে।**

১. মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী শিলালিপি (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী): ১৯৩১ সালে আবিষ্কৃত এই শিলালিপিটি মৌর্য যুগের প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এতে **'পুদনগল' (পুণ্ড্রনগর) এবং 'সংবঙ্গীয়' (বঙ্গ ও পুণ্ড্রের সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ)-এর** সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। গ্রীক লেখকরা যে সময়ে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দী) পূর্ব ভারতের শক্তিশালী রাজ্যের কথা লিখছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যে পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পুণ্ড্রনগর একটি সুশাসিত, ধনী ও দুর্গবেষ্টিত মহানগরী ছিল, এই শিলালিপি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

২. রোমান মৃৎপাত্র ও মুদ্রা: মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর) এবং বাণগড় উৎখননে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর **'রুলেটেড ওয়্যার' (Rouletted Ware),** অ্যাম্ফোরা পাত্রের ভগ্নাংশ এবং উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র (NBPW) আবিষ্কৃত হয়েছে। **এই প্রত্নবস্তুগুলি প্রমাণ করে যে, প্লিনি এবং টলেমির সময়ে রোমান বণিকদের সাথে পৌণ্ড্রদেশের শাসক ও বণিকদের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।**

গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের এই কালানুক্রমিক দলিলগুলি ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে

প্রতিষ্ঠিত করে। মধ্যযুগে বা সেন আমলের শেষভাগে রচিত কুলজী গ্রন্থ কিংবা সামাজিক সংস্কারের ফলে বাংলার আদি ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী—বিশেষত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক মর্যাদাকে যেভাবে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছিল, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য তাকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেয়। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ মেগাস্থিনিস, ডিউডোরাস, প্লিনি কিংবা টলেমি কোনো দেশীয় বর্ণবাদী সংস্কারের বশবর্তী ছিলেন না; তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য সূত্রে যা জেনেছিলেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের বিবরণ থেকে এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে:

সার্বভৌম সামরিক জাতি: খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত পৌণ্ড্রদেশ এবং সংলগ্ন বঙ্গ অঞ্চলের মানুষ কোনো দাস বা নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারকে প্রতিহতকারী এক অপরাজেয় ক্ষত্রিয় সামরিক শক্তি।

নগর সভ্যতার নির্মাতা: করতোয়া, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলধারাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের মতো দুর্গনগরী, উন্নত জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা: ইক্ষু (যার একটি প্রজাতি ‘পুণ্ড্রক’ বা পৌণ্ড্র আখ নামেই পরিচিত ছিল), ধান এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণমুদ্রা বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন, যার উল্লেখ প্লিনি দ্য এল্ডার আক্ষেপের সাথেই তাঁর গ্রন্থে করেছেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে বিপাশা নদীর তীর থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় ১৫০ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে রচিত টলেমির ভূগোল পর্যন্ত—**প্রায় পাঁচশত বছরের গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার যে শৌর্য, ঐশ্বর্য ও রাজসিক গরিমা অঙ্কিত হয়েছে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ তার অন্যতম প্রধান ও বৈধ উত্তরাধিকারী।** দেশীয় মহাকাব্যের শ্লোক এবং পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী ইতিহাসের এই মেলবন্ধন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভারতের এক প্রাচীনতম, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও গৌরবময় ক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী আসন প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Arrian. The Campaigns of Alexander (Anabasis Alexandri). Translated by Aubrey de Sélincourt,

revised by J. R. Hamilton, Penguin Books, 1971.

২. Bandyopadhyay, Rakhaldas. Bangalar Itihas (বাংলার ইতিহাস - প্রথম খণ্ড). Nababharat Publishers, 1971.

৩. Bhandarkar, D. R. "Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan." Epigraphia Indica, vol. 21, 1931–1932, pp. 83–91.

৪. Bühler, Georg, translator. The Laws of Manu (Manusmriti). Sacred Books of the East, vol. 25, Oxford University Press, 1886.

৫. Curtius Rufus, Quintus. The History of Alexander. Translated by John Yardley, Penguin Classics, 1984.

৬. Diodorus Siculus. Library of History (Bibliotheca Historica). Translated by C. Bradford Welles, vol. 8 (Books 16.66–17), Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1963.

৭. Majumdar, Ramesh Chandra, editor. The History of Bengal, Volume I: Hindu Period. University of Dacca, 1943.

৮. Majumdar, Ramesh Chandra. The Classical Accounts of India. Firma KLM Private Limited, 1960.

৯. McCrindle, John Watson. Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian. Chuckervertty, Chatterjee & Co., 1926.

১০. McCrindle, John Watson. Ancient India as Described by Ptolemy. Thacker, Spink & Co., 1885.

১১. Pliny the Elder. Natural History (Naturalis Historia). Translated by H. Rackham, vol. 2 (Books 3–7), Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1942.

১২. Plutarch. Greek Lives: Alexander. Translated by Robin Waterfield, Oxford University Press, 1998.

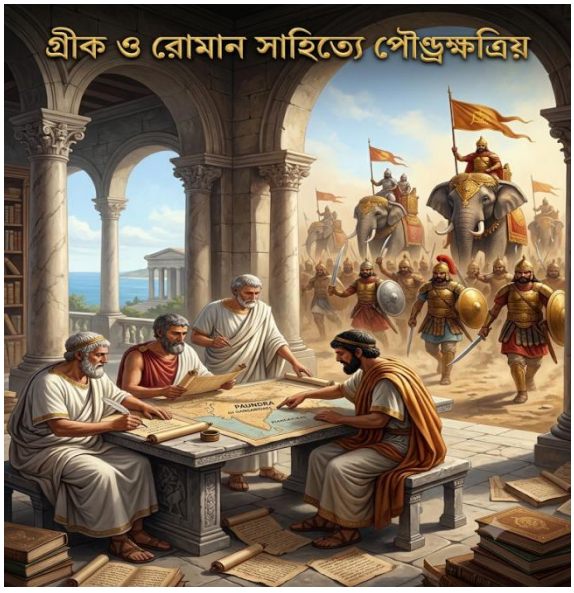
১৩. Ray, Niharranjan. Bangalir Itihas: Adi Parba (বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব). Dey's Publishing, 1993.

১৪. Salles, Jean-François. "Excavations at Mahasthangarh: New Evidence of Contacts with the Ganges Valley." Journal of Bengal Art, vol. 4, 1999, pp. 25–42.

১৫. Schoff, Wilfred H., translator. The Periplus of the Erythraean Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First Century. Longmans, Green, and Co., 1912.

১৬. Sukthankar, Vishnu Sitaram, et al., editors. The Mahabharata (Critical Edition). Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933–1966.

· **জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।**



পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নগরী মহাস্থানগড়

-শ্রী সন্ধাত সেন

দক্ষিণ এশিয়া তথা প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রগঠন, নগরায়ণ, কারিগরি উৎকর্ষ এবং সামরিক ইতিহাসের প্রথম ও সর্বপ্রধান স্মারক হলো করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গনগরী **‘পুণ্ড্রনগর’ (অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মহাস্থানগড়)**। আধুনিক ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এটি আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকে মধ্যযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে টিকে থাকা এই সুবিশাল ও সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতার মূল স্থপতি, শাসক ও প্রতিরোধকারী শক্তি ছিলেন বাংলার আদি রাজন্য জাতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় (Poundra Kshatriya) সম্প্রদায় (রায় ৮৪–৮৬; Majumdar 35–38)। বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, এবং সর্বোপরি মহাস্থানগড় থেকে আবিষ্কৃত মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ পুণ্ড্রনগরীর বুকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও সামরিক শৌর্যের অকাট্য সাক্ষ্য বহন করছে।

প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের নাম থেকেই এর অধিবাসী **'পৌণ্ড্র'** এবং তাঁদের রাজধানী **'পুণ্ড্রনগর'**-এর নামকরণ হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ও ঐতিহাসিকদের মতে, পুণ্ড্রদেশের সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে অতি মিষ্ট **'পৌণ্ড্রক' ইক্ষু বা আখ** উৎপন্ন হতো, যা থেকে এই জাতির নাম **'পৌণ্ড্র'** হয়েছে (রায় ৮৫; মজুমদার ১৬)। আবার পৌরাণিক ঐতিহ্য মতে, **চন্দ্রবংশীয় মহারাজা যযাতির বংশধর বা মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় পুত্র 'পুণ্ড্র'-এর নামানুসারে এই রাজ্যের উৎপত্তি (করণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ ২২–২৬)।**

বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে, প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা লাল মাটির উচ্চ বরেন্দ্রভূমিতে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। করতোয়া নদীর খরস্রোতা জলরাশি ও এর গভীর জলপথ পুণ্ড্রনগরকে একদিকে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত রেখেছিল এবং অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর হয়ে দূরপ্রাচ্য ও উত্তর ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জলবাণিজ্যের সংযোগ স্থাপন করেছিল (Dutta 126–128)।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর সপ্তম পঞ্চিকার ১৮তম অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের অবাধ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রদের যে স্বাধীন রাজন্যবর্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পুণ্ড্ররা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় (Majumdar 35; Raychaudhuri 92)। আর্যাবর্তের যজ্ঞকেন্দ্রিক সংকীর্ণ সামাজিক কাঠামোর বাইরে পৌণ্ড্ররা যে নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তা এই বিবরণ থেকেই স্পষ্ট হয়।

মহাকাব্য মহাভারত-এর সভাপর্বে (১৪ ও ৩০ অধ্যায়) পুণ্ড্রনগরের অধিপতি হিসেবে **মহারাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব**-এর বীরত্বগাথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে (Raychaudhuri 108–110)। তিনি মগধের জরাসন্ধের প্রধান মৈত্রীসঙ্গী ছিলেন এবং কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পূর্ব ভারতে এক সার্বভৌম শক্তি গড়ে তুলেছিলেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন যখন পূর্ব ভারতের দিগ্বিজয়ে আসেন, তখন তাঁকে পুণ্ড্রনগরীতে প্রচণ্ড সামরিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব ও দ্রোণপর্বে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বাহিনীর দুর্ধর্ষ পদাতিক ও হস্তিবাহিনীর পরাক্রমের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় (মজুমদার ১৭–১৮)।

সামাজিক স্মৃতিশাস্ত্র মনুস্মৃতি-র দশম অধ্যায়ের ৪৩–৪৪ নম্বর শ্লোকে আচার্য মনু পৌণ্ড্রদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন - "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাস্ত

ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ..." (মনুস্মৃতি ১০/৪৩–৪৪) অর্থাৎ, পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড় প্রমুখ জাতি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় জাতি। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সংকীর্ণ যাগযজ্ঞ ও অনুশাসন বর্জন করে নিজস্ব স্বাধীন ধর্মাচরণের কারণে শাস্ত্রকাররা তাঁদের 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়' বা স্বাধীন ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছিলেন (Karan, A Short History 18–21)। মনুর এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে মহাস্থানগড় ছিল খাঁটি ক্ষত্রিয় আর্য রাজন্যবর্গের রাজধানী।

মহাস্থানগড় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদি নগরী 'পুণ্ড্রনগর', তা কেবল সাহিত্যিক অনুমানে সীমাবদ্ধ নয়; বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তা নিশ্চিত হয়েছে। ১৯২৮–১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (Archaeological Survey of India) তত্ত্বাবধায়ক **কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত (K. N. Dikshit)**-এর নেতৃত্বে মহাস্থানগড়ে প্রথম বিধিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক খননকাজ শুরু হয়। এর ঠিক দুই বছর পর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের টিলা খননের সময় একটি প্রাচীন চুনাপাথরের ফলক আবিষ্কৃত হয়, যার পরিমাপ ছিল প্রায় ৫.৭ × ৩.২ সেন্টিমিটার। এতে ছয়টি পঙক্তিতে মৌর্য যুগের আদি ব্রাহ্মী হরফে ও মাগধী প্রাকৃতে নির্দেশ খোদাই করা ছিল (Bhandarkar 83; Barua 57)। **প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর** ১৯৩১–১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক পত্রিকা Epigraphia Indica (২১শ খণ্ড)-তে এবং **ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে The Indian Historical Quarterly (১০ম খণ্ড)**-তে এর প্রামাণ্য পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

এই লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে নগরীর নাম লেখা রয়েছে—**'পুডনগল' (পুণ্ড্রনগর)**। লিপিটি সম্রাট অশোকের সমসাময়িক বা মৌর্য যুগের প্রারম্ভের (খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক)। এতে বলা হয়েছে - পুণ্ড্রনগরের মহামাত্র (প্রশাসনিক প্রধান) এক জরুরি রাজকীয় নির্দেশ প্রচার করছেন যে, কোনো এক আকস্মিক জাতীয় দুর্যোগকালে (সম্ভবত অনাবৃষ্টি বা ফসলহানি) প্রজাসাধারণের দুর্দশা মোচনের জন্য সরকারি রাজকোষ ও শস্যাগার থেকে সহায়তা দেওয়া হবে (Bhandarkar 85–88)। রাজকীয় কোষ্ঠাগার (Granary) থেকে খাদ্যশস্য—বিশেষ করে ধান্য (ধান) এবং তৈল (তেল) বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় (Barua 61–63)। একই সঙ্গে সংকট মোকাবেলায় জরুরি মুদ্রার জোগান হিসেবে **'গণ্ডক' এবং 'কাকণিক'** নামের তাম্র ও কড়ি মুদ্রা ঋণ ও

অনুদান হিসেবে বিতরণের আদেশ ছিল (Bhandarkar 89–91)। সুদিন ফিরে এলে এবং প্রাচুর্য দেখা দিলে প্রজারা পুনরায় সেই শস্য ও অর্থ পুণ্ড্রনগরের কোষ্ঠাগারে ফিরিয়ে দেবে, যাতে ভবিষ্যৎ বিপদে অন্য প্রজারা সহায়তা পেতে পারে (Barua 64–65)। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজধানী পুণ্ড্রনগরে যে একটি প্রজাহিতৈষী, অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমতুল্য ঋণদান প্রথা এবং মুদ্রা-অর্থনীতি চালু ছিল—মহাস্থান শিলালিপি তার এক জীবন্ত দলিল।

পৌণ্ড্রনগরী শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না, বরং তা ছিল বিশ্বখ্যাত বস্ত্রশিল্প ও কারুশিল্পের বৈশ্বিক প্রাণকেন্দ্র। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্য রচিত বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থ কৌটিলীয় **'অর্থশাস্ত্র'** (রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ–৩য় শতক)-এর দ্বিতীয় অধিকরণের একাদশ অধ্যায়ে ('কৌষেরিকপ্রকরণম্') পুণ্ড্রদেশের বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আর. শামশাস্ত্রী এবং ১৯৬০–১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আর. পি. কাঙ্গলে কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত সংস্করণ অনুসারে - কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন যে, **পুণ্ড্রদেশে প্রস্তুত 'পৌণ্ড্রক' (Paundraka) দুকূল বস্ত্র ছিল সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বস্ত্র ছিল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো অম্লান ও মসৃণ ("শ্যামং মণিস্নিগ্ধং পৌণ্ড্রকম্") (কৌটিল্য ১১২–১১৪; Kangle, Part II 102–104; Shamasastry 81–82)**। রেশম জাতীয় **'পত্রোর্ণ'** এবং ক্ষৌম বস্ত্র উৎপাদনে পৌণ্ড্রদের কারিগররা বিশ্ববিজয়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। করতোয়া নদীর মাধ্যমে এই উন্নত বস্ত্র ও কৃষিপণ্য দক্ষিণবঙ্গের তাম্রলিপ্ত বন্দরে পাঠানো হতো এবং সেখান থেকে সিংহল, সুবর্ণভূমি (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) ও রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি করা হতো (Dutta 129–131)।

মহাস্থানগড়ে শুঙ্গ ও কুশাণ যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক – খ্রিস্টীয় ২য় শতক) স্তরে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে অসংখ্য ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা (Punch-marked coins), ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা (Cast copper coins), সুদৃশ্য পোড়ামাটির ফলক (Terracotta plaques), আধা-মূল্যবান পাথরের পুঁতি এবং মসৃণ উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্র (NBPW) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রনগরী এক অবিচ্ছিন্ন বৈভবের চূড়ায় আসীন ছিল (মজুমদার ২৮–৩২)।

গুপ্ত যুগে পৌণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন সমগ্র পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়। গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তের আমলে জারিকৃত বিখ্যাত দামোদরপুর তাম্রশাসনসমূহ (যার মধ্যে প্রথমটি গুপ্তাব্দ ১২৪ বা ৪৪৩–৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি গুপ্তাব্দ ১২৮ বা ৪৪৭–৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ) এবং বৈগ্রাম তাম্রশাসন (৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে পুণ্ড্রনগরের প্রশাসনিক উৎকর্ষের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় (মজুমদার ৪২–৪৬; Majumdar 49–53)। **গুপ্ত যুগে পুণ্ড্রনগর ছিল সুবিশাল 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'-র রাজধানী। উত্তরবঙ্গের হিমালয় পাদদেশ থেকে শুরু করে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।** দামোদরপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রনগরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা 'উপরিক মহারাজ'-এর অধীনে স্থানীয় শাসন পরিচালনা করত একটি **পঞ্চমুখী পরিষদ বা 'অধিকরণ'।** এতে নগরশ্রেষ্ঠী (বণিক প্রধান), সার্থবাহ (ব্যবসায়ী কাফেলার প্রধান), প্রথম কুলিক (শিল্প ও কারিগর সমিতির প্রধান) এবং প্রথম কায়স্থ (মুখ্য সচিব)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হতো (Majumdar 52–54)। এই পরিষদে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শীর্ষস্থানীয় ভূস্বামী ও বাণিজ্যপতিদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল, যা তৎকালীন ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিকেন্দ্রীভূত ও নাগরিক প্রশাসনের উদাহরণ।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ও সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক কালে বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (Xuanzang) ৬৩৮–৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে সরাসরি পুণ্ড্রনগরী ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত সি-ইউ-কি (Si-Yu-Ki) গ্রন্থে তিনি এই নগরীর এক অনুপম চিত্র তুলে ধরেছেন (Majumdar 76–78; বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫–১০৭)। তিনি লিখেছেন, পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের পরিধি ছিল চার হাজার লি এবং রাজধানী পুণ্ড্রনগরের পরিধি ছিল ত্রিশ লি (প্রায় ৫ মাইল)। নগরীটি ছিল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং সর্বত্র সমৃদ্ধির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এখানকার ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি লেখেন যে ভূমি অত্যন্ত উর্বর, নিয়মিত চাষাবাদ হয়, এবং পুণ্ড্রনগরীর জলাশয়গুলোর সুমিষ্ট জলের গুণে ফলমূল (বিশেষত বিপুল আকারের কাঁঠাল বা পানাস) এবং শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। **হিউয়েন সাং পুণ্ড্রনগরের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত ইতিবাচক মন্তব্য করে বলেছেন যে এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন জ্ঞানানুরাগী, সাহসী, ধর্মপরায়ণ ও বীরপ্রকৃতির (Majumdar 77)। তিনি রাজধানীর নিকটে**

বিশটি বৌদ্ধ বিহার (যার মধ্যে বিখ্যাত ভাসু বিহার বা 'পো-শি-পো' বিহার অন্যতম) এবং একশতটি দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা পৌণ্ড্র সমাজের ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাংস্কৃতিক উদারতার পরিচয় দেয়।

মহাস্থানগড়ের বর্তমান দুর্গনগরীটির দিকে দৃষ্টি দিলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উন্নত সামরিক স্থাপত্যকলার প্রমাণ মেলে। **দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১,৫২৩ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১,৩৭১ মিটার প্রশস্ত।** দুর্গের চারপাশ ঘিরে ছিল বিশালাকার পোড়ামাটির ইটের তৈরি প্রাচীর, যা স্থানভেদে ৩ থেকে ৪ মিটার পুরু এবং প্রায় ৫ থেকে ৬ মিটার উঁচু ছিল। দুর্গের পূর্ব দিকে প্রাকৃতিকভাবে প্রবাহিত হতো প্রমত্তা করতোয়া নদী, আর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ছিল গভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা (স্থানীয় ভাষায় যাকে 'কাঁকর' বা পরিখা বলা হয়)। এই পরিখাগুলো করতোয়া নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় বর্ষাকালে এবং যুদ্ধের সময় নদীর জলে পরিখা পূর্ণ করে বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা হতো (Dutta 132–134)। এই অনন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৌণ্ড্রনগরকে অপরাজেয় দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার অরাজক পরিস্থিতি বা **'মাৎস্যন্যায়'**-এর অবসান ঘটিয়ে যখন বরেন্দ্রভূমির সন্তান গোপাল পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ), তখন পুণ্ড্রবর্ধন পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। **সন্ধ্যাকর নন্দীর মহাকাব্য রামচরিতম্-এ বরেন্দ্রভূমি ও পুণ্ড্রনগরকে 'পাল সাম্রাজ্যের জনকভূ' (পিতৃভূমি) হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে (রায় ৯০–৯২)।**

দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের আগমন ঘটলে উত্তর ভারতের সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্য প্রথা বাংলায় আরোপিত হয়। স্বাধীনচেতা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও দাসত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করায় সেন আমলে তাঁদের ওপর সামাজিক নিপীড়ন শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি অভিযানের পর করতোয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সংকটের মুখে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি বিশাল অংশ দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে—বিশেষ করে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, যশোর ও খুলনায় চলে আসেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এই দক্ষিণবঙ্গে এসে তাঁদের প্রাচীন যোদ্ধা ও নগর-নির্মাতা স্বভাবের পরিচয় পুনরায় তুলে ধরেন। সুন্দরবনের কৃষি-বিপ্লব

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দ্বারাই শুরু হয়। শ্বাপদসংকুল ও লবণাক্ত সুন্দরবন অঞ্চলে নদীর নোনা জল আটকাতে বিশাল মাটির বাঁধ ও ভেড়ি নির্মাণ করে মিষ্টি জলের আধার তৈরি করে তাঁরা দক্ষিণবঙ্গকে শস্যভাণ্ডারে রূপান্তরিত করেন (Karan, A Short History 56–62)।

মধ্যযুগে সুন্দরবনের গভীর অরণ্য পরিষ্কার করে কৃষিজমি তৈরি, সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন এবং জলদস্যু ও বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করার মূল কারিগর ছিলেন এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যখন উত্তর ও মধ্য বাংলা পেরিয়ে গৌড়ের সুলতানি শক্তি এবং ইসলামি ধর্মপ্রচারক-যোদ্ধারা (যাঁরা ইতিহাসে 'গাজী' বা সুফি-যোদ্ধা নামে চিহ্নিত) ভাটি অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেন, তখন স্থানীয় সভ্যতা, ধর্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এই অঞ্চলের দেশজ নেতৃত্ব। এই দেশজ প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় ও কালজয়ী প্রতীক হলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **দক্ষিণ রায়**।

ষোড়শ শতাব্দীতে যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী দল ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীরদের নিয়ে গঠিত। তাঁরা ঢাল-তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করে অর্জন করেন 'ঢালী' উপাধি; সেনাপতিত্ব করে 'সরদার' ও 'লস্কর' (যা থেকে 'নস্কর'), এবং সীমান্ত ও নৌবহরের দায়িত্ব পালন করে 'হালদার', 'মল্লিক' ও 'মণ্ডল' উপাধিতে ভূষিত হন (করণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ ৮০–৯৪)।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকরা পৌণ্ড্র শব্দটির বিকৃত রূপ ব্যবহার করে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করলে পৌণ্ড্র সমাজের শিক্ষিত মনীষীরা মহাস্থানগড়ের ঐতিহাসিক স্মৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটান। মেদিনীপুরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী মহেন্দ্রনাথ করণ **১৯১৯** খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাগ্রন্থ A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods। এই গ্রন্থে তিনি শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে তথাকথিত অবনমিত এই জনগোষ্ঠীই হলেন প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের মহান ক্ষত্রিয় রাজবংশের উত্তরসূরি (Karan, A Short History 1–84)। পরবর্তীতে **১৯২৮** খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত তাঁর অপর কালজয়ী গ্রন্থ '**পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ**'-এ তিনি মহাস্থানগড়ের পৌণ্ড্রনগরের ইতিহাস বিশদভাবে তুলে ধরে আধুনিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে রাজকীয় আত্মমর্যাদা ও শিক্ষার অভূতপূর্ব চেতনা জাগ্রত করেন

(করণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ ১–১৪০)। পণ্ডিত বেণীমাধব হালদার, রাইচরণ সরদার এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্করের মতো পৌণ্ড্র নেতৃবৃন্দ মহাস্থানগড়ের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আধুনিক ভারতে শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজে এই জাতির স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেন।

মহাস্থানগড় তথা পৌণ্ড্রনগর কেবল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ নয়; এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সহস্রাব্দের বীরত্ব, প্রশাসনিক সার্বভৌমত্ব, কৃষিজ ও বাণিজ্যিক উদ্ভাবনী শক্তির চিরন্তন স্মারক। মহাভারতের রণক্ষেত্র থেকে শুরু করে মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপির দুর্ভিক্ষ-ব্যবস্থাপনা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পৌণ্ড্রক বস্ত্র, এবং হিউয়েন সাং-এর বর্ণিত অনুপম সমৃদ্ধ নগরী—প্রতিটি উপাদানই সাক্ষ্য দেয় যে **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রাই ছিলেন বঙ্গদেশের প্রথম নগর-সভ্যতার জনক ও ধারক।** প্রতিকূল ইতিহাসের মধ্যেও তাঁদের এই অদম্য সৃষ্টিশীলতা ও শৌর্য আজও বাঙালির আত্মপরিচয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তি হিসেবে দীপ্যমান।

তথ্যসূত্রঃ

১. Barua, B. M. "The Old Brahmi Inscription of Mahasthan." The Indian Historical Quarterly, vol. 10, no. 1, 1934, pp. 57–66.

২. Bhandarkar, D. R. "Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan." Epigraphia Indica, vol. 21, 1931–32, pp. 83–91.

৩. Dutta, Gourab. "Rise and Growth of Pundravardhana: A Study on 5th Century B.C.E to 5th Century A.D." Journal of Historical Studies and Research, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 125–36.

৪. Kangle, R. P., editor and translator. The Kautiliya Arthasastra. Parts 1–2, University of Bombay, 1960–63.

৫. Karan, Mahendra Nath. A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods. The All Bengal Bratya Kshattriya Samiti, 1919.

৬. Kautilya. Kautilya's Arthashastra. Translated by R. Shamasastry, Government Press, 1915.

৭. Majumdar, R. C., editor. The History of Bengal: Hindu Period.

Vol. 1, The University of Dacca, 1943.

৮. Raychaudhuri, Hemchandra. Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. 6th ed., University of Calcutta, 1953.

৯. করণ, মহেন্দ্রনাথ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ। অল বেঙ্গল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি, ১৯২৮।

১০. কৌটিল্য। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৫০।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। বাঙ্গালার ইতিহাস। ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ২০০২।

১৩. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্র সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব

- শ্রী বাসুদেব সরকার

প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে যে কয়টি চরিত্র নিজস্ব সামরিক শৌর্য, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শন এবং সর্বভারতীয় আধিপত্যকামী শক্তির বিরুদ্ধে অবিচল প্রতিরোধের জন্য অনন্য হয়ে রয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনপদের সার্বভৌম অধিপতি **সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব**। সনাতন ভক্তিবাদী সাহিত্যে (যেমন *শ্রীমদ্ভাগবত* বা পরবর্তী বৈষ্ণব উপপুরাণসমূহে) পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে প্রায়শই দেবত্বের এক অহংকারী বা ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণকারী ('নকল বাসুদেব') হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু মহাকাব্য *মহাভারত*-এর **সভাপর্ব** এবং খিল-অংশ হিসেবে স্বীকৃত প্রাচীনতম হরিবংশ পুরাণের **বিষ্ণুপর্ব** নিবিড়ভাবে পাঠ করলে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও গভীর ঐতিহাসিক সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আধুনিক ইতিহাসচর্চার আলোকে পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন মহাভারতের যুগের পূর্ব ভারতের (পুণ্ড্র, বঙ্গ, কিরাত ও সন্নিহিত অঞ্চল) এক অপরাজেয় ক্ষত্রিয় সম্রাট। তাঁর সঙ্গে দ্বারকার যাদবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্ব কোনো ব্যক্তিগত ঈর্ষার কাহিনী ছিল না; তা ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাঞ্চলীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলীয় ও মধ্যদেশীয় শক্তির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও

ধর্মতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সংঘাত। আধুনিক ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ *History of Ancient Bengal* (১৯৭১)-এ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের এই সাম্রাজ্যিক গুরুত্বকে চিহ্নিত করে তাঁকে সপ্তম-অষ্টম শতকের বাঙালি দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের (যেমন শশাঙ্ক ও ধর্মপাল) মহাকাব্যিক অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মহাভারত-এর সভাপর্বের অন্তত তিনটি পৃথক পর্বে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বিশাল রাজনৈতিক প্রভাব, সামরিক প্রতাপ ও সাম্রাজ্যিক বিস্তারের প্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে। সভাপর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে (জরাসন্ধবধ পর্ব) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের নিকট তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মগধরাজ জরাসন্ধ এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সম্মিলিত শক্তির সমীহজনক রূপ তুলে ধরেন। কৃষ্ণ উল্লেখ করেন যে, মগধের সম্রাট জরাসন্ধের সামরিক মিত্রতা লাভ করে পৌণ্ড্রক বাসুদেব সমগ্র পূর্ব ভারতে এক অপ্রতিরোধ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কৃষ্ণ সভাপর্বে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন:

"পুণ্ড্রকো বাসুদেবো যঃ প্রাচেতস্যাভিরুচ্যতে।

স চাভিপন্নো বলবান্ জরাসন্ধং সমাশ্রিতঃ।।"

(মহাভারত, সভাপর্ব ১৪.১৭–১৮)

(বাংলা অনুবাদ: "যিনি প্রচেতসের (প্রাচীন বার্হি) পুত্র রূপে অভিহিত হন এবং পুণ্ড্র দেশের অধিপতি বাসুদেব নামে পরিচিত, সেই বলবান পুণ্ড্রক বাসুদেবও জরাসন্ধের শরণাপন্ন বা অনুগত হয়ে পড়েছেন।")

শ্রীকৃষ্ণ জানান যে, বলবান রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব সমগ্র পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং সংলগ্ন কিরাত ভূমির অধিপতি ছিলেন এবং জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্রকের এই অক্ষশক্তি এতটাই অপরাজেয় ছিল যে, তাঁদের সামরিক চাপের মুখেই মথুরা ত্যাগ করে যাদবদের সুদূর পশ্চিম উপকূলে দ্বারকায় নতুন বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজনৈতিক আধিপত্য কেবল স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা তৎকালীন সর্বভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে সভাপর্বের ৩০তম অধ্যায়ে পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় ভ্রাতা ভীমসেনের পূর্ব ভারত অভিযানের বিশদ বিবরণ রয়েছে। ভীম যখন অঙ্গ ও মোদাগিরি (বর্তমান মুঙ্গের) জয় করে পূর্ব অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন পুণ্ড্র জনপদে তাঁকে চরম প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল:

"ততো দুর্ধর্ষমাসীদ্য পুণ্ড্রাধিপতিমোজসা।

কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহাবলম্।।"

(মহাভারত, সভাপর্ব ৩০.২০)

(বাংলা অনুবাদ: "তৎপর কৌশিকী নদীর কচ্ছ বা তীরভূমিতে নিবাসী, মহাবলশালী এবং পুণ্ড্রাধিপতি সেই রাজা নিজ ওজস বা পরাক্রমে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন।")

ভীমকে পুণ্ড্রাধিপতি এবং কৌশিকী নদীর (বর্তমান কোশী নদী) তীরবর্তী অঞ্চলের পরাক্রমশালী রাজাদের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মহাভারত অনুসারে, ভীম সেখানে পৌণ্ড্রকদের সামরিক শক্তির সমীহ আদায় করেন এবং কোনো স্থায়ী ভূখণ্ড দখল না করে কেবল আনুগত্য ও কর গ্রহণ করে বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হন। এই বর্ণনা নিশ্চিত করে যে, পৌণ্ড্র জনপদ কোনো অরক্ষিত বা প্রান্তিক অঞ্চল ছিল না; এটি ছিল এক শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় সেনাবহরের ঘাঁটি।

সভাপর্বে চেদিরাজ শিশুপাল যখন রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজার তীব্র বিরোধিতা করেন, তখন তিনি তৎকালীন ভারতের প্রকৃত বীর ও রাজচক্রবর্তীদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে পৌণ্ড্রাধিপতির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। শিশুপাল সভামধ্যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, যিনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় নন বা যিনি অভিষিক্ত সম্রাট নন, তাঁকে বাদ দিয়ে পুণ্ড্র ও কলিঙ্গের মতো স্বাধীন সাম্রাজ্যের অধিপতিদের মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে **আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের নিকট পৌণ্ড্রক বাসুদেব এক পরম সম্মানিত ও সার্বভৌম শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।**

মহাভারতের খিল-অংশ হিসেবে সুসংবদ্ধ হওয়া *হরিবংশ পুরাণ*-এর বিষ্ণুপর্বে (অধ্যায় ৩৪–৩৫ বা ভিন্ন সংস্করণে ৯১–৯২) পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পূর্ণাঙ্গ সামরিক ও ধর্মতাত্ত্বিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। হরিবংশে পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে কেবল পুণ্ড্রবর্ধনের শাসক হিসেবে নয়, বরং সমগ্র পূর্ব ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর অধীনস্থ অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল:

পুণ্ড্র (উত্তর ও মধ্য বাংলা): তাঁর মূল রাজধানী ও অর্থনৈতিক দুর্গ।

বঙ্গ ও সমতট (পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা): গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও নদীমাতৃক বাণিজ্যপথ।

কিরাত ভূখণ্ড (হিমালয়ের পাদদেশীয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল): অরণ্যসংকুল পার্বত্য অঞ্চল, যা দুর্ধর্ষ পদাতিক ও তীরন্দাজ সৈন্য সরবরাহ করত।

হরিবংশের কেন্দ্রীয় সংঘাত গড়ে উঠেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌণ্ড্রক বাসুদেবের এক ঐতিহাসিক বার্তাকে কেন্দ্র করে। পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত পাঠিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেন:

"বাসুদেবোঽহমেকস্তু ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চন।

ত্যজ চিহ্নানি মে মূঢ় যৈস্ত্বং চরসি মৎসমঃ।।"

(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব)

(বাংলা অনুবাদঃ "আমি এক এবং অদ্বিতীয় বাসুদেব, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। হে মূঢ়! আমার যে সমস্ত চিহ্ন (চিহ্ন বা প্রতীক যেমন শঙ্খ, চক্র, গদা ইত্যাদি) ধারণ করে তুমি আমার সমতুল্য বলে নিজেকে মনে করে বেড়াচ্ছ, সেই চিহ্নগুলি ত্যাগ করো।")

পৌণ্ড্রক দাবি করেন যে তিনিই প্রকৃত 'বাসুদেব' এবং তিনিই জগতের শাসনকর্তা; সুতরাং কৃষ্ণ যেন কৃত্রিমভাবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, গরুড়ধ্বজ এবং পীতবস্ত্র পরিধান না করেন। ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি নিছক অন্ধ অনুকরণ নয়। প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতায় সার্বভৌম সম্রাটরা নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে **'দেবরূপী রাজা'** (Divine Kingship বা Devaraja) হিসেবে ঘোষণা করতেন। কৃষ্ণ যেমন পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্ণি-অন্ধক-যাদবদের মধ্যে নিজেকে 'বাসুদেব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রাচ্য ভারতে নিজেকে 'বাসুদেব' অর্থাৎ বিষ্ণুর মূর্ত রূপ হিসেবে ঘোষণা করে নিজের রাজকীয় কর্তৃত্বকে অখণ্ড আধ্যাত্মিক বৈধতা দান করেছিলেন। ফলে এই সংঘাত ছিল প্রতীকী সার্বভৌমত্বের সংঘাত—কে হবেন সমগ্র আর্যাবর্তের একচ্ছত্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র।

হরিবংশ আরও প্রকাশ করে যে, পৌণ্ড্রক একা ছিলেন না; তিনি তৎকালীন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য নগরী কাশীর রাজার সঙ্গে গভীর সামরিক মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। গঙ্গার উচ্চ অববাহিকা (বারাণসী) এবং নিম্ন অববাহিকা (পুণ্ড্র ও বঙ্গোপসাগরের মোহনা) যখন এই দুই মিত্র শক্তির অধীনে চলে আসে, তখন তা মথুরা ও মধ্যদেশীয় আর্য শক্তির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়।

মহাভারত ও হরিবংশের এই আখ্যানের আড়ালে মধ্য ও অন্তিম বৈদিক যুগের পর ভারতের যে রাজনৈতিক বিবর্তন ঘটেছিল, তার এক সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়।

গাঙ্গেয় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ: পুণ্ড্র ছিল গঙ্গার পলিবিধৌত এমন এক ভৌগোলিক অঞ্চল, যা মিষ্টি জলের অভ্যন্তরীণ নৌপথ এবং বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যের চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করত। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ পুণ্ড্রের বস্ত্র ও কৃষিজ পণ্যের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ রয়েছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নেতৃত্বে এই প্রাচ্য অর্থনীতি পশ্চিমা নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম অক্ষ গড়ে তুলেছিল।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধিকার: বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাচ্য দেশকে (পুণ্ড্র, বঙ্গ) যাগযজ্ঞহীন এবং স্বাধীন কৌম হিসেবে অবজ্ঞা করত। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের উত্থান ছিল সেই অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রাচ্যের এক তীব্র সাংস্কৃতিক প্রত্যুত্তর। তিনি

নিজস্ব তন্ত্র, লোকায়ত শক্তি ও বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সমন্বয়ে এক প্রাচ্য ধর্মতাত্ত্বিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক সত্য: ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের শক্তি বহুবার সারা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। পাল সম্রাট ধর্মপালের কনৌজ অভিযান কিংবা রাজা শশাঙ্কের উত্তর ভারত জয়ের যে সাম্রাজ্যবাদী চেতনা সপ্তম শতাব্দীতে দেখা যায়, মহাকাব্যিক যুগে পৌণ্ড্রক বাসুদেবই ছিলেন সেই অখণ্ড বঙ্গীয় সাম্রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবক্তা।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের এই মহাকাব্যিক আখ্যান বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মমর্যাদা ও ইতিহাসের এক সুদৃঢ় ভিত রচনা করে।

স্বীকৃত ক্ষত্রিয় মর্যাদা: মহাভারত ও হরিবংশ কোথাও পৌণ্ড্রকদের হীন বা দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করেনি। বিপরীতে, তাঁদের চিত্রিত করা হয়েছে প্রচণ্ড রণদক্ষ, হস্তিবাহিনী ও নৌবহরে সমৃদ্ধ এক শীর্ষস্থানীয় ক্ষত্রিয় শক্তি হিসেবে।

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় তত্ত্বের সত্যতা: *মনুস্মৃতি* (১০.৪৩–৪৪)-র বিখ্যাত সূত্রে পৌণ্ড্রকদের যে ‘ক্রিয়ালোপ’-এর কারণে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে, পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আচরণ তার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রমাণ। তিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের আদেশ মেনে চলেননি; তিনি নিজের ক্ষাত্র শক্তিতে নিজেকে 'বাসুদেব' ঘোষণা করেছিলেন। এটি সামাজিক হীনতা নয়, বরং ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় জাতির স্বাধীনচেতা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

আধুনিক আন্দোলনের প্রেরণা: বিংশ শতকের শুরুতে যখন মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ* (১৯২৬) রচনা করেন, তখন তিনি মহাভারতের এই অংশগুলি উদ্ধার করে প্রমাণ করেছিলেন যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রক্তে মিশে রয়েছে এক প্রাচীন সাম্রাজ্যিক ও রাষ্ট্রনির্মাতা ঐতিহ্য।

মহাভারতের সভাপর্ব এবং হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে বর্ণিত পৌণ্ড্রক বাসুদেবের উপাখ্যানটি কেবল ধর্মীয় অলৌকিক সংঘাতের দৃষ্টিতে দেখলে ইতিহাসের চরম অবিচার করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন প্রাচীন বাংলার সার্বভৌম রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রথম মহামানব। তিনি সমগ্র প্রাচ্য জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করে সমসাময়িক মগধ, কাশী ও দ্বারকার মতো পরাক্রমশালী রাজ্যগুলির সমকক্ষ এক শক্তিশালী অক্ষ গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এই মহাকাব্যিক যুদ্ধ ছিল মূলত কেন্দ্রমুখী আর্যাবর্তীয় শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার দেশজ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার প্রথম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। যুদ্ধে কৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে পরাজিত করলেও, পৌণ্ড্রক

বাসুদেব যে ক্ষাত্রতেজ, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং বৈপ্লবিক আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা পৌণ্ড্র জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে এক অবিনশ্বর ও চিরভাস্বর অধ্যায় হয়ে বেঁচে রয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Bhandarkar, Ramkrishna Gopal. Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems. Karl J. Trübner, 1913.

২. Chatterji, Suniti Kumar. The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta University Press, 1926.

৩. Dutt, Manmatha Nath, translator. A Prose English Translation of Harivamsa. Elysium Press, 1897.

৪. Karan, Mahendranath. Paundra Kshatriya Kulapradeep. Paundra Kshatriya Samiti, 1926.

৫. Majumdar, Ramesh Chandra. History of Ancient Bengal. G. Bharadwaj & Co., 1971.

---, editor. The History of Bengal, Vol. 1: Hindu Period. University of Dacca, 1943.

৬. Ray, H. C. The Dynastic History of Northern India (Early Mediaeval Period). Vol. 1, University of Calcutta, 1931.

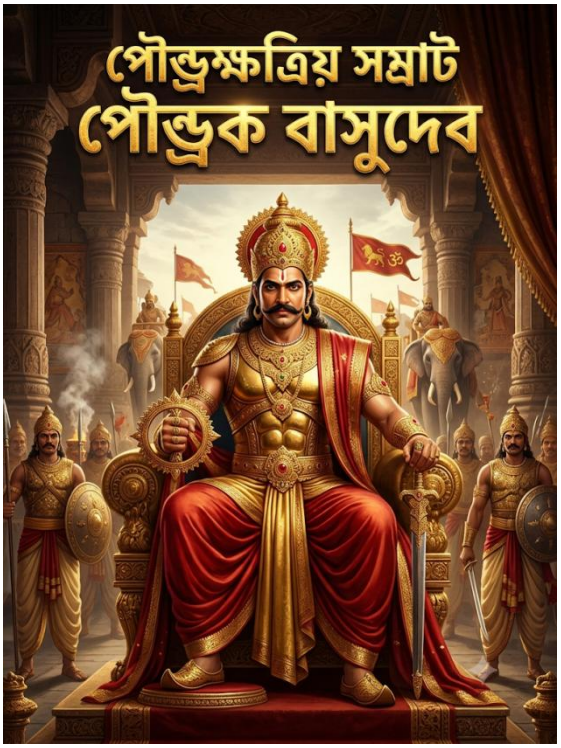
৭. Ray, Niharranjan. Bangalir Itihas: Adiparba. 1949. 3rd ed., Dey's Publishing, 1400 BS [1993].

৮. Roy, Pratap Chandra, translator. The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa: Sabha Parva. Bharata Press, 1884.

৯. Sorenson, Søren. An Index to the Names in the Mahabharata. Motilal Banarsidass, 1963.

১০. www.poundrakshatriya.com

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থে পৌণ্ড্র

- শ্রীবিধিদর্শী সর্বজ্ঞ

সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের সুবিস্তৃত পরিমণ্ডলে 'পৌণ্ড্র' (Pauṇḍra) শব্দটি কেবল একটি জনপদ বা জাতির সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বীরত্বগাথার এক অবিচ্ছেদ্য প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'পৌণ্ড্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং কোষগ্রন্থসমূহে এর বিবিধ অর্থের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচায়ক।

ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুসারে কোনো শব্দের পদসিদ্ধি তার অন্তর্নিহিত অর্থের গভীরতাকে উন্মোচন করে। 'পৌণ্ড্র' শব্দটি মূলত 'পুণ্ড্র' (Puṇḍra) শব্দ থেকে উৎপন্ন। পাণিনীয় ব্যাকরণের ধারা অনুসরণ করে ভট্টোজি দীক্ষিত তার 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' গ্রন্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগের মাধ্যমে এই জাতীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' (Siddhanta Kaumudi) গ্রন্থে জনপদবাচক শব্দ হিসেবে পুণ্ড্র থেকে পৌণ্ড্র হওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণত 'তস্য নিবাসঃ' (পাণিনি ৪.২.৬৯) অথবা 'সোহস্য অভিজনঃ' (পাণিনি ৪.৩.৯০) সূত্রে অণ্ (aṇ) প্রত্যয় যোগ করে 'পৌণ্ড্র' পদটি সিদ্ধ হয়। এখানে আদি স্বরের বৃদ্ধি (Vṛddhi) হয়ে 'উ' কার 'ঔ' কারে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাকরণগত রূপান্তরটি কেবল ব্যাকরণিক নিয়ম নয়, বরং এটি সেই অঞ্চলের অধিবাসী বা রাজার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে সূচিত করে। (ভট্টোজি দীক্ষিত, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, মোতিলাল বেনারসীদাস, প্রকাশকাল ২০০৬, পৃষ্ঠা নম্বর ৩১২)

তদ্ধিত প্রত্যয়ের এই প্রয়োগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রমাণ করে যে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রতীক। পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে, যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন সেই সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশের জন্য অণ্ বা তদ্রূপ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। পৌণ্ড্র শব্দের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি প্রাপ্ত রূপটি সেই জাতির বীরত্ব এবং তাদের ভূমি-সংলগ্ন আভিজাত্যের সাক্ষ্য দেয়।

কাশিকা বৃত্তিতে (Kasika Vritti), যা পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা, সেখানে জনপদ এবং ক্ষত্রিয় বংশের পরিচায়ক হিসেবে পৌণ্ড্র শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশিকাকার বামন ও জয়াদিত্য

স্পষ্ট করেছেন যে, **পৌণ্ড্র বলতে সেই বীর জাতিকে বোঝায় যারা আর্য সংস্কৃতির পূর্বতন ধারার ধারক ছিল।** (বামন-জয়াদিত্য, কাশিকা বৃত্তি, বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল ১৯৭৫, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৪৫) কাশিকা বৃত্তির আলোচনায় পৌণ্ড্রদের একটি স্বতন্ত্র জাতিগত অবস্থান দান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় যোগ করার সময় জনপদবাচক শব্দগুলোর অর্থ কেবল ভৌগোলিক সীমায় আটকে থাকে না, বরং তা সেখানে বসবাসকারী মানুষদের গুণাবলীকেও ধারণ করে। পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে এই গুণাবলী হলো তাদের শৌর্য এবং বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা তাদের অন্যান্য আর্য জনপদ থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

অন্যদিকে, **কাতন্ত্র ব্যাকরণ (Katantra Vyakarana),** যা তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য ব্যাকরণ হিসেবে পরিচিত, সেখানেও 'পৌণ্ড্র' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। **সর্ববর্মা** রচিত এই ব্যাকরণে শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পৌণ্ড্রকে একটি স্থিতিশীল বিশেষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা তার প্রাচীনত্ব ও স্থায়িত্বকে প্রমাণ করে। (সর্ববর্মা, কাতন্ত্র ব্যাকরণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকাল ১৯৮৮, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮০)। কাতন্ত্র ব্যাকরণের নিয়মাবলী অনুসারে, শব্দের আদি রূপ ও পরিবর্তিত রূপের মধ্যে যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়, পৌণ্ড্র শব্দটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ব্যাকরণটি মূলত ছাত্রদের জন্য রচিত হয়েছিল, এবং সেখানে পৌণ্ড্র শব্দের ব্যবহার নির্দেশ করে যে তৎকালীন সময়ে এই শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত এবং সম্মানজনক ছিল।

সংস্কৃত কোষগ্রন্থ বা অভিধানসমূহ শব্দের অর্থের খনি। পৌণ্ড্র শব্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এটি দেশ, জাতি, উদ্ভিদ এবং শঙ্খ—এই চারটি প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মেদিনীকার (Medinikara) তাঁর বিখ্যাত 'মেদিনী কোষ' (Medini Kosha) গ্রন্থে পৌণ্ড্র শব্দটিকে নানার্থবর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে পৌণ্ড্র বলতে কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝানো হয়নি, বরং একে 'ইক্ষু' বা আখ এবং 'শুভ্র বর্ণ' এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। মেদিনী কোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌণ্ড্রক হলো সেই বিশেষ জাতের আখ যা অত্যন্ত মিষ্ট এবং যার রস থেকে উৎকৃষ্ট মানের চিনি বা শর্করা উৎপন্ন হয়। (মেদিনীকার, মেদিনী কোষ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, প্রকাশকাল ১৯৬৭) পৌণ্ড্রক আখের এই

বর্ণনাটি প্রাচীন ভারতের কৃষি সমৃদ্ধির একটি ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পৌণ্ড্র অঞ্চলটি কেবল বীর যোদ্ধাদের জন্যই নয়, বরং উন্নত কৃষি প্রযুক্তির জন্যও বিখ্যাত ছিল। মেদিনী কোষের এই তথ্যটি পৌণ্ড্রদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের জাতীয় গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

রাজা রাধাকান্ত দেব সংকলিত **'শব্দকল্পদ্রুম'** (Shabdakalpadruma) একটি বিশ্বকোষীয় অভিধান। এতে বিভিন্ন পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পৌণ্ড্র শব্দের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। **শব্দকল্পদ্রুমে পৌণ্ড্রকে 'বলিনাং বরঃ' বা বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।** এখানে পৌণ্ড্র ও পুণ্ড্রকে সমার্থক হিসেবে ধরা হলেও, পৌণ্ড্র শব্দটির মধ্যে একটি রাজকীয় আভিজাত্য আরোপ করা হয়েছে। (রাজা রাধাকান্ত দেব, শব্দকল্পদ্রুম, ২য় খণ্ড, বরদা পাবলিশিং হাউস, প্রকাশকাল ১৯৮৭, পৃষ্ঠা নম্বর ৪২০)

শব্দকল্পদ্রুমের সংকলনে পৌণ্ড্রদের উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিবাচক আখ্যানগুলো স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌণ্ড্ররা প্রাচীন রাজর্ষি বলির বংশধর এবং তারা পূর্ব ভারতের একটি বিশাল অঞ্চল শাসন করত। এই আভিজাত্য কেবল ক্ষমতার নয়, বরং চারিত্রিক দৃঢ়তারও প্রতীক।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রণীত **'বাচস্পত্য অভিধান'** (Vachaspatya) গ্রন্থে এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বাচস্পত্য অনুসারে, **'পুন্ড' ধাতুর সাথে 'র' এবং পরবর্তীতে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে পৌণ্ড্র শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, যার অর্থ যা পবিত্র করে বা যা দীপ্তি প্রদান করে।** (তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাচস্পত্য অভিধান, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, প্রকাশকাল ১৯৬২, পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৬৩)

বাচস্পত্য অভিধানে পৌণ্ড্র শব্দটিকে 'পুণ্ড্র' বা শ্বেত পদ্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক একটি দিক, কারণ **শ্বেত পদ্ম জ্ঞান ও পবিত্রতার প্রতীক।** পৌণ্ড্র জাতির এই আধ্যাত্মিক সংযোগ তাদের সমাজতাত্ত্বিক অবস্থানকে আরও উন্নত করে তোলে।

জৈন পন্ডিত হেমচন্দ্র তাঁর 'অভিধান চিন্তামণি' (Abhidhana Chintamani) গ্রন্থে পৌণ্ড্রকে আর্যাবর্তের সংলগ্ন একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি একে 'বঙ্গ' এবং 'পুণ্ড্র' এর সাথে সমান্তরালভাবে স্থাপন করেছেন, যা পূর্ব

ভারতের রাজনৈতিক সংহতির প্রতীক। (হেমচন্দ্র, অভিধান চিন্তামণি, নির্ণয় সাগর প্রেস, প্রকাশকাল ১৯৪৬, পৃষ্ঠা নম্বর ১২৪) হেমচন্দ্রের বর্ণনায় পৌণ্ড্র শব্দটি আভিজাত্য ও বীরত্বের সমার্থক। তিনি একে 'হরিলিপি' বা 'হরিকেল' এর সাথেও সম্পর্কিত করেছেন, যা এই অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করে। হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীবিন্যাস প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্ররা মধ্যযুগের প্রারম্ভিক কালেও তাদের নিজস্ব সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

পুরুষোত্তম দেব রচিত 'ত্রিকাণ্ডশেষ' (Trikandasesha) গ্রন্থেও পৌণ্ড্র শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় অমরকোষের পরিপূরক হিসেবে। এখানে পৌণ্ড্রকে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জন্য পরিচিত ছিল। (পুরুষোত্তম দেব, ত্রিকাণ্ডশেষ, বারাণসী, প্রকাশকাল ১৯১৬, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৫) ত্রিকাণ্ডশেষের গুরুত্ব এই যে, এটি অমরকোষের বাদ পড়া শব্দগুলোকে স্থান দিয়েছে। পৌণ্ড্র শব্দের অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে এই শব্দের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম ছিল। **এটি কেবল একটি জাতির নাম নয়, বরং একটি উচ্চমানের জীবনধারার পরিচায়ক।**

পুরুষোত্তম দেবের 'হারাবলী' (Haravali) এবং অমরসিংহের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের নানার্থ সংগ্রহকারদের গ্রন্থে পৌণ্ড্র শব্দের কিছু বিরল অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। **হারাবলীতে পৌণ্ড্র শব্দটিকে 'তিলক' বা কপালে ধারণ করা ধর্মীয় চিহ্নের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি আধ্যাত্মিকতার একটি গভীরতর স্তরকে নির্দেশ করে। 'ঊর্ধ্বপুণ্ড্র' বা 'ত্রিপুণ্ড্র' ধারণের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ঘটে, তার সাথে পৌণ্ড্র শব্দের একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রয়েছে।** (পুরুষোত্তম দেব, হারাবলী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশকাল ১৯২৮, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৬)

'নানার্থরত্নমালা' (Nanartharatnamala) গ্রন্থে পৌণ্ড্রকে 'পাণ্ডু' বা ফ্যাকাশে সাদা রঙের সমার্থক হিসেবে ধরা হয়েছে, যা আভিজাত্য ও নির্মলতার প্রতীক। এই নির্মলতা কেবল বর্ণের নয়, বরং চরিত্রের শুদ্ধতাকেও নির্দেশ করে। নানার্থরত্নমালায় পৌণ্ড্রকে একটি বিশেষ প্রকারের রত্ন বা মূল্যবান ধাতুর দীপ্তির সাথেও তুলনা করা হয়েছে, যা এর ইতিবাচক দিকটিকে আরও প্রোজ্জ্বল করে। (ইরুগপা দণ্ডাধিনাথ, নানার্থরত্নমালা, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল ১৯৫৪, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৭)

পৌণ্ড্র শব্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিবাচক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় মহাভারতের রণক্ষেত্রে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে পাণ্ডব পক্ষের বীরত্বের বর্ণনায় ভীমসেনের শঙ্খের নাম হিসেবে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

"পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ" (গীতা ১.১৫)

এখানে পৌণ্ড্র শঙ্খটি কেবল একটি বাদ্যযন্ত্র নয়, বরং এটি ভীমের অজেয় শক্তি ও অশুভ শক্তির বিনাশের প্রতীক। এই শঙ্খের ধ্বনি কুরুপক্ষের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করেছিল। **অভিধানসমূহে এই 'পৌণ্ড্র' শব্দটিকে 'মহাশঙ্খ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা এর বিশালত্ব ও পবিত্রতাকে সূচিত করে।** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন টীকায়, বিশেষত শঙ্করভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্যে পৌণ্ড্র শঙ্খের এই ইতিবাচক ও তেজস্বী রূপটি ফুটে উঠেছে। (বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর, পৃষ্ঠা নম্বর ২৫)

ভীমের এই শঙ্খটির নাম পৌণ্ড্র হওয়ার পেছনে একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। **পৌণ্ড্র শব্দের একটি অর্থ যেহেতু 'পবিত্রকারী'**, তাই যুদ্ধের শুরুতে এই শঙ্খধ্বনি রণক্ষেত্রকে পবিত্র করে এবং ন্যায়ের জয়কে নিশ্চিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্র শব্দটি উচ্চতর শৌর্য এবং দৈব শক্তির আধার।**

কোষগ্রন্থসমূহে পৌণ্ড্রক শব্দের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 'ইক্ষু' বা আখের বর্ণনা। সুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতায় ঔষধী গুণের বিচারে পৌণ্ড্রক আখের স্থান সবার উপরে। অমরকোষের টীকায় এবং শব্দকল্পদ্রুমে একে 'পাণ্ডুবর্ণ' বা ঈষৎ সাদাটে রঙের আখ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মেদিনী কোষ এবং রত্নমালা অনুসারে, পৌণ্ড্রক আখ থেকে উৎপাদিত চিনি ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই পৌণ্ড্রক আখই সম্ভবত আজকের উচ্চফলনশীল আখের আদি রূপ। এটি প্রমাণ করে যে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদটি কৃষিকার্যে কতটা উন্নত ছিল এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য সমগ্র ভারতে সমাদৃত হতো। (সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, পৃষ্ঠা নম্বর ৪১০)

পৌণ্ড্রক আখের বাণিজ্যিক গুরুত্ব তৎকালীন ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল। এই আখ থেকে উৎপন্ন 'ফাণিত', 'গুড়' এবং 'শর্করা' বিদেশেও রপ্তানি করা হতো বলে ধারণা করা হয়। অভিধানসমূহে এই আখের জন্য আলাদা একটি সংজ্ঞায়ন নির্দেশ করে যে, পৌণ্ড্র জনপদটি একটি 'এগ্রো-

ইন্ডাস্ট্রিয়াল' বা কৃষি-শিল্পভিত্তিক সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

প্রাচীন সাহিত্যে পৌণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রদেশ বলতে বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও তার সংলগ্ন অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে পৌণ্ড্রকে রাজর্ষি বলির পুত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার নামানুসারে এই রাজ্যের নামকরণ হয়। এটি একটি রাজবংশীয় গৌরবের পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক লিপিমালায়, বিশেষত গুপ্ত সম্রাটদের তাম্রশাসনে এবং পরবর্তীতে সেন রাজবংশের লিপিতে 'পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ভুক্তিটি ছিল প্রাচীন বাংলার বৃহত্তম প্রশাসনিক একক। এটি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (সেন, বিনয়চন্দ্র, সাম হিস্টোরিক্যাল আসপেক্টস অফ দি ইনস্ক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৭)

অভিধান চিন্তামণিতে হেমচন্দ্র একে আর্য সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখিয়াছেন, যা এই অঞ্চলের মানুষের উচ্চ সাংস্কৃতিক মানকে তুলে ধরে। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মদনপালের মনহলি পট্টোলীতে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'পৌণ্ড্রবর্ধন' হিসেবে স্থায়ী রূপ লাভ করে, যা এর দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে।

আধ্যাত্মিক সাহিত্যে 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে যা **কপালে তিলক ধারণের সাথে যুক্ত।** পরমগুরুদের মতে, **কপালে ধারণ করা এই চিহ্নটি 'পুণ্ডরীক' বা পদ্মফুল থেকে উদ্ভূত। এটি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ এবং চিত্তের পবিত্রতার প্রতীক।**

বৈষ্ণব ঐতিহ্যে 'ঊর্ধ্বপুণ্ড্র' এবং শৈব ঐতিহ্যে 'ত্রিপুণ্ড্র' বা ভস্মের তিলক ধারণ করা হয়। অভিধানসমূহে এই চিহ্নটিকে 'পৌণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্রক' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে, পৌণ্ড্র শব্দটি কেবল বাহ্যিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথেও যুক্ত। (পরমহংস যতি, আধ্যাত্মিক কোষ, আধ্যাত্মিক প্রকাশন, পৃষ্ঠা নম্বর ৭৬৫)

প্রাচীন অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহ পৌণ্ড্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে তাদের একদা ক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা কেবল উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে সাময়িকভাবে ব্রাত্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের

অন্তর্নিহিত ক্ষত্রিয় তেজ কখনোই বিলুপ্ত হয়নি।

ব্যাকরণবিদরা যখন 'পৌণ্ড্র' শব্দটিকে শুদ্ধ রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তারা মূলত এই জাতির ঐতিহাসিক গৌরবকেই স্বীকৃতি দেন। 'পৌণ্ড্রক' শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, তারা একটি সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা ও উন্নত পেশাদারিত্বের (যেমন চিনি উৎপাদন) অধিকারী ছিল। এই ইতিবাচক মূল্যায়ন আমাদের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় নতুন দিশা দেখায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় পুরাণেই 'পৌণ্ড্র' নামক একজন সর্পরাজ বা নাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সংকর সংস্কৃতে (Buddhist Hybrid Sanskrit) একে একটি পবিত্র সত্তা হিসেবে ধরা হয়েছে। মেঘদূত এবং অন্যান্য কাব্যেও এই রহস্যময় পৌণ্ড্র নাগের উল্লেখ পাওয়া যায় যা প্রকৃতির শক্তির প্রতীক। এটি প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্র শব্দটি কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত জগতের শক্তির সাথেও যুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, অভিধান ও ব্যাকরণ সাহিত্যে 'পৌণ্ড্র' শব্দটি কেবল একটি নাম নয়, এটি একটি বহুমুখী ইতিবাচক অভিধা। ব্যাকরণিক বিচারে এটি যেমন শুদ্ধতা ও আভিজাত্যের প্রতীক, অভিধানের পাতায় তেমনি এটি কৃষি সমৃদ্ধি (আখ), সামরিক বীরত্ব (ভীমের শঙ্খ) এবং সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের (জনপদ) ধারক। মেদিনী কোষ থেকে শুরু করে শব্দকল্পদ্রুম পর্যন্ত প্রতিটি আকর গ্রন্থ পৌণ্ড্র শব্দটিকে একটি উন্নত সভ্যতার সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

পৌণ্ড্রদের এই ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় আজও আমাদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সন্ধান দেয়। প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় অধ্যায়কে জীবন্ত করে রাখার পেছনে এই শব্দটির অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক গবেষণায় পৌণ্ড্রদের অবদান এবং তাদের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি যত বেশি আলোচিত হবে, ততই আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সমৃদ্ধিকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব। পৌণ্ড্র শব্দটি একটি ভৌগোলিক সীমারেখা ছাপিয়ে একটি বৃহত্তর ভারতীয় চেতনার অংশ হয়ে উঠেছে। এটি বীরত্ব, পবিত্রতা এবং সমৃদ্ধির এক চিরন্তন প্রতীক।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসচর্চায় পৌণ্ড্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রসঙ্গ

- শ্রী উদ্ভব করণ

ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (৪ ডিসেম্বর ১৮৮৮ – ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০) এক যুগস্রষ্টা ও প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিক। আচার্য যদুনাথ সরকার যেমন মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার তেমনি প্রাচীন ভারত ও বাংলার ইতিহাসকে ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা এবং নিছক কল্পনাশ্রয়ী জনশ্রুতির কবল থেকে মুক্ত করে প্রত্নতাত্ত্বিক, লিপিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রমাণের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেখানে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে উপাচার্য (১৯৩৭–১৯৪২) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বাংলার প্রাচীন ইতিহাস পুনর্নির্মাণের যে মহাযজ্ঞ শুরু করেন, তার শ্রেষ্ঠ ফসল ছিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত **The History of Bengal, Vol. I (Hindu Period)**। পরবর্তীকালে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর **বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)** এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত **History of Ancient Bengal** গ্রন্থগুলিতে এই গবেষণা আরও পূর্ণতা লাভ করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই সুদীর্ঘ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চায় বাংলার অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্রনির্মাতা ও সমরকুশলী জাতিগোষ্ঠী **‘পুণ্ড্র’** বা **‘পৌণ্ড্র’** (আধুনিক কালে যাঁরা **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়** নামে সুপরিচিত)-দের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময় ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকরা যেখানে বাংলার ভূমিপুত্রদের সামাজিক মর্যাদাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছিলেন, সেখানে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র, মহাকাব্য, তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা কেবল বাংলার আদি সভ্যতারই নির্মাতা ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক অপরাজেয় ক্ষত্রিয় রাজশক্তি ও উন্নত সংস্কৃতির ধারক।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর The History of Bengal (১৯৪৩) এবং History of Ancient Bengal (১৯৭১) গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন বাংলায় কোনো একক অখণ্ড নাম ছিল না; বরং বঙ্গ, পুণ্ড্র (বা পৌণ্ড্র), সুহ্ম, রাঢ়, সমতট ও হরিকেল—এই কৌম বা জনপদগুলির সমন্বয়েই বাংলার সত্তা গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে ‘পুণ্ড্র’ বা ‘পৌণ্ড্র’ ছিল প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জনপদগুলির অন্যতম।

বৈদিক সাহিত্যে স্বীকৃতি: রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে, বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে সপ্তম শতাব্দী)-এ সর্বপ্রথম পুণ্ড্র জাতির ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণেও (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) প্রাচ্য দেশের এক সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। রমেশচন্দ্রের মতে, উত্তর ভারতের আর্যরা যখন পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন গণ্ডকী ও গঙ্গা নদীর প্রবাহ পেরিয়ে বাংলায় তারা যে সুসংগঠিত ও স্বাধীন সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জাতি। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ পৌণ্ড্ররা ছিল ক্ষত্রিয় এবং আর্য। তাই আর্য সম্প্রসারণ পূর্ব দিকে এই তত্ত্বই ভুল। আর্যরা ভারতীয় এবং তারা পূর্ব ভারতেও ছিল। পূর্ব ভারতে তাদের নাম ছিল পৌণ্ড্র।

মহাভারত ও পুরাণে রাজবংশীয় মর্যাদা: মহাভারত, হরিবংশ ও মৎস্য পুরাণের সূত্র উদ্ধৃত করে রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে, চন্দ্র বংশীয় রাজা বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং মহর্ষি দীর্ঘতমাসের আশীর্বাদে জন্ম নেওয়া পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম—পূর্ব ভারতের পাঁচটি পরাক্রমশালী রাজ্যের পত্তন করেন (বলেয়া ক্ষত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ)। মহাভারতে এই পৌণ্ড্র রাজবংশকে স্পষ্টভাবে **'বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়'** এবং সমরবিদ্যায় পারদর্শী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সূত্রে পৌণ্ড্ররা আর্য ক্ষত্রিয়।

কৃষি ও বাণিজ্যের অগ্রদূত: রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ভাষাতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে, 'পুণ্ড্র' শব্দটির একটি অর্থ হলো উন্নত প্রজাতির ইক্ষু বা আখ (পুণ্ড্র-ইক্ষু)। নদীমাতৃক বাংলার মিষ্টি জলের অববাহিকায় ইক্ষু চাষ, গুড় উৎপাদন, রেশম বয়ন এবং জলপথে নৌ-বাণিজ্যের প্রসারে প্রাচীন পৌণ্ড্রদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসচর্চায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামরিক শৌর্য ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে উজ্জ্বল বিশ্লেষণটি পাওয়া যায় মহাভারতের সভাপর্ব ও হরিবংশে বর্ণিত পৌণ্ড্ররাজ **'পৌণ্ড্রক বাসুদেব'**-এর প্রসঙ্গে। সনাতন পৌরাণিক আখ্যানে পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে কেবল দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, রমেশচন্দ্র মজুমদার একজন আধুনিক ঐতিহাসিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এর পেছনের রাজনৈতিক সত্যটি আবিষ্কার করেছেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত The History of Bengal এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত History of Ancient Bengal গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার পৌণ্ড্রক বাসুদেব সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন:

"In many respects Paundraka-Vasudeva was a remarkable figure, and may be looked upon as the epic precursor of the Gauda conquerors of the seventh and eighth centuries."

(অনুবাদ: "বহু দিক থেকেই পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন এক অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, এবং তাঁকে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর গৌড়ের দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের মহাকাব্যিক অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা যায়।")

রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই মূল্যায়নের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম:

সর্বভারতীয় শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ: পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিজেকে কেবল পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কিরাত দেশের অধিপতি হিসেবেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি মগধের পরাক্রমশালী সম্রাট জরাসন্ধের সঙ্গে সামরিক মিত্রতা স্থাপন করে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের যাদব-পাণ্ডব আধিপত্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর: সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক এবং অষ্টম শতাব্দীতে পাল সম্রাট ধর্মপাল যেভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বাংলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রমেশচন্দ্রের মতে তার বীজ বপন করেছিলেন মহাকাব্যিক যুগের এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রাচীন রাজকীয় ও সামরিক ঐতিহ্যের এক অকাট্য ঐতিহাসিক স্বীকৃতি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার কেবল সাহিত্যিক উৎসের ওপর নির্ভর করেননি; তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে পৌণ্ড্র সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও বিস্তারকে সুনির্দিষ্ট কালানুক্রমে স্থাপন করেছেন।

মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপি (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী): ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টনের প্রাথমিক জরিপ এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম কর্তৃক বগুড়ার মহাস্থানগড়কে প্রাচীন ‘পুণ্ড্রনগর’ হিসেবে শনাক্তকরণের পর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় মৌর্য যুগের (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) **মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপি**। রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে, করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত এই ‘পুণ্ড্রনগর’ ছিল সমগ্র পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও সুপরিকল্পিত মহানগরী, যেখানে দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজকীয় শস্যভাণ্ডার ও মুদ্রা তহবিলের সুব্যবস্থা ছিল।

পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির বিশাল ভৌগোলিক বিস্তার: গুপ্ত শাসনামল (খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী) থেকে শুরু করে পাল ও সেন যুগ (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) পর্যন্ত **‘পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি’ (প্রশাসনিক প্রদেশ)** বাংলার বৃহত্তম ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রশাসনিক এককে পরিণত হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাম্রশাসনগুলির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পরবর্তীকালে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমানা কেবল উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না; পূর্বে শ্রীহট্ট (যেমন দশম শতাব্দীর রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন) থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জের নদীবিধৌত বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

হিউয়েন সাং-এর বিবরণ (৬৩৮–৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ): রমেশচন্দ্র মজুমদার চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (যাঁর বিবরণী তিনি সযত্নে ব্যবহার করেছেন)-এর সূত্রে দেখিয়েছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল জ্ঞানচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় সহনশীলতার কেন্দ্রভূমি, যেখানে ২০টি বৌদ্ধ বিহারে ৩,০০০-এরও বেশি ভিক্ষু, ১০০টি দেবমন্দির এবং অসংখ্য জৈন শ্রমণ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতেন।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বর্ণগত অবস্থান নিয়ে যে বিতর্ক ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি হয়েছিল, রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রাচীন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তার এক অত্যন্ত যৌক্তিক ও ইতিবাচক সমাধান প্রদান করে। তাঁর সম্পাদিত *The History and Culture of the Indian People* সিরিজের প্রথম খণ্ড *The Vedic Age* (১৯৫১) এবং *History of Ancient Bengal* (১৯৭১)-এর একাদশ অধ্যায়ে ('Society') তিনি বাংলায় আর্যীকরণ ও বর্ণব্যবস্থার বিবর্তন আলোচনা করেছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রাচীন ভারতের সমাজ-ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, মনুস্মৃতির দশম অধ্যায়ের ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক শ্লোকে (মনুস্মৃতি ১০.৪৩–৪৪) স্পষ্টভাবে পৌণ্ড্রকদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।। পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ..."

একইভাবে মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও (১৩.৩৫.১৭–১৮) মেকল, দ্রাবিড়, লাট ও **পৌণ্ড্র**-দের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাঁরা আদিতে ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত (ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ) ছিলেন। মনুস্মৃতিতে কেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের 'ক্রিয়ালোপ' ও 'ব্রাহ্মণাদর্শন'-এর কারণে 'বৃষলত্ব' (বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়) প্রাপ্ত হয়েছে বলা হলো? রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসতত্ত্ব অনুযায়ী এর পেছনে রয়েছে প্রাচীন বাংলার স্বাধীনচেতা সাংস্কৃতিক মানসিকতা:

বৈদিক যাগযজ্ঞের গোঁড়ামি বর্জন: উত্তর ভারতের আর্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যখন কঠোর কর্মকাণ্ড ও পুরোহিততন্ত্রের নিগড়ে সমাজকে বাঁধতে চেয়েছিল, তখন পুণ্ড্র ও বঙ্গের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ এবং জনগণ তাদের নিজস্ব স্বাধীন জীবনধারা এবং উদার ধর্মীয় দর্শন (যেমন জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের প্রচারিত জৈনধর্ম এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম) সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য: যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র অনুশাসন মেনে নেননি (ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ), তাই রক্ষণশীল স্মৃতিশাস্ত্রকাররা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের 'ব্রাত্য' বা

সংস্কারচ্যুত ক্ষত্রিয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে, এই শাস্ত্রীয় শ্লোকগুলিই উল্টো প্রমাণ করে যে, **পৌণ্ড্ররা কখনোই আদিম বা অনগ্রসর শূদ্র ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন স্বীকৃত ক্ষত্রিয়, যাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে নতিস্বীকার করেননি।**

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of Ancient Bengal* (১৯৭১) গ্রন্থের সামাজিক ইতিহাসের অধ্যায়ে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় রচিত উপপুরাণ—বিশেষত **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ** ও **ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ**-এর বর্ণবিন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন।

সেন যুগের রক্ষণশীলতা ও বৌদ্ধ-পরবর্তী সমাজ: পাল বংশের দীর্ঘ চারশো বছরের উদার শাসনের অবসানের পর একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজাদের (বিশেষত বল্লালসেন, ১১৫৮–১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ ও লক্ষ্মণসেন) আমলে বাংলায় পুনরায় কট্টর স্মার্ত অনুশাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্ষত্রিয় জাতির অবনমন প্রচেষ্টা: রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে, সেন ও প্রাক-সুলতানি যুগের স্মৃতিকাররা বাংলায় 'ব্রাহ্মণ' ও 'শূদ্র' (উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অন্ত্যজ) ব্যতীত মধ্যবর্তী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার প্রবণতা দেখান। যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা প্রাচীনকাল থেকে রাজ্যশাসন, প্রতিরক্ষা ও কৃষিকার্যের মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতিকে সচল রেখেছিলেন এবং যাঁদের একটি বড় অংশ নদীর প্রবাহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ও লবণাক্ত জলের বদ্বীপ অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের কেবল রক্ষণশীল সামাজিক রাজনীতির কারণে প্রান্তিক কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী স্তরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

রমেশচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ সংশোধন: রমেশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্ট করেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ*-এর এই সংকীর্ণ তালিকা কেবল তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন; এর দ্বারা প্রাচীন বাংলার পৌণ্ড্র জাতির হাজার বছরের ক্ষত্রিয় শৌর্য ও রাষ্ট্রনির্মাতা সত্তাকে মুছে ফেলা যায় না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (বিশেষত ১৯০১ থেকে ১৯৩১ সালের আদমশুমারি পর্ব এবং পরবর্তী দশকগুলিতে) মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬–১৯২৮), রাইচরণ সরদার, ভুবনমোহন দাস এবং ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ মনীষীদের নেতৃত্বে বাংলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে ঐতিহাসিক আত্মমর্যাদা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে

বর্তমান পৌণ্ড্র সমাজের রক্ত ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র প্রমাণ করা। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ করণের *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ* এবং *A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods* (১৯১৯) গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক দাবি জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছিল। ঠিক এই কালপর্বেই ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের The History of Bengal এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা দেশের ইতিহাস প্রকাশিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই ঐতিহাসিক দাবি সর্বোচ্চ একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রামাণ্য দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন যে, **'পুণ্ড্র' ও 'পৌণ্ড্র' কোনো কাল্পনিক নাম নয়; এটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুসভ্য জাতিগোষ্ঠীর নাম।** তিনি দেখান যে, ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃত ছিল এবং তাঁদের সম্রাট পৌণ্ড্রক বাসুদেব ছিলেন বাংলার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আদি প্রতীক।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের তফসিলি জাতি তালিকায় অবমাননাকর শব্দের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পৌণ্ড্র' (Paundra) নামটি স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনে যে সুদৃঢ় ঐতিহাসিক বাতাবরণ কাজ করেছিল, তা নির্মাণে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো জাতীয় স্তরের শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণা এক বিশাল বৌদ্ধিক শক্তির জোগান দিয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসচর্চা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মপরিচয় ও ঐতিহাসিক মর্যাদার প্রশ্নে এক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। তিনি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্তাবকতা করেননি, বরং একজন নির্মোহ ও সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর মতো প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্যের ব্যবচ্ছেদ করেছেন। আর সেই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে এসেছে পৌণ্ড্র জাতির প্রকৃত গৌরবগাথা। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমাণ করেছেন যে, **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বাংলার ইতিহাসে কোনো বহিরাগত বা পরগাছা জনগোষ্ঠী নন; তাঁরা এই ভূখণ্ডের আদি রাষ্ট্রনির্মাতা, যাঁদের হাতে গড়া পুণ্ড্রনগর ও পুণ্ড্রবর্ধন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পূর্ব ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে।** মধ্যযুগের সামাজিক অস্থিরতা ও রক্ষণশীল অনুশাসনের ফলে তাঁরা সাময়িকভাবে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হলেও, রমেশচন্দ্র মজুমদারের কালজয়ী ইতিহাসচর্চা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সেই হৃত ক্ষত্রিয় গৌরব ও ঐতিহাসিক সত্যকে বিশ্ব-একাডেমিক অঙ্গনে চিরস্থায়ী মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Chanda, Ramaprasad. Gaudarajamala. Varendra Research Society, 1912.

২. Dutt, Nripendra Kumar. Origin and Growth of Caste in India. Vol. 1, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968.

৩. Karan, Mahendranath. A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods: Their Status, Ways of Life and Social Manners and Customs. Diamond Harbour, 1919.

৪. Karan, Mahendranath. Paundra Kshatriya Kulapradeep. Paundra Kshatriya Samiti, 1926.

৫. Majumdar, Ramesh Chandra. Bangla Desher Itihas: Prachin Jug. General Printers and Publishers, 1945.

৬. Majumdar, Ramesh Chandra. The Early History of Bengal. University of Dacca, 1925.

৭. Majumdar, Ramesh Chandra. History of Ancient Bengal. G. Bharadwaj & Co., 1971.

৮. Majumdar, Ramesh Chandra. editor. The History and Culture of the Indian People, Vol. 1: The Vedic Age. Bharatiya Vidya Bhavan, 1951.

৯. Majumdar, Ramesh Chandra. editor. The History of Bengal, Vol. 1: Hindu Period. University of Dacca, 1943.

১০. Ray, Niharranjan. Bangalir Itihas: Adiparba. Book Emporium, 1949.

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়।।



বিশেষ প্রবন্ধ

ফ্যাসিবাদ ও মার্ক্সবাদ ভাই ভাই, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সতর্ক থাকা চাই

- শ্রী রতন বিশ্বাস

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান ও আধুনিক ইতিহাসচর্চায় এই দুই ব্যবস্থার ব্যবহারিক শাসনপদ্ধতির মধ্যকার বিস্ময়কর মিল গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হান্নাহ আরেন্ট (Hannah Arendt) তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *The Origins of Totalitarianism* (১৯৫১) এবং কার্ল ফ্রিডরিশ ও জেবিগনিউ ব্রেজেজিনস্কি (Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski) তাঁদের গবেষণামূলক আকরগ্রন্থ *Totalitarian Dictatorship and Autocracy* (১৯৫৬)-তে দেখিয়েছেন যে, চরম বামপন্থা (স্তালিনীয় কমিউনিজম) এবং চরম ডানপন্থা (ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান জাতীয় সমাজতন্ত্র বা নাৎসিবাদ) যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাদের প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ, দমননীতি ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো প্রায় অভিন্ন 'সর্বগ্রাসী' (Totalitarian) রূপ ধারণ করে। পরবর্তীকালে ফরাসি দার্শনিক জঁ-পিয়ের ফে (Jean-Pierre Faye, ২০০২) তাঁর 'হর্সশু থিওরি' (Horseshoe Theory বা অশ্বক্ষুরাকৃতি তত্ত্ব)-তে উল্লেখ করেন যে, চরম বাম ও চরম ডান দুটি বিপরীত সরলরেখায় চলে না; বরং একটি ঘোড়ার

খুরের দুই প্রান্তের মতো এগিয়ে এসে প্রায় একই বিন্দুতে মিলিত হয়।

ফ্যাসিবাদ ও মার্ক্সীয় শাসনব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান সাধারণ ভিত্তি হলো পশ্চিমা ধাঁচের বহুদলীয় উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy), নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিপন্থার প্রতি চরম ঘৃণা।

উদারতাবাদের অবসান: ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর (তৎকালীন রুশ জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে ২৫ অক্টোবর) বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর ভ্লাদিমির লেনিন বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থাকে সর্বহারা শ্রেণির শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮–১৯ জানুয়ারি রাশিয়ার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংবিধান সভা (Constituent Assembly)-কে বলশেভিকরা মাত্র একদিনের অধিবেশনের পর বলপ্রয়োগে ভেঙে দেয়। লেনিনের মতে, **"সর্বহারার একনায়কত্ব এমন এক ক্ষমতা যা কোনো আইন বা বিধিনিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত নয়, যা সরাসরি বলপ্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"**

ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্রপূজা: অন্যদিকে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮–২৯ অক্টোবর বেনিতো মুসোলিনির 'মার্চ অন রোম' (March on Rome)-এর মাধ্যমে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের পর একই প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি ও জিওভান্নি জেন্তিলে (Giovanni Gentile) রচিত *The Doctrine of Fascism*-এ সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়: *"Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato"* (সবকিছু রাষ্ট্রের ভেতরে, রাষ্ট্রের বাইরে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছুই থাকতে পারে না)। ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিমানুষকে রাষ্ট্রের কাছে সম্পূর্ণ বলিদান করার আহ্বান জানায়।

উভয় ব্যবস্থাই ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে 'পশ্চিমা ক্ষয়িষ্ণুতা' বা 'বিপ্লব/জাতির স্বার্থবিরোধী বিচ্যুতি' হিসেবে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার একক বিকাশ ঘটিয়েছে।

উভয় মতাদর্শের রাষ্ট্রেই সরকার এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল কার্যত সমার্থক হয়ে ওঠে। অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে রাষ্ট্রদ্রোহের সমতুল্য মনে করে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়।

একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আইনি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এবং ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এক সুস্পষ্ট কাঠামোগত সাযুজ্য দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ১০ম কংগ্রেসে ঐতিহাসিক 'অন পার্টি ইউনিটি' (On Party Unity) প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরে যেকোনো উপদলীয় তৎপরতা ও বিরুদ্ধমত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়; পরবর্তীতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের সোভিয়েত

সংবিধানের ১২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে কমিউনিস্ট পার্টিকে রাষ্ট্র ও সমাজের একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক সত্তা ও সর্বময় 'চালিকাশক্তি' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সমরূপভাবে, ইতালিতে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে কার্যকর হওয়া 'লেজ্জি ফাসিস্তিজিমে' (Leggi Fascistissime) আইনের মাধ্যমে ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি (PNF) ব্যতীত অন্য সব বিরোধী রাজনৈতিক দলকে আইনবহির্ভূত ঘোষণা করে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটানো হয়। জার্মানিতেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় এডলফ হিটলারের ক্ষমতা সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই প্রণীত হয় Gesetz gegen die Neubildung von Parteien (নতুন রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধকরণ আইন), যার মাধ্যমে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিকে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে একদলীয় সর্বগ্রাসী শাসনের পথ নিশ্চিত করা হয়।

প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র ও দলীয় কাঠামোর একীভূতকরণের ক্ষেত্রে উভয় শাসনব্যবস্থাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ দলীয়করণের ছাঁচে ফেলে পরিচালনা করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সমান্তরালে পার্টির নিজস্ব কর্তৃত্বকারী পরিকাঠামো কার্যকর ছিল, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোই কার্যত রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীপরিষদ বা সভনারকমের (Sovnarkom) নীতিনির্ধারণ, নিয়োগ ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। একইভাবে নাৎসি জার্মানিতে 'গ্লাইশশালতুং' (Gleichschaltung বা সার্বিক সমন্বয় সাধন)-এর সর্বগ্রাসী নীতি প্রয়োগ করে প্রচলিত সরকারি আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং পুলিশ বাহিনীকে স্বায়ত্তশাসনহীন করে সরাসরি ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট দলের আদর্শিক আজ্ঞাবহ ও সমান্তরাল শাখায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

উভয় ব্যবস্থাতেই দলীয় সদস্যপদ ছাড়া রাষ্ট্রের কোনো উচ্চপদে প্রবেশ অসম্ভব ছিল এবং সমাজের সর্বস্তরে দলের গুপ্ত সেল তৈরি করে সার্বক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করা হতো।

ক্ষমতার একক কেন্দ্রীকরণের জন্য উভয় মতাদর্শই এক সর্বশক্তিমান, অভ্রান্ত ও দেবতুল্য নেতার কাল্ট বা স্তুতিবাদ (Cult of Personality) নির্মাণ করেছিল।

ফ্যাসিবাদী নেতৃত্বতত্ত্ব: জার্মানিতে এই তত্ত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে 'ফুহরারপ্রিন্সিপ' (Führerprinzip বা নেতার নীতি) নামে। এর মূল কথা ছিল—নেতার বাক্যই আইন; কোনো লিখিত সংবিধান বা নীতি নেতার ইচ্ছার ঊর্ধ্বে নয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট রাইখ প্রেসিডেন্ট পল ফন হিন্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর হিটলার রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের পদকে একীভূত করে নিজেকে 'ফুহরার ও রাইখ চ্যান্সেলর' ঘোষণা

করেন এবং সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীকে জার্মানির বদলে সরাসরি হিটলারের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য করেন। ইতালিতে মুসোলিনিকে অলৌকিক প্রতিভাধর হিসেবে তুলে ধরে স্লোগান তৈরি করা হয়েছিল: *"Mussolini ha sempre ragione"* (মুসোলিনি সর্বদা সঠিক)।

কমিউনিস্ট নেতৃত্বের রূপান্তর: মার্ক্সবাদ তাত্ত্বিকভাবে যৌথ নেতৃত্বের ওপর জোর দিলেও বাস্তবে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনের নেতৃত্বে ব্যক্তিপূজার চরম রূপ তৈরি হয়। স্তালিনকে অভিহিত করা হয় 'ভজদ' (Vozhd বা মহান সর্বাধিনায়ক), 'জাতির পিতা', এবং 'বিজ্ঞানের সূর্য' হিসেবে। শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংগীতে নেতার মাহাত্ম্য কীর্তন রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় পরিণত হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্তালিনের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে এই কাল্ট যে বিশাল রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা পরবর্তীতে মাও সেতুং-এর চীন কিংবা উত্তর কোরিয়ার কিম রাজবংশে আরও তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ ধারণ করে।

উভয় ব্যবস্থাতেই নেতাকে সাধারণ মানুষের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এক অতিমানবিক রূপ দেওয়া হয়, যা কার্যত আধুনিক রাজনৈতিক ধর্মে (Political Religion) রূপান্তরিত হয়েছিল।

বিরোধীদের শারীরিক ও মানসিক দমন ছাড়া ফ্যাসিবাদ বা সোভিয়েত শৈলীর মার্ক্সবাদ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে আইনসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দুই ব্যবস্থার মধ্যে এক ভয়াবহ সাযুজ্য রয়েছে।

লেনিন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর ফেলিক্স জেরজিনস্কির (Felix Dzerzhinsky) নেতৃত্বে কুখ্যাত **'চেকা'** (Cheka) প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে জিপিউ, ওজিপিউ এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই **এনকেভিডি** (NKVD)-তে রূপান্তরিত হয়।

অন্যদিকে নাৎসি জার্মানিতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল হারমান গোরিং প্রতিষ্ঠা করেন **'গেস্টাপো'** (Gestapo বা গোপন রাষ্ট্রীয় পুলিশ), যা পরবর্তীতে হাইনরিখ হিমলারের এসএস (SS) বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইতালিতে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আর্তুরো বোকিনির অধীনে গঠিত হয় **'ওভরা'** (OVRA)।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল গঠিত হয় সরকারি অধিদপ্তর **'গুলাগ'** (GULAG - গ্লাভনয়ে উপ্রাভলেনিয়ে লাগেরেয়), যা সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বরফাবৃত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দি, কুলক ও তথাকথিত 'জনগণের শত্রু'দের ক্রীতদাসতুল্য শ্রমে বাধ্য করার এক সুবিশাল নেটওয়ার্কে পরিণত হয়। ১৯৩৭–১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্তালিনের **'গ্রেট পার্জ'** বা মহাবিলুপ্তির (Yezhovshchina) সময়

এনকেভিডি ট্রয়কাগুলির সংক্ষিপ্ত বিচারে আনুমানিক ৭ থেকে ১০ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং লক্ষাধিক মানুষকে গুলাগে পাঠানো হয়। একইভাবে নাৎসি জার্মানি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ দাখাউ (Dachau)-তে প্রথম রাজনৈতিক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প খোলে, যা পরবর্তীকালে হলোকস্ট ও যুদ্ধবন্দিদের নির্মম শ্রম ও নিশ্চিহ্নকরণের দানবীয় শিবিরে পরিণত হয়।

উভয় ব্যবস্থায় কোনো স্বাধীন বিচারপ্রক্রিয়া ছিল না; বিচারহীন হত্যা, রাতের অন্ধকারে অপহরণ এবং বন্দিশিবিরে বিনা মজুরির বাধ্যতামূলক শ্রম ছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বাভাবিক অঙ্গ।

অর্থনৈতিক মালিকানার ক্ষেত্রে দুই দর্শনের মধ্যে কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে—মার্ক্সবাদ যেখানে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের উপায়ে নিয়ন্ত্রণ দেয়, ফ্যাসিবাদ সেখানে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখে। কিন্তু **ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে** উভয় ব্যবস্থাই বাজার অর্থনীতির মুক্ত প্রবাহকে ধ্বংস করে অর্থনীতিকে সর্বময় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।

সোভিয়েত পরিকল্পিত অর্থনীতি: ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে স্তালিন নতুন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) বাতিল করে **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** (First Five-Year Plan, ১৯২৮–১৯৩২) গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন (Gosplan)-এর নির্দেশে প্রতিটি কলকারখানায় কী উৎপাদিত হবে, তার মূল্য কী হবে এবং মজুরি কত হবে—সবকিছু রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত হতে শুরু করে। **১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া কৃষির সর্বাত্মক 'যৌথ খামারকরণ' (Collectivization)-এর ফলে ইউক্রেনসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানবসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (হলদোমর / Holodomor, ১৯৩২–১৯৩৩) নেমে আসে।**

ফ্যাসিবাদী কর্পোরেটিজম ও নাৎসি চতুর্বর্ষীয় পরিকল্পনা: ইতালীয় ফ্যাসিবাদ 'কর্পোরেটিজম' (Corporatism)-এর তত্ত্ব প্রচার করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কর্পোরেশনস গঠন করে এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় তহবিল 'আইআরআই' (IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং ও ভারী শিল্পের এক বিরাট অংশ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। নাৎসি জার্মানি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হারমান গোরিং-এর নেতৃত্বে **'চতুর্বর্ষীয় পরিকল্পনা'** (Four-Year Plan) চালু করে। এই নীতির অধীনে ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল থাকলেও কারখানা মালিকদের স্বাধীন বাণিজ্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়; রাষ্ট্রীয় কোটা, বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ, কাঁচামালের বণ্টন ও শ্রমিকদের মজুরি রাষ্ট্র কঠোরভাবে নির্ধারণ করত।

উভয় রাষ্ট্রই ছিল 'যুদ্ধকালীন অর্থনীতি' (War Economy বা Autarky)-র সমর্থক, যেখানে সমগ্র দেশের অর্থনীতি যুদ্ধ ও সামরিক শৌর্য বিস্তারের যন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছিল।

উভয় মতাদর্শই কেবলমাত্র মানুষের দেহ বা শ্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ চেয়ে ক্ষান্ত হয়নি; তারা মানুষের মস্তিষ্ক, চিন্তা এবং সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল।

নাৎসি জার্মানিতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ ড. জোসেফ গোয়েবলসের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাবলিক এনলাইটেনমেন্ট অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা মন্ত্রণালয়' (Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda)। সংবাদমাধ্যম, রেডিও, সিনেমা ও শিল্পকলাকে কঠোর সেন্সরশিপের আওতায় আনা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে গঠিত হয় **'আজিতপ্রপ'** (Agitprop - Agitation and Propaganda Section) এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় প্রধান সেন্সরশিপ দপ্তর **'গ্লাভলিত'** (Glavlit)। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' (Socialist Realism)-কে একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় শিল্পরীতিরূপে ঘোষণা করা হয় (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)।

তরুণ সমাজের মগজধোলাই: ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিজেদের ছাঁচে তৈরি করতে উভয় দলই শিশুদের বাধ্যতামূলক দলীয় সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের জন্য ছিল 'ইয়ং পাইওনিয়ার্স' (প্রতিষ্ঠিত ১৯২২) এবং তরুণদের জন্য ছিল **'কমসোমল'** (Komsomol, প্রতিষ্ঠিত ২৯ অক্টোবর ১৯১৮)।

ইতালিতে গড়ে তোলা হয় **'অপেরা নাসিওনালে বালিলা'** (Opera Nazionale Balilla - ONB, ১৯২৬) এবং জার্মানিতে গড়ে ওঠে **'হিটলার ইয়ুথ'** (Hitlerjugend), যা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর থেকে জার্মানির প্রতিটি কিশোরের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

'নতুন মানুষ' (New Man) তত্ত্ব: ফ্যাসিবাদীরা তৈরি করতে চেয়েছিল এক আদিম, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবাজ 'নতুন ফ্যাসিস্ট মানুষ' (L'Uomo Nuovo) কিংবা খাঁটি আর্য রক্তের অতিমানব। অন্যদিকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদীরা গড়তে চেয়েছিল শ্রেণিচেতনাযুক্ত, ত্যাগী, ধর্মনিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী 'নতুন সোভিয়েত মানুষ' (Novy Sovetsky Chelovek)। **উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিচেতনাকে চূর্ণ করে তাকে সামাজিক যন্ত্রের একটি সামান্য নাট-বল্টুতে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।**

উভয় মতাদর্শের একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মিল হলো তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি টিকিয়ে রাখতে সবসময় একটি চিরস্থায়ী 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' ও 'ঐতিহাসিক অভিশাপ' চিহ্নিত করার প্রয়োজন হতো।

মার্ক্সীয়-লেনিনীয় বাস্তবায়নে এই চিরন্তন শত্রু ছিল বুর্জোয়া, মেনশেভিক, সোশাল-রেভোলিউশনারি, ট্রটস্কিপন্থী এবং বিশেষত সম্পন্ন কৃষক বা **'কুলক'** (Kulaks)। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্তালিন **"শ্রেণি হিসেবে কুলকদের উচ্ছেদ" (Liquidate the Kulaks as a class) করার ডাক দেন, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা বা সাইবেরিয়ার তুষারভূমিতে নির্বাসিত করা হয়।** ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রে এই শত্রু ছিল জাতিগত ও আদর্শিক—বিশেষত ইহুদি, জিপসি, সমকামী এবং একই সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক ইহুদি-বলশেভিক ষড়যন্ত্র'।

নিয়তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক ভণ্ডামি: কার্ল পপার (Karl Popper) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Open Society and Its Enemies* (১৯৪৫)-এ দেখিয়েছেন যে, মার্ক্সবাদ নিজেদের তত্ত্বকে 'ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম' (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ) বলে দাবি করে রক্তপাতকে ন্যায্য প্রমাণ করত, আর নাৎসিরা তাদের বর্ণবাদকে 'জৈবিক বিজ্ঞানের নিয়ম' (Social Darwinism) বলে দাবি করে নিধনযজ্ঞ পরিচালনা করত। উভয় পক্ষই মনে করত তারা ইতিহাসের এক অপ্রতিরোধ্য 'চূড়ান্ত সত্য' বাস্তবায়ন করছে, যার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়।

ফ্যাসিবাদ ও মার্ক্সবাদের বাস্তব প্রয়োগের ইতিহাসের আয়নায় দাঁড়ালে লেনিন-স্তালিন-মাওয়ের বাস্তবায়িত সমাজতন্ত্র এবং মুসোলিনি-হিটলারের ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোনো কার্যকর গণতান্ত্রিক বা মানবিক ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে উভয় দর্শনেই দেখা গেছে—**একক দলীয় স্বৈরাচার, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিরোধীদের নিঃশর্ত ধ্বংসসাধন, স্বাধীন চিন্তা ও সংবাদমাধ্যমের শ্বাসরোধ, অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় সামরিকীকরণের অধীন করা এবং মানুষকে ব্যক্তির বদলে সমষ্টির পূজারি বানানোর উন্মাদনা।** ইতিহাসবিদ জ্যাকব টালমন (J. L. Talmon) যাকে **'সর্বগ্রাসী গণতন্ত্র' (Totalitarian Democracy)** বলেছেন, তার ভয়াবহ রূপ এই দুই মতাদর্শেই সমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ফ্যাসিবাদ ও মার্ক্সবাদ হল ভাই ভাই যারা ব্যক্তিস্বাধীনতার কবর এবং সর্বগ্রাসী অন্ধকারের জন্ম দেয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের তাই উভয় মতাদর্শ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. Harcourt, Brace and Company, 1951.

২. Faye, Jean-Pierre. Le Siècle des idéologies. Armand Colin, 2002.

Friedrich, Carl J., and Zbigniew K. Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Harvard University Press, 1956.

৩. Gentile, Emilio. The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Translated by Keith Botsford, Harvard University Press, 1996.

৪. Lenin, Vladimir I. The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky. Progress Publishers, 1918.

৫. Mussolini, Benito. "The Doctrine of Fascism." 1932. The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe, edited by Michael Oakeshott, Cambridge University Press, 1939, pp. 164–179.

৬. Payne, Stanley G. A History of Fascism, 1914–1945. University of Wisconsin Press, 1995.

৭. Pipes, Richard. Russia under the Bolshevik Regime. Alfred A. Knopf, 1993.

৮. Popper, Karl. The Open Society and Its Enemies. Vol. 2: The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath, Routledge, 1945.

৯. Service, Robert. Comrades: A World History of Communism. Harvard University Press, 2007.

১০. Talmon, J. L. The Origins of Totalitarian Democracy. Secker & Warburg, 1952.

১১. Tucker, Robert C. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1941. W. W. Norton & Company, 1990.



নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থে প্রাচীন পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রসঙ্গ

- শ্রী নিহার হাউলি

বাঙালি জাতির সামগ্রিক বিবর্তনকে সাম্রাজ্য ও রাজন্যবর্গের সংকীর্ণ রাজনৈতিক বৃত্ত থেকে মুক্ত করে সমাজ, অর্থনীতি ও মাটির মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের (১৯০৩–১৯৮১) **'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)'** (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ / ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) এক যুগান্তকারী সংযোজন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন রামপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতেরা রাজনৈতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর আলোকপাত করছিলেন, তখন নীহাররঞ্জন রায় সমাজ-কাঠামো, বর্ণবিন্যাস, কৃষিব্যবস্থা এবং নৃতাত্ত্বিক রূপান্তরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ 'জনগণের ইতিহাস' রচনা করেন।

এই আকরগ্রন্থে প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ—**'পুণ্ড্র'** বা **'পৌণ্ড্র'** (পরবর্তীকালে যাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়** সমাজ চিহ্নিত)—সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, গভীর এবং ইতিবাচক। ঔপনিবেশিক জাতিতাত্ত্বিক ও রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিতদের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডন করে তিনি প্রাচীন লিপিতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, পৌণ্ড্ররা কোনো পশ্চাৎপদ বা অনগ্রসর গোষ্ঠী ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন গাঙ্গেয় বদ্বীপের আদিমতম ভূমিপুত্র, নগর ও কৃষিসভ্যতার প্রথম স্থপতি এবং বর্ণাশ্রমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক স্বাধীনচেতা কৌম ও ক্ষত্রিয় শক্তি।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় **'জন-বিন্যাস'** এবং চতুর্থ অধ্যায় **'কৌম ও জনপদ বিভাজন'**-এ পুণ্ড্র জাতির নৃ-তাত্ত্বিক উৎস ও মিশ্রণের গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বাঙালির রক্তধারা কোনো একক বংশোদ্ভূত ধারা নয়; এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল একাধিক প্রাচীন নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে:

আদি-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভিত্তি: রায় উল্লেখ করেন যে, পুণ্ড্ররা মূলত ভারতের আদিমতম অধিবাসী বা প্রাক-দ্রাবিড়/আদি-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর রক্তধারা এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা ঋদ্ধ ছিলেন। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশ, নদীবহুল ব-দ্বীপ ও বনজঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার সহজাত দৈহিক শক্তি ও সহনশীলতা তাঁদের রক্তে প্রোথিত ছিল।

আলপাইন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মিশ্রণ: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে উত্তর ও মধ্য ভারত থেকে যখন ব্র্যাকিকেফালিক বা গোলমাথাযুক্ত আলপাইন (Homo Alpinus) এবং

ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর ধারা বাংলায় প্রবেশ করে, তখন পুণ্ড্র কৌম সমাজে এক নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয়। এই রক্তমিশ্রণ পুণ্ড্র সমাজকে কেবল কৃষিকাজেই নয়, সামরিক নেতৃত্ব ও সুসংগঠিত রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণেও উদ্বুদ্ধ করে।

কৌম থেকে জনপদে রূপান্তর: নীহাররঞ্জন রায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, **বাংলার আদি কৌম গোষ্ঠীগুলির (বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, রাঢ় ইত্যাদি) মধ্যে পুণ্ড্ররাই সর্বপ্রথম নিজেদের রক্তভিত্তিক কৌম সংগঠনকে উন্নত করে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ড বা 'জনপদ' (Territorial State)-এ রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।** প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ছিল সেই রাষ্ট্রিক বিবর্তনের প্রথম ফসল।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে বৈদিক ও সূত্র সাহিত্যের আলোকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচন করেছেন—কেন প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে পুণ্ড্রদের বিরূপ চোখে দেখা হয়েছে?

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যান: বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্বে রচিত *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* (সপ্তম অধ্যায়)-এ বর্ণিত শুনাঃশেপের উপাখ্যানে ঋষি বিশ্বামিত্রের অবাধ্য পঞ্চাশজন পুত্রকে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ এবং **পুণ্ড্র** ইত্যাদি প্রান্তে বিতাড়িত ও 'দস্যু' নামে অভিহিত করার শাস্ত্রীয় উল্লেখকে রায় গভীর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা: নীহাররঞ্জন রায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, এই শাস্ত্রীয় নিন্দা কোনো নৃতাত্ত্বিক বা নৈতিক হীনতার প্রমাণ নয়; বরং এটি ছিল পুণ্ড্রদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া। উত্তর ভারতের আর্যভাষী সমাজ যখন গঙ্গারিডাই ও পূর্ব ভারতে তাদের কঠোর যাগযজ্ঞমূলক বর্ণাশ্রম চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন পুণ্ড্ররা তাদের নিজস্ব অবাধ, সাম্যবাদী ও লোকায়ত সংস্কৃতি ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন।

পাপদেশের তকমা ও তার ঐতিহাসিক কারণ: *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী) কিংবা মহাভারতে পুণ্ড্র-বঙ্গে তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমনের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছিল, কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা রক্ষণশীল বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে নিজস্ব পঞ্চায়েত, লোকধর্ম এবং স্বাধীন সামাজিক রীতি অনুসরণ করতেন। রায় প্রমাণ করেছেন যে, তথাকথিত শাস্ত্রীয় 'বহিষ্কার' আসলে পুণ্ড্রদের নিজস্ব স্বাধিকার, আত্মসম্মান এবং বহিরাগত চাপিয়ে দেওয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে অটল অবস্থানের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য।

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় **'কৃষি ও অর্থনীতি'**-তে নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, আদিম অরণ্যসংকুল বাংলাকে শস্যশ্যামলা বাসযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরের প্রকৃত কৃতিত্ব ছিল পুণ্ড্রদের। তাঁরা নিছক যুদ্ধজীবী বা

শিকারী ছিলেন না, বরং ছিলেন এক যুগান্তকারী কৃষি-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক।

জলব্যবস্থাপনা ও ইক্ষু চাষ: রায় বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার জোয়ার-ভাটার লবণাক্ত ও মিষ্টি জলের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা, বাঁধ নির্মাণ এবং জলাভূমি নিষ্কাশন কৌশলে পুণ্ড্ররা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। **তাঁদের নামানুসারেই বিখ্যাত 'পুণ্ড্র-ইক্ষু' বা আখের চাষ বিস্তৃত হয়, যা থেকে প্রস্তুত গুড় ও চিনি প্রাচীন ভারতে রপ্তানি হতো।**

ধান ও রেশমের আদি উৎপাদক: জলাজমিতে আমন ও আউশ ধানের চাষ এবং গুটিপোকা থেকে রেশম সুতো তৈরির আদিম প্রযুক্তি এই পৌণ্ড্র কৃষিজীবী সমাজের হাত ধরেই বিকশিত হয়েছিল।

পুণ্ড্রনগর ও প্রথম নাগরিকায়ন: বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মৌর্য ব্রাহ্মী লিপি এবং বিশাল দুর্গনগরের ধ্বংসাবশেষের ওপর আলোকপাত করে রায় প্রমাণ করেছেন যে, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র। এই নগরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর, শস্যভাণ্ডার এবং মুদ্রাভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো পুণ্ড্রদের উচ্চ সাংগঠনিক মেধা ও প্রশাসনিক শক্তির পরিচয় বহন করে।

নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণবিন্যাস সংক্রান্ত তত্ত্বে সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি হলো—তিনি পৌণ্ড্রদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় পরিচয়কে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক সত্য হিসেবে তুলে ধরেছেন।

মনুস্মৃতি ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় তত্ত্ব: *মনুস্মৃতি* (১০.৪৩–৪৪) উদ্ধৃত করে রায় আলোচনা করেছেন যে, মনু পৌণ্ড্রকদের ওড্র, দ্রাবিড়, যবন ও শক জাতির সঙ্গে এক সারিতে রেখে স্পষ্টভাবে **'ক্ষত্রিয়জাতি'** হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যাঁরা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের বিধান ও ক্রিয়াকাণ্ড অস্বীকার করার কারণে 'ব্রাত্য' বা সংস্কারহীন ক্ষত্রিয় রূপে পরিচিত হন:

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।। পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ..."

বাংলা অনুবাদঃ "ধীরে ধীরে আচার-অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ লোপ পাওয়ার কারণে এবং ব্রাহ্মণদের দর্শন বা সান্নিধ্য না পাওয়ার ফলে পৃথিবীতে এই সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিগুলি শূদ্রত্ব (বৃষলত্ব) প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন— পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়..."

রায়ের ব্যাখ্যা: নীহাররঞ্জন রায় দেখান যে, প্রাচীন সমাজপতিরা যাঁদের শক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হতেন কিন্তু যাঁদের পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য শাসনের অধীন করতে পারতেন না, তাঁদেরই সম্মানসূচক 'ক্ষত্রিয়' অথচ শাস্ত্রীয়ভাবে 'ব্রাত্য' অভিধা দিতেন। পৌণ্ড্রদের হাতে ছিল বিপুল সামরিক শক্তি ও ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব; ফলে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব

অস্বীকার করার উপায় প্রাচীন স্মৃতিকারদের ছিল না।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মহাকাব্যিক শৌর্য: মহাভারতের সভাপর্ব ও হরিবংশে বর্ণিত পৌণ্ড্ররাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের প্রসঙ্গ টেনে রায় উল্লেখ করেন যে, তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক অক্ষের বিরুদ্ধে পূর্ব ভারতের প্রথম সার্বভৌম ক্ষত্রিয় শক্তির প্রতিনিধি।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় **'সমাজ-বিন্যাস ও দৈনন্দিন জীবন'**-এ অত্যন্ত ব্যথিত অথচ সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে এই মহান নির্মাতা জাতি মধ্যযুগের প্রাক্কালে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়েছিল।

পাল যুগের উদারতা বনাম সেন যুগের রক্ষণশীলতা: অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর পাল শাসনকালে পুণ্ড্র ও তাঁদের উত্তরসূরিরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামরিক স্থান ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশের (বিশেষত বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন) আমলে যখন গোঁড়া স্মার্ত অনুশাসন বলবৎ করা হয়, তখন বাংলায় কৃত্রিমভাবে চতুর্বর্ণের বদলে কেবল 'ব্রাহ্মণ' ও 'শূদ্র'—এই দুই মেরু তৈরি করা হয়।

শাস্ত্রীয় অবনমন ও সামাজিক নিপীড়ন: ভবদেব ভট্টের অনুশাসন এবং পরবর্তীকালে রচিত *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*-এর মতো উপপুরাণগুলিতে স্থানীয় ক্ষত্রিয় ও উৎপাদক জাতিকে 'সংকর' বা অনার্য স্তরে অবনমিত করার সচেতন অপচেষ্টা চলে। যে পুণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ছিলেন আর্য, খাদ্য উৎপাদক, দুর্গরক্ষক ও পাইক সৈন্য, রক্ষণশীল সমাজপতিরা তাঁদের প্রান্তিক স্তরে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত করেন।

দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনে স্থানান্তর ও স্বাধিকার রক্ষা: রায় দেখিয়েছেন যে, এই সামাজিক নিষ্পেষণ এবং পদ্মা-তিস্তার নদীপথ পরিবর্তনের ফলে পৌণ্ড্র সমাজের একটি বিশাল অংশ উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় বদ্বীপ—অর্থাৎ চব্বিশ পরগনা, খুলনা, যশোর ও বাখরগঞ্জের সুন্দরবন এলাকায় স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাঁরা অরণ্য পরিষ্কার করে নতুন কৃষি-বসতি স্থাপন করেন এবং নিজেদের সামরিক পাইক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষাত্র তেজ টিকিয়ে রেখেছিলেন।

নীহাররঞ্জন রায়ের মূল্যায়ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে কোনো হীনম্মন্যতার ইতিহাস দেয় না, বরং তাঁদের দাঁড় করায় বাংলা ও বাঙালির আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে। রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী - ১. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কোনো কৃত্রিম সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন না; ইতিহাস প্রমাণ করে যে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ত ও মাটির শৌর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ২. তাঁরা কেবল যোদ্ধা নন, প্রাচীন

বাংলার প্রথম রাষ্ট্রনির্মাতা এবং আধুনিক কৃষিনির্ভর সমাজ-অর্থনীতির রূপকার।

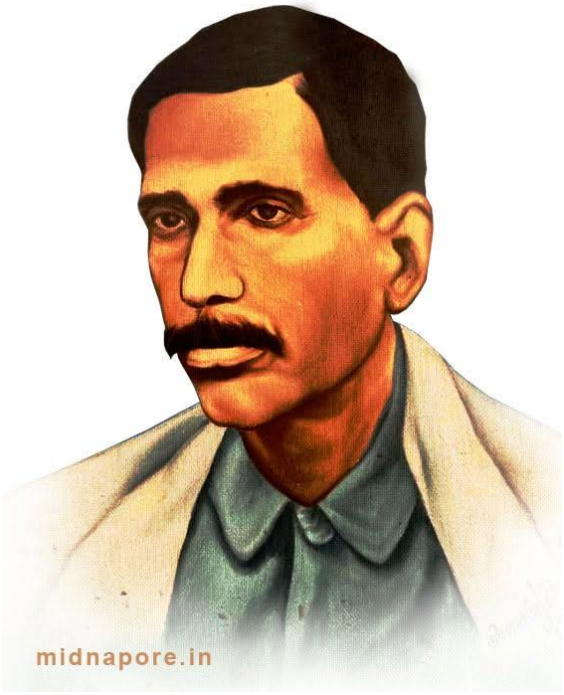
শাস্ত্রের কৃত্রিম অনুশাসন দিয়ে হাজার বছরের ঐতিহাসিক অবদানকে মুছে ফেলা যায় না—নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসদর্শন এই সত্যটিকেই সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে অকাট্য করে তুলেছে। প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির শ্রম, ঘাম এবং রক্তের ওপরেই যে আজকের আধুনিক বাংলার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* সেই শাশ্বত সত্যের সবচেয়ে প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ দলিল। এই গ্রন্থে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বীরত্ব, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ও কৃষি-উদ্ভাবনের ইতিবাচক ইতিহাস চিরকালীন মর্যাদা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র (Works Cited)

১. Ray, Niharranjan. *Bangalir Itihas: Adiparba.* 1949. 3rd ed., Dey's Publishing, 1400 BS [1993].



ঐতিহাসিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব



ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণের জীবন, মনন ও উত্তরাধিকার

- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে ঔপনিবেশিক বাংলায় যে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটেছিল, প্রচলিত ইতিহাসচর্চায় তাকে এককথায় 'বঙ্গীয় নবজাগরণ' (Bengal Renaissance) হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আধুনিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাসচর্চার (Dalit and Subaltern Historiography) গভীরতর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক শ্রেণির সেই নবজাগরণের সমান্তরালে বাংলার

প্রত্যন্ত গ্রামজনপদে আরও একটি বলিষ্ঠ, আত্মমর্যাদামূলক রেনেসাঁসের জন্ম হয়েছিল। জাতিগত অবমাননা, অস্পৃশ্যতার গ্লানি এবং ঔপনিবেশিক আদমশুমারির জ্ঞানতাত্ত্বিক সহিংসতার (epistemic violence) বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলার যে কজন ক্ষণজন্মা মনীষী প্রান্তিক মানুষের আত্মপরিচয় ও ঐতিহাসিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের খেজুরী অঞ্চলের ভূমিপুত্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক নেতা এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের পথিকৃৎ মহেন্দ্রনাথ করণ (১৯ নভেম্বর ১৮৮৬ – ১৭ জুলাই ১৯২৮) এক অনন্যসাধারণ ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

মাত্র একচল্লিশ বছর আট মাসের সংক্ষিপ্ত ও চিররুগ্ন জীবনকালে মহেন্দ্রনাথ করণ যে বিপুল কর্মযজ্ঞ ও বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। একাধারে তিনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামী, মেদিনীপুর ও খেজুরী অঞ্চলের প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক ইতিহাসকার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক শিকড়ের সন্ধানী, প্রাবন্ধিক, কবি, সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক, কারিগরি শিক্ষার প্রসারক এবং আর্তের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক। শারীরিক অসুস্থতা ও অকালপ্রয়াণের ট্র্যাজেডি তাঁর নশ্বর দেহকে কেড়ে নিলেও, বাংলার সামাজিক ইতিহাসে **আত্মমর্যাদা আন্দোলনের** (Self-Respect Movement) যে তাত্ত্বিক ভিত্তি তিনি নির্মাণ করে গিয়েছেন, তা তাঁকে মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে, ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের সমকালীন এক মৌলিক চিন্তাবিদ (organic intellectual) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মহেন্দ্রনাথ করণ **১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে** নভেম্বর অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার খেজুরী অঞ্চলের (বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরী-২ নং ব্লকের অন্তর্গত) ভাঙ্গনমারী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত, সংস্কৃতিবান ও প্রজাহিতৈষী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। করণ পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের জনবসতি বিস্তারের এক সংগ্রামী অধ্যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপ অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে করণ পরিবার খেজুরীর ভাঙ্গনমারী গ্রামে আগমন করে। সেই সময় খেজুরীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল শ্বাপদসংকুল ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকে প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রথমদিকে জঙ্গল কেটে খেজুরীতে আদি বাসিন্দা হিসেবে জনবসতি গড়ে তোলার কারণে ভাঙ্গনমারীর করণ পরিবার এবং নিকটবর্তী কশাড়িয়ার মণ্ডল পরিবার ঐতিহাসিকভাবে **'মুড়াকাটি' প্রজা** রূপে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রকৃতির রুদ্ররোষ জয় করে মাটির অধিকার প্রতিষ্ঠার এই যে সংগ্রামী 'মুড়াকাটি' ঐতিহ্য, তা মহেন্দ্রনাথের

রক্তে ও মননে আজীবন এক অদম্য সাহসিকতার সঞ্চার করেছিল।

তাঁর **পিতা ক্ষেমানন্দ করণ** (কোনো কোনো সূত্রে ক্ষেত্রমানন্দ করণ) ছিলেন একাধারে সম্পন্ন জমিদার, জনদরদী সমাজসেবী এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক। বাংলা **১৩১২** বঙ্গাব্দের **১২ই** কার্তিক (**১৯০৫** খ্রিস্টাব্দ) খেজুরীর অজানবাড়ী হাটে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে ঐতিহাসিক ও বিপুল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ক্ষেমানন্দ করণ ছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। মহেন্দ্রনাথের **মাতা সুভদ্রামণি দেবী** (সুভদ্রা করণ) ছিলেন বোগা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার গয়াপ্রসাদ মিদ্যা ও মোহিনীদেবীর কন্যা। মাতৃকুলের দিক থেকেও মহেন্দ্রনাথ এক সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন; তাঁর মাতামহী মোহিনীদেবী ছিলেন খেজুরীর আদি নাট্যকার রসিকচন্দ্রের কন্যা। এই পারিবারিক সূত্রেই কশাড়িয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষনেতা **মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল** ছিলেন মহেন্দ্রনাথের সম্পর্কিত মামা। মণীন্দ্রনাথ বয়সে মহেন্দ্রনাথের চেয়ে ছয় বছরের ছোট হলেও, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও বন্ধুসুলভ; আমৃত্যু তাঁরা একে অপরের বৌদ্ধিক ও সামাজিক সংগ্রামের সহযোদ্ধা ছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যেষ্ঠ, কিন্তু তাঁর একমাত্র অনুজ যোগেন্দ্র শৈশবেই মৃত্যুবরণ করায় মহেন্দ্রনাথই হয়ে ওঠেন পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন। পরবর্তীকালে **শিরোমণি দেবীর** সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং **তাঁদের চার কন্যা (প্রমীলা, ঊর্মিলা, ঐন্দ্রিলা ও মঞ্জুলা) ও দুই পুত্র (কৌস্তুভকান্তি ও কোহিনূরকান্তি)** জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব থেকেই মহেন্দ্রনাথ ছিলেন চিররুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী, কিন্তু তাঁর সেই ক্ষীণ দেহের অন্তরালে প্রজ্জ্বলিত ছিল এক অসামান্য মেধা ও অনির্বাণ জ্ঞানতৃষ্ণা। গৃহশিক্ষকের কাছে ও গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করার পর তিনি খেজুরীর জালিয়াঘাটা মধ্যশ্রেণি ইংরেজি বিদ্যালয়ে (এম. ই. স্কুল) ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি **১৮৯৮** খ্রিস্টাব্দে উচ্চ প্রাথমিক এবং **১৯০০** খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইংরেজি (M.E.) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর **১৯০২** খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন মেদিনীপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাঁথি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে (Contai High School) ভর্তি হন। **কাঁথি হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় তিনি একটি স্বর্ণপদক ও দুটি রৌপ্যপদক অর্জন করেন, যা তাঁর অসামান্য ধীশক্তির সাক্ষ্য বহন করে।**

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হেয়ার স্কুলে (Hare School) ভর্তি হন। কিন্তু সমকালীন উত্তাল স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ার কারণে তিনি সরকারি নিয়ন্ত্রিত

হেয়ার স্কুল পরিত্যাগ করেন এবং প্রাইভেটে কলকাতার 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (National Council of Education) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন সমতুল্য 'ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড' (Fifth Standard) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় প্রাইভেটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু চিররুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ইতিমধ্যে পিতা ক্ষেমানন্দ করণের আকস্মিক প্রয়াণ ঘটায় তাঁর আর আই.এ. (I.A.) পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক ঋণের বোঝা মেটাতে এই নির্লোভ জমিদার-সন্তান পৈতৃক জমিজমা বিক্রি করে দেন এবং জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি সমাজসেবার ব্রতে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি না থাকলেও, স্বশিক্ষিত মহেন্দ্রনাথ তাঁর অগাধ পঠনপাঠনের মাধ্যমে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃত শাস্ত্র, ইংরেজি সাহিত্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তা সে যুগের শীর্ষস্থানীয় অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদেরও সমীহ আদায় করে নিয়েছিল।

মহেন্দ্রনাথ করণের জনজীবনের সূচনা ঘটেছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশী চেতনার মধ্য দিয়ে। ১৯০২ সালে কাঁথি হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা গর্জে উঠলে, তরুণ মহেন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে গড়ে তোলেন **'বন্দেমাতরম ভিক্ষু সম্প্রদায়'**। এই সংগঠনের সদস্যরা স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং শহরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে বঙ্গভঙ্গের সুদূরপ্রসারী কুফল সম্পর্কে সচেতন করতেন। জনচেতনা জাগ্রত করতে মহেন্দ্রনাথ নিজে অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেই কাঁথি হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় রচনা করেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা **'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'**। 'বন্দেমাতরম ভিক্ষু সম্প্রদায়'-এর কর্মীরা এই পুস্তিকাটি গ্রামে গ্রামে বিক্রয় ও প্রচার করে মেদিনীপুরের গ্রামীণ জনমানসে স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে গ্রামীণ যুবসমাজের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রসার ছাড়া প্রকৃত মুক্তি অসম্ভব। গ্রামীণ বেকার যুবকদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভাঙ্গনমারী গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাসভবন **'ক্ষেমানন্দ কুটির'-এ একটি সার্ভে স্কুল বা 'দি করোনেশন সার্ভে ইন্সটিটিউট'** (The Coronation Survey Institute) **প্রতিষ্ঠা করেন**। নিজে একজন দক্ষ সার্ভেয়ার বা জরিপ-বিশারদ হওয়ায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে

তরুণদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি প্রত্যন্ত খেজুরী অঞ্চলে বিনা চিকিৎসায় দরিদ্র মানুষের মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করত। এই জনস্বাস্থ্য সংকটের মোকাবিলায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মে তাঁরই অক্লান্ত উদ্যোগে অজানবাড়ী গ্রামে **'জনকা আলেকজান্দ্রা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী' (আলেকজান্দ্রা দাতব্য চিকিৎসালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়।** শতবর্ষ অতিক্রম করে এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে **'জনকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র'** নামে পরিচিত এবং এটি আজও খেজুরীর প্রাচীনতম সচল স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে মহেন্দ্রনাথের মানবিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। একইসঙ্গে, পিতার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এবং গ্রামীণ বৌদ্ধিক চর্চার প্রসার ঘটাতে তিনি নিজ গৃহে গড়ে তোলেন এক বিশাল ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার—**'ক্ষেমানন্দ পাঠাগার'** (ক্ষেমানন্দ লাইব্রেরি)। অঞ্চলের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য তিনি **'হিজলী সাহিত্য সমিতি', 'খেজুরী সম্মেলনী' এবং 'খেজুরী সাধারণ পাঠাগার'**-এর মতো একাধিক সারস্বত প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ করণ স্বচেষ্টায় **হোমিওপ্যাথি এবং হাইড্রোপ্যাথি (জলচিকিৎসা)** আয়ত্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রযোগাযোগ ছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অসংখ্য দরিদ্র গ্রামবাসীর চিকিৎসা করতেন। একইসঙ্গে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। সুদূর খুলনা জেলার নিবাসী দরিদ্র ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৯০৩–১৯৭৯) ছিলেন মহেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। মহেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে ও সহায়তায় পড়াশোনা করে রাজেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, দক্ষ সংগঠক, দলিত চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; তাঁর লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ **'জীবনকথা'**-য় ছাত্রদরদী মহেন্দ্রনাথের পিতৃসুলভ মমতা ও উদারতার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

তাঁর ব্যক্তিত্বের আরেকটি বিস্ময়কর দিক ছিল তাঁর বহুমুখী শিল্পীসত্তা ও কারিগরি দক্ষতা। তিনি সুনিপুণভাবে বেহালা বাজাতে পারতেন এবং একজন উঁচুদরের চিত্রশিল্পী ছিলেন—এমনকি মহেন্দ্রনাথের যে প্রতিকৃতিটি আজ সর্বত্র প্রচলিত, সেটি তাঁর নিজেরই হাতে আঁকা আত্মপ্রতিকৃতি। এর পাশাপাশি ফটোগ্রাফি (ছবি তোলা), কাঠের কাজ, বেতের কাজ, সূচিশিল্প, বই বাঁধাই, ঘড়ি মেরামত করা এবং রন্ধনশিল্পেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণতা এবং সরকারি

নথিপত্রের বিকৃতির ফলে বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী—যাঁরা উত্তরবঙ্গে 'পুণ্ড্র' বা 'পুঁড়ো', দক্ষিণবঙ্গে 'পদ্মরাজ' এবং মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে 'বালেয়া' নামে পরিচিত ছিলেন—চরম সামাজিক অবজ্ঞার শিকার হন। এই অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে উনিশ শতকের শেষভাগ (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শিক্ষিত পৌণ্ড্র মনীষীদের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে এক শক্তিশালী 'আত্মমর্যাদা আন্দোলন' (Self-Respect Movement) শুরু হয়। সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার (১৮৫৮–১৯২৩), পণ্ডিত শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ (১৮৬৩–১৯০৭) এবং মহাত্মা রাইচরণ সরদার (১৮৭৫/১৮৭৬–১৯৪২) প্রমুখের হাত ধরে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে **'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি'** গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে **১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর ('পরিবর্তন দিবস') আনুষ্ঠানিকভাবে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' নামের পরিবর্তে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নাম গৃহীত হয়।**

কিন্তু যেকোনো সামাজিক আন্দোলনের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন হয় এক নিরেট, তথ্যনিষ্ঠ ও অখণ্ডনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্বের। মহেন্দ্রনাথ করণ ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের সেই প্রধান তাত্ত্বিক স্থপতি, যিনি আবেগ বা কল্পকথার পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যা (Historiography), নৃতত্ত্ব (Ethnology), পুরাণশাস্ত্র এবং ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক ও উচ্চবর্ণীয় মিথ্যাচারকে চূর্ণ করেছিলেন। স্বজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে **পৌণ্ড্ররা এক অবলুপ্তপ্রায় জাতিতে পরিণত হচ্ছে (*"The Poundras are a dying race"*)**, এবং এই অবক্ষয় থেকে জাতিকে বাঁচাতে আধুনিক শিক্ষা ও আত্মমর্যাদার জাগরণকে একমাত্র পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ডায়মন্ড হারবার থেকে 'অল বেঙ্গল ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' (বা অল বেঙ্গল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কনফারেন্স)-এর পক্ষে রাইচরণ সরদার প্রকাশ করেন মহেন্দ্রনাথ করণের যুগান্তকারী ইংরেজি গবেষণাগ্রন্থ—*A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (An Exposition of the Origin of the Cultivating Pods: Their Status, Ways of Life and Social Manners and Customs)*। ১২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব নিয়ে রচিত প্রথম ইংরেজি আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ হার্বার্ট হোপ রিজলি (Sir H. Risley) ও যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বর্ণবাদী তত্ত্বের কঠোর খণ্ডন করেন। রিজলি তাঁর *Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে এবং নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *বিশ্বকোষ*-এ পৌণ্ড্রদের কায়স্থ পিতা ও নাপিত মাতার সংকর সন্তান কিংবা খুলনা অঞ্চলের কাল্পনিক লোককথার ভিত্তিতে যে অবমাননাকর আখ্যান দিয়েছিলেন, মহেন্দ্রনাথ

প্রামাণ্য তথ্যের সাহায্যে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেন। আরও বিস্ফোরক ছিল যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণের (*Hindu Castes and Sects*) বিরুদ্ধে তাঁর প্রত্যুত্তর, যেখানে যোগেন্দ্রনাথ দাবি করেছিলেন যে পৌণ্ড্র জাতির মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা সর্বাধিক। এর জবাবে মহেন্দ্রনাথ ১৯১১ সালের সরকারি আদমশুমারি রিপোর্টের (Census Report for 1911, পৃষ্ঠা ৭৭২০) পরিসংখ্যান তুলে ধরে দেখান যে—জোলা, যুগী, চাষীকৈবর্ত, পৌণ্ড্র, সদগোপ ও সাঁওতালদের মধ্যে অপরাধীর হার প্রতি ১০,০০০ জনে মাত্র ১ জন বা তারও কম; অথচ বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অপরাধী রয়েছে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে। সরকারি নথিকেই উচ্চবর্ণীয় কুৎসার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের এই কৌশল ছিল মহেন্দ্রনাথের অসামান্য ধীশক্তির পরিচায়ক।

অপরাধপ্রবণতার মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনের পাশাপাশি মহেন্দ্রনাথ দেখান যে, সরকারি জরিপকারীরা কীভাবে একটি বিশুদ্ধ কৃষিজীবী জাতিকে (Cultivating Caste) মৎস্যজীবী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছে। তিনি পরিসংখ্যানগত অসঙ্গতি তুলে ধরে প্রশ্ন তোলেন, যেখানে বাংলার প্রধান দুটি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়—জালিয়া কৈবর্ত ও তিয়রদের মধ্যে প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৫১৯ জন (ও ৭ জন নারী) এবং ৫১৩ জন পুরুষ (ও ৬ জন নারী) মৎস্যজীবী, সেখানে পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৮৭১ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীকে মৎস্যজীবী এবং মাত্র ৯ জন পুরুষ ও ৩ জন নারীকে কৃষক হিসেবে দেখানো চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত *শিবায়ণ* কাব্য (১৭১০–১১ খ্রিস্টাব্দ) এবং ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকেই মেদিনীপুর ও বাংলার পৌণ্ড্ররা মূলত কৃষিজীবী ও মাটির মানুষ। তা সত্ত্বেও ১৮৯০–৯১ সালের শিক্ষা রিপোর্টে (Education Report) ব্রিটিশ সরকার তাঁদের কেবল ‘নিম্নবর্ণ’ (low caste) তকমা দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে, তাঁদের শিক্ষার উন্নয়নে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি; অথচ ১৯১৩ সালের ১৪ই জুলাই প্রকাশিত সরকারি রেজোলিউশনে (নং ৩৪৩৫) স্বীকার করা হয়েছিল যে কৈবর্ত, নমঃশূদ্র ও রাজবংশীদের পাশাপাশি পৌণ্ড্ররাও নিজেদের চেষ্টায় বিপুল উন্নতি সাধন করেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহেন্দ্রনাথ আরও প্রমাণ করেন যে, ‘পোদ’ শব্দটি মূলত সংস্কৃত ‘পৌণ্ড্র’, ‘পৌণ্ডরীক’, ‘পদ্মজ’ বা ‘পদ্ম’ শব্দেরই অপভ্রংশ (corruption)—যা উচ্চবর্ণীয় সেন্সাস আধিকারিকরা বাংলা কুরুচিকর শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রেখে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করতেন। *বিষ্ণুপুরাণ*, *অগ্নিপুরাণ*, *ব্রহ্মপুরাণ*, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *কুলতন্ত্র* উদ্ধৃত করে তিনি দেখান যে, প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের রাজা পুণ্ড্রের

(বলি রাজার পুত্র বা পুরু/অনুর বংশধর) উত্তরসূরি হিসেবে পৌণ্ড্ররা ছিলেন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং তাদের চারটি শাখা—রাঢ়ীয় দুটি শাখা 'পুণ্ড্র/পুঁড়ো' এবং বঙ্গজ ও ওড্রজ শাখা 'পৌণ্ড্র'—ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনযজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য ও উপনয়ন সংস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই তাঁরা ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে চ্যুত হন এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাঁদের 'জল-অব্যবহার্য' (কিন্তু কখনোই 'অস্পৃশ্য' বা 'ম্লেচ্ছ' নয়) হিসেবে চিহ্নিত করে; এমনকি যাঁরা পৌণ্ড্রদের পৌরোহিত্য করতেন সেই ব্রাহ্মণদেরও সমাজচ্যুত করা হতো। আধুনিক গবেষক মহীতোষ মণ্ডল (২০২২) যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে, উপনয়ন সংস্কার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষত্রিয়দের শূদ্রে পরিণত করার যে তত্ত্ব ড. বি. আর. আম্বেদকর পরবর্তীকালে তাঁর *Who Were the Shudras?* গ্রন্থে উপস্থাপন করেছিলেন, মহেন্দ্রনাথ করণ ১৯১৯ সালেই তাঁর গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮, ৪৮, ৫৫) অবিকল সেই একই ঐতিহাসিক যুক্তি নির্মাণ করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ করণের চিন্তার সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও আপসহীন রূপটি প্রকাশ পায় ১৯১৯ সালের গ্রন্থের সাত বছর পর রচিত **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়'** (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ / ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের প্রবীণ নেতা বেণীমাধব হালদার ও রাইচরণ সরদারের 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেন। মহেন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল সুস্পষ্ট ও আত্মমর্যাদাবোধে শাণিত: 'ব্রাত্য' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'সংস্কারচ্যুত', 'পতিত' বা 'বহিরাগত' (outsider); শাস্ত্রীয় দিক থেকে ঝল্ল, মল্ল (মালো) প্রভৃতি সাতটি জাতি প্রকৃত ব্রাত্যক্ষত্রিয় হলেও, বলি রাজার পুত্র পুণ্ড্রের বংশধর পৌণ্ড্ররা কখনোই 'ব্রাত্য' ছিলেন না। তাই নামের আগে 'ব্রাত্য' শব্দটি ব্যবহার করা আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মূল চেতনারই পরিপন্থী। নিজের এই অবস্থানের সমর্থনে তিনি কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতামতও উদ্ধৃত করেন, যিনি 'ব্রাত্য' শব্দটির ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এর ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)—যে বছর রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে ('উত্তরণ দিবস') পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আনুষ্ঠানিকভাবে উপনয়ন বা পৈতে গ্রহণ করেন—প্রকাশিত হয় মহেন্দ্রনাথের অমর কীর্তি **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ'**। এই গ্রন্থটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বংশলতিকা, গোত্রপ্রবর, আচার-সংস্কার ও গৌরবময় ইতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সমগ্র সমাজে নবজাগরণের সঞ্চার করেছিল।

বিশ শতকের গোড়ায় ঔপনিবেশিক বাংলায় যখন মূলধারার সংবাদপত্রগুলো উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক শ্রেণির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন মহেন্দ্রনাথ করণ উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি নিজস্ব **'মুদ্রণ জনপরিসর'** (Print Public Sphere) গড়ে

তোলা ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি অসম্ভব। ইতিহাসবিদ নেহা চ্যাটার্জির গবেষণা থেকে জানা যায় যে, নতুন পত্রিকার সূচনাপর্বে এই দূরদর্শী সংগঠক ও চিন্তাবিদ লিখেছিলেন, **এটি সংবাদপত্রের যুগ এবং ইংল্যান্ডে এমনকি ভিক্ষুকদেরও নিজস্ব সম্প্রদায়ের পত্রিকা রয়েছে; দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষদের পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।**

শুধু পত্রিকা প্রকাশ করাই নয়, পাঠকসমাজকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি এক শিক্ষকের (pedagogical) ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমাজের সচ্ছল মানুষদের উদাসীনতাকে তিরস্কার করে তিনি লিখেছিলেন যে, **বছরে মাত্র দুই টাকা চাঁদা দিয়ে জাতির মুখপত্রের গ্রাহক হওয়া প্রতিটি সক্ষম মানুষের পবিত্র কর্তব্য, কারণ অন্ধ মানুষটিরও হাতে লণ্ঠন রাখা প্রয়োজন যাতে চক্ষুষ্মান মানুষেরা তার গায়ের ওপর হোঁচট খেয়ে না পড়ে।** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা স্পষ্ট ভাষায় জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্ণীয় নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, **যাঁদের আজ ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে, সেই কৃষক, কারিগর ও শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষেরাই জাতির মেরুদণ্ড (backbone of the nation), এবং তাঁদের সম্মতি ও অধিকার ছাড়া কোনো 'জাতি' বা 'নেশন' পূর্ণতা পেতে পারে না।**

মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর জীবদ্দশায় মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা, পরিচালনা ও প্রকাশনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। উক্ত চারটি পত্রিকা বর্তমানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কোনো কোনো লেখক মহেন্দ্রনাথকে চারটি পত্রিকারই একক সম্পাদক বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু চিররুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তিনি সবগুলির একক সম্পাদক ছিলেন না, বরং বিভিন্ন পর্বে সহ-সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও মূল পরিকল্পক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডায়মন্ড হারবার থেকে রাইচরণ সরদারের প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশ করে মাসিক পত্রিকা **'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব'**; এই পত্রিকার সূচনালগ্ন থেকেই তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি পত্রিকাটির পরিচালনাগত কর্মকাণ্ডে নিবিড় সহযোগিতা করেন। পরবর্তীকালে ১৯১৮ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার কালীঘাট থেকে শৈলেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বদান্যতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা **'প্রতিজ্ঞা'**-র সম্পাদনা সূত্রে যুক্ত ছিলেন মহেন্দ্রনাথ করণ, যেখানে তাঁর সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন ভবসিন্ধু লস্কর। এরপর ফাল্গুন ১৩৩০ থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ (১৯২৪–১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত রামচক/খেজুরী ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার'**-এর প্রকাশ ও পরিচালনায় তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, রাইচরণ সরদার ও মণীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সহযোগিতায় এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে

ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনি এই প্রকাশনার সূচনা করেন। রঙিন প্রচ্ছদে মুদ্রিত এই পত্রিকার সামগ্রিক পরিকল্পনা, সম্পাদনা এবং প্রচার ও বিতরণের মূল দায়িত্ব ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথ করণ একনিষ্ঠভাবে পালন করে যান। জীবনের শেষভাগে এসে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত সামাজিক সাপ্তাহিক পত্রিকা **'সত্যযুগ'**-এর পরিচালনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে সংস্কার সাধন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারচেতনা প্রসারিত করা।

মহেন্দ্রনাথ করণ কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন অবিভক্ত মেদিনীপুর তথা বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার (Regional Historiography) এক অবিসংবাদিত পথিকৃৎ। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসে, সীমিত পরিকাঠামো ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে নিছক সত্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার জোরে তিনি প্রাচীন হিজলী রাজ্য ও খেজুরী বন্দরের বিস্মৃত ইতিহাস উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর রচিত 'হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা' সিরিজের দুটি প্রধান গ্রন্থ বাংলা ইতিহাস সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড হিসেবে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'হিজলীর মসনদ-ই-আলা'**। এই গ্রন্থে তিনি হিজলীর সুলতানি ও মুঘল আমলের ইতিহাস, বিশেষ করে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার জীবন, শাসনব্যবস্থা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে হিজলীর সংঘাতের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতটাই অপরিসীম ছিল যে, **ভারতীয় ইতিহাসচর্চার প্রবাদপুরুষ স্যার যদুনাথ সরকার এর ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিলেন, হিজলীর যে ইতিহাস মহেন্দ্রনাথ করণ প্রকাশ করেন তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর বহু বছর পর, ১৯৫৬/১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং স্যার যদুনাথ সরকার গ্রন্থটি পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, যা মহেন্দ্রনাথের ইতিহাস-পদ্ধতির (Historical Methodology) প্রতি সর্বোচ্চ অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়।** এরপর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) *হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা*-র দ্বিতীয় খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয় **'খেজুরী বন্দর'**, যা মহেন্দ্রনাথকে সমগ্র বাংলায় বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। সেকালে 'বাংলার প্রবেশদ্বার' (Gateway of Bengal) হিসেবে পরিচিত প্রাচীন খেজুরী বন্দরের উত্থান-পতন, ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যতরী নোঙর করার ইতিহাস, ভারতের প্রথম ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার সূচনা, ইউরোপীয় সমাধিক্ষেত্র (Kedgeree Cemetery) এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্দরটির ধ্বংসপ্রাপ্তির এক রোমাঞ্চকর ও তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। হিজলী ও খেজুরী অঞ্চলের ইতিহাসের পরিপূরক হিসেবে তিনি

'কসবা হিজলীর বিবরণ' (বা হিজলীর বিবরণ) শীর্ষক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের শুষ্ক তথ্যের বাইরে মহেন্দ্রনাথের একটি সংবেদনশীল ও বিদ্রোহী কবিমন ছিল। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ **'সমাজরেণু'**। এছাড়াও তৎকালীন সমাজের অস্পৃশ্যতা, পুরোহিততন্ত্রের ভণ্ডামি, বর্ণবৈষম্য ও মানুষের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি অসংখ্য তীক্ষ্ণ ও মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর শিরোনামই তাঁর সমাজচেতনার গভীরতা স্পষ্ট করে দেয়—*মাঙ্গলিক, প্রতিশোধ, অধিকার, ভেদ জ্ঞান, মানুষ, সদন কসাই, দেবতা, বাঙ্গালী, রেল যাত্রী, সমাজ ধর্ম্ম, পরীক্ষা, শাস্ত্রবিধি, ধোপার দরদ, নির্জলা একাদশী, জাতি পরিচয়, পণ্ডিতের মান, ঠাকুর দেখা, অত্যাচারের বলি, জাতের বড়াই, আচার* এবং *অশুচির নৌকা*। তাঁর রচিত **'দুর্ভিক্ষের গান'** পুস্তিকাটি সাধারণ মানুষের হাহাকার ও অর্থাভাবের এক জীবন্ত দলিল।

প্রত্যন্ত ভাঙ্গনমারী গ্রামে বসবাস করলেও মহেন্দ্রনাথ করণ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সূত্রে তৎকালীন বাংলার শীর্ষস্থানীয় মনীষী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মিক ও বৌদ্ধিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। **ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং হরিহর শেঠ প্রমুখ দেশবরেণ্য মনীষীর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রবিনিময় ও মতাদর্শগত আদানপ্রদান চলত।**

বাংলার সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসে মহেন্দ্রনাথ করণ এবং অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রবিনিময় এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। শরৎচন্দ্রের একটি লেখায় 'পোদ' (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়) জাতির অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত একটি উল্লেখে ব্যথিত হয়ে মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর তীব্র অথচ মার্জিত প্রতিবাদ জানিয়ে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন। এই একই বিষয়ে শরৎচন্দ্র মোট ১২ থেকে ১৪ খানি প্রতিবাদপত্র পেয়েছিলেন। অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র একটি সাধারণ চিঠি লিখে তা ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু মহেন্দ্রনাথ করণের চিঠির ওজন, যুক্তিশৃঙ্খলা ও গভীর বেদনাবোধ শরৎচন্দ্রকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে, তিনি সর্বপ্রথম মহেন্দ্রনাথকেই উত্তর দিতে বসেন এবং একবার নয়, হাওড়ার বাজে শিবপুর থেকে দু-দুবার ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ চিঠি লেখেন।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর (১০/১০/১৮) বাজে শিবপুর থেকে লেখা প্রথম চিঠিতে শরৎচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেন যে, মহেন্দ্রনাথের পত্র পড়ে তিনি সুখ ও দুঃখ দুই-ই পেয়েছেন—তাঁর লেখায়

ব্যথিত হয়ে নীরবে সহ্য না করে মহেন্দ্রনাথ যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তা তাঁকে আনন্দ দিয়েছে, কারণ সকলের বেদনা এক ওজনের নয় এবং সকলেই দীর্ঘ দিন ধরে তার অবসানের প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। নিজের লেখার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে শরৎচন্দ্র জানান যে 'দেশ' বলতে তাঁর নিজের গ্রামের কথাই মনে ছিল এবং তিনি তাঁর শৈশবের এক মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণ করেন: ছোটবেলায় তাঁদের বাড়িতে পানের ব্যবসা করতে আসা এক পোদ বালক আশ্রয় নিয়েছিল, যে শরৎচন্দ্রের দিদিকে 'মা' বলে ডাকত। বালকটি হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হলে শরৎচন্দ্রের দিদি নিজের হাতে তার বমি পরিষ্কার ও সেবাশুশ্রূষা করেন। পাড়ার লোকের তীব্র নিন্দার মুখে দিদি বলেছিলেন, গৃহদেবতা 'দামোদর' যদি এতে রুষ্ট হন তবে তিনি স্বপ্ন দেবেন—কিন্তু দেবতা কোনো আপত্তি জানাননি, যদিও সমাজের চাপে দিদিকে দিনে পাঁচ-ছয় বার স্নান করতে হতো। শরৎচন্দ্র স্পষ্ট জানান যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করেন না, কারও হাতে জল খেতে তাঁর বাধে না, কিংবা উঁচু জাতকে বড় করতে বা নীচু জাতিকে মনোবেদনা দিয়ে 'হিউমার' (রসিকতা) সৃষ্টি করার জন্য তিনি ওই ছত্রটি লেখেননি; তদুপরি তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, পুস্তকাকারে মুদ্রণের সময় ওই বিতর্কিত অংশটি তুলে দেবেন।

পরবর্তীকালে ২৬শে আশ্বিন (8ঠা আশ্বিন ১৯২৬) বাজে শিবপুর থেকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে শরৎচন্দ্র জানান যে, মহেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরটি তিনি দুইবার পাঠ করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী পত্রের অংশবিশেষ মহেন্দ্রনাথকে যেভাবে ইচ্ছা মুদ্রণ বা ব্যবহারের পূর্ণ অনুমতি দিচ্ছেন। এই চিঠিতে মহেন্দ্রনাথের মনীষা ও দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শরৎচন্দ্র যে কথাগুলো লিখেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যের এক চিরায়ত মানবিক দলিল হয়ে আছে:

"মহেন্দ্রবাবু আমি কেবল দুইটি জাতি মানি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই কোন সুনির্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের-মস্তিষ্কের। সে কেমন জানেন? এই ধরুন আপনি নিজে। আপনার শিক্ষা, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, ইহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনাবোধ, ইহার আন্তরিকতা, - এইগুলিই বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে-বাগদিই বা কি - ওইগুলো না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চপদ দিতে পারিবে না। সে লেখা সোনার জল দিয়া মহামহোপাধ্যায়ের কলম হইতে বাহির হইলেও না।"

[cite: 15]

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, উচ্চবর্ণের ঘৃণার জবাবে মহেন্দ্রনাথ যে 'ঘৃণা দিয়া ঘৃণার প্রতিশোধ দিবার' (কাউন্টার-

অ্যাসার্শন বা তীব্র প্রতিবাদী অবস্থান) কথা লিখেছিলেন, শরৎচন্দ্রের মতো মানবতাবাদী লেখকও তার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়ে লিখেছিলেন যে, **সম্ভবত মহেন্দ্রনাথের কথাই সত্য এবং কেবলমাত্র ভালো মানুষের দ্বারাই সংসারের সকল কাজ চলে না।** প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কীভাবে মূলধারার সাহিত্যসম্রাটের চিন্তাভাবনাকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল, এই পত্রালাপ তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

অবিরাম মানসিক পরিশ্রম, দারিদ্র্য, সমাজচিন্তা এবং আজন্মলালিত রুগ্ন দেহের বোঝা বইতে বইতে মহেন্দ্রনাথ করণ অকালেই জীবনসায়াহ্নে উপনীত হন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই (শ্রাবণ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) মাত্র একচল্লিশ বছর আট মাস বয়সে মেদিনীপুরের এই মহান মনীষী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা উইকিসংকলন ও উইকিউপাত্তের কোনো কোনো যান্ত্রিক ভুক্তিতে তাঁর মৃত্যুতারিখ ১ জুলাই ১৯২৯ বলে উল্লিখিত হলেও, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক বর্ষপঞ্জি, কনিষ্ঠ পুত্র কোহিনূরকান্তি করণ রচিত 'মহেন্দ্রচরিত' এবং আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণায় ১৭ই জুলাই ১৯২৮ তারিখটিই প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের পরিবার বা সন্তানের কথা নয়, মহেন্দ্রনাথের একমাত্র চিন্তা ছিল তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থগুলো নিয়ে। জীবনের শেষ প্রান্তে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি তাঁর আজীবনের সুহৃদ ও সহযোদ্ধা মণীন্দ্রনাথ মণ্ডলের হাত ধরে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করেছিলেন:

"আপনি আমার জীবনের সাথী। আমার বই রইল, তার প্রকাশের কাজটা শেষ করবার ব্যবস্থা করবেন।"

[cite: 5]

জ্ঞানের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি এবং স্বজাতির মুক্তির প্রতি কতখানি নিঃশর্ত ভালোবাসা থাকলে একজন মানুষ মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও কেবল তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের আর্তি জানাতে পারেন, তা ভাবলে আজও হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের **"অত্যুজ্জ্বল রত্ন"** হিসেবে অভিহিত করে লিখেছিলেন যে, **মহেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে মনস্বী, বিদ্বান, কর্মী, সেবক, লেখক ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।**

মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের ওপর নেমে আসে এক নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়। বাংলা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) মেদিনীপুরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ভাঙ্গনমারী গ্রামে তাঁর সযত্নলালিত বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার **'ক্ষেমানন্দ পাঠাগার'** এবং ছাপার জন্য প্রস্তুত থাকা অসংখ্য অমূল্য অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি চিরতরে জলের তোড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। এর পাশাপাশি, **গবেষণার নাম করে**

বেশ কিছু অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি তাঁর পরিবার থেকে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও বই নিয়ে যান, যা আর কখনোই ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এই দ্বিমুখী বিপর্যয়ে বাংলার আঞ্চলিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

দীর্ঘকাল মূলধারার ইতিহাসচর্চায় উপেক্ষিত থাকার পর, মহেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কোহিনূরকান্তি করণের উদ্যোগে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ 'মহেন্দ্রচরিত' (যা পরবর্তীকালে ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে / ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ধীরেন্দ্রনাথ দাসের সহায়তায় পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সামগ্রিক মূল্যায়নে দেখা যায়, মহেন্দ্রনাথ করণ ছিলেন এমন এক সন্ধিক্ষণের মানুষ, যিনি একদিকে হিজলী ও খেজুরীর মাটির ইতিহাসকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করেছেন, অন্যদিকে বর্ণবাদী ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রান্তিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানবিক মর্যাদা ও বৌদ্ধিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। জমিদার বংশের সন্তান হয়েও যিনি দারিদ্র্যকে বরণ করেছিলেন, চিররুগ্ন দেহ নিয়েও যিনি অজ্ঞানতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আজীবন মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন—সেই অমর ঐতিহাসিক ও সমাজসংস্কারক মহেন্দ্রনাথ করণ বাংলার ইতিহাসে চিরকাল এক প্রেরণাদায়ী আলোকস্তম্ভ হয়ে বিরাজ করবেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষেরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে ভারতীয় সমাজকে সমৃদ্ধ করুন।

তথ্যসূত্রঃ

১. Barman, Rup Kumar. "From Pods to Poundra: A Study on the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice 1891–1956." Voice of Dalit, vol. 7, no. 1, Jan. 2014, pp. 121–138.

২. Chatterji, Neha. "Caste-Subalterns and the Question of Nation in Early Twentieth-Century Bengal." Subaltern Political Subjectivities and Practices in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Taylor & Francis, 2022, pp. 217–228.

৩. Karan, Kohinoorkanti. Mahendra Charit. Kshemananda Kutir, 1978.

৪. Karan, Madan Chandra. "Babu Mahendra Nath Karan: A Forgotten Social Reformer (1886–1928) and His Legacy." The Academic, vol. 3, no. 1, Jan. 2025, pp. 71–75.

৫. Karan, Mahendra Nath. A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (An Exposition of the Origin of the Cultivating Pods: Their Status, Ways of Life and Social

Manners and Customs). Published by Rai Charan Sardar, The All Bengal Bratya Kshattriya Samiti, 1919.

৬. করণ, মহেন্দ্রনাথ। খেজুরী বন্দর (হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা, দ্বিতীয় খণ্ড)। মেদিনীপুর, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭)।

৭. করণ, মহেন্দ্রনাথ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ। ১৯২৮। ড. ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, ২০০১।

৮. করণ, মহেন্দ্রনাথ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭)।

৯. করণ, মহেন্দ্রনাথ। সমাজরেণু। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫)।

১০. করণ, মহেন্দ্রনাথ। হিজলীর মসনদ-ই-আলা (হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা, প্রথম খণ্ড)। ১৯২৬। স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক পরিমার্জিত ও সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৮।

১১. Mandal, Mahitosh. "Dalit Resistance during the Bengal Renaissance: Five Anti-Caste Thinkers from Colonial Bengal, India." CASTE: A Global Journal on Social Exclusion, vol. 3, no. 1, Apr. 2022, pp. 11–30.

১২. Naskar, Sanat Kumar, et al., editors. Poundra-Manisha. Poundra Mahasangha, 2012.

১৩. পতি, ভাস্করব্রত। "মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব - ৮০: মহেন্দ্রনাথ করণ (ইতিহাসবিদ, লেখক, খেজুরী)।" জ্বলদর্চি, ১৬ নভেম্বর ২০২৩, www.jaladarchi.com/2023/11/blog-post_29.html।

১৪. ভৌমিক, অরিন্দম। "মেদিনীপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" মিডনাপুর-ডট-ইন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১,

১৫. www.midnapore.in/people/sarat_chandra_chattopadhay.html।

১৬. Sarkar, Krishna Kumar. "Anukul Chandra Das Naskar in Caste Movement and Caste Politics of Bengal (1894–1947)." Anudhyan: An International Journal of Social Sciences, vol. 7, 2022, pp. 225–232.

১৭. সেন, সুদর্শন। "খেজুরীর সুবিখ্যাত ইতিহাসকার ও সুসাহিত্যিক মহেন্দ্রনাথ করণ।" মিডনাপুর-ডট-ইন, www.midnapore.in/article/Mahendranath-Karan-Khejuri-Medinipur.html।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



ড. ভীমরাও আম্বেদকর যে ভুল করেছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা মহাত্মা রাইচরণ সরদার সে ভুল করেন নি

- শ্রীচৈতন্য বর

ঔপনিবেশিক শাসনপীড়িত ভারতে যখন সমাজসংস্কার ও জাতীয় জাগরণের নবতরঙ্গ আলোড়িত হচ্ছিল, তখন ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটিয়ে নিপীড়িত মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক বাঁক নেয়। এই মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশ শতকের ভারতে দুই ধরনের দর্শন ও কর্মপন্থার বিকাশ ঘটেছিল। একদিকে ড. ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংঘাত ও শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্যগত পরিচয় ত্যাগের মধ্য দিয়ে সামাজিক মুক্তির এক পথ। অন্যদিকে অবিভক্ত বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রাণপুরুষ মহাত্মা রাইচরণ সরদার প্রদর্শন করেছিলেন আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার, শিকড়ের প্রতি অটল আস্থা এবং জাতীয়তাবাদী সংহতির এক অনন্য রূপরেখা। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্রতী হয়েও ড. আম্বেদকর যেখানে সভ্যতামূলক অবিচ্ছিন্নতা ও নিজস্ব ঐতিহ্যের ওপর আস্থা হারিয়ে ধর্মান্তরের পথ বেছে নিয়েছিলেন, মহাত্মা রাইচরণ সরদার সেখানে নিজের সনাতন ঐতিহ্য ও ক্ষাত্র ঐতিহ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করে সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিজয়ী পথ রচনা করেছিলেন।

ড. ভীমরাও আম্বেদকর ছিলেন নিঃসন্দেহে এক প্রবাদপ্রতিম মনীষী, প্রাজ্ঞ আইনবিদ এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অন্যতম রূপকার। ভারতীয় সমাজের অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন সংগ্রাম চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ ও সংঘাতপূর্ণ আন্দোলনের শেষ পর্বে এক গভীর মানসিক ক্লান্তি ও মোহভঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৬ সালে নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে লক্ষাধিক অনুগামীসহ তাঁর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ছিল প্রকারান্তরে সনাতন সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের সম্ভাবনার প্রতি এক চরম অনাস্থা প্রকাশ। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি ছিল এক মর্মান্তিক বিচ্যুতি বা ঐতিহাসিক ভুল। সনাতন ভারতীয় সভ্যতার বিশাল মহীরুহ থেকে সামাজিক অবিচারের ক্ষোভে শাখাপ্রশাখাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। এই ধর্মান্তর দলিত সমাজকে মূলধারার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা থেকে একপ্রকার মানসিক দূরত্বে স্থাপন করেছিল, যা সামাজিক ঐক্যের বাতাবরণকে সুদৃঢ় করার পরিবর্তে সমাজদেহে এক কৃত্রিম মনস্তাত্ত্বিক বিভাজনের সৃষ্টি করেছিল। যে সভ্যতার ভিত্তি বহুত্ববাদ ও আত্মশুদ্ধি, তার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে

লড়াই না করে বিদায় নেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে ইতিহাস সচেতন জাতীয়তাবাদীরা একটি প্রতিরক্ষামূলক ও সংকটজনক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখেন।

ঠিক এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অবিভক্ত বাংলার বিস্তীর্ণ কৃষি ও উপকূলীয় অঞ্চলের পৌণ্ড্র সমাজ যখন ঔপনিবেশিক শাসক ও বর্ণবাদী রক্ষণশীল সমাজের যৌথ চাপে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছিল, তখন রাইচরণ সরদার কোনো পলায়নপর পথ বা ধর্মান্তরের আশ্রয় নেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সনাতন ধর্মের মূল সত্যটি বর্ণবৈষম্য নয়, বরং সময়ের ব্যবধানে সমাজদেহে যে মলিনতা ও অন্ধবিশ্বাস জমে উঠেছে, তা দূর করাই প্রকৃত সমাধান। তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষকে শেখালেন যে তাঁরা হীন বা পতিত নন, বরং তাঁরা পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীন বীর ক্ষত্রিয়দের উত্তরসূরি। তিনি আত্মপরিচয়ের সংকটকে কোনো আত্মগ্লানিতে রূপ নিতে দেননি, বরং তাকে শৌর্য ও আত্মমর্যাদার নবজাগরণে রূপান্তরিত করেছিলেন। নিজের শিকড়কে অস্বীকার না করে নিজের ন্যায্য সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে পৌরুষ তিনি দেখিয়েছিলেন, তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল সুরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাইচরণ সরদার যে ভুলটি করেননি, তা হলো নিজের সভ্যতা ও সনাতন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাত বা বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে তার অভ্যন্তরে থেকেই সংস্কার সাধন। গৃহের কোনো কোণে অন্ধকার বা জঞ্জাল জমলে গৃহ ত্যাগ করে চলে যাওয়া পৌরুষের পরিচয় নয়, বরং প্রদীপ জ্বালিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে গৃহের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই বীরের ধর্ম। মহাত্মা রাইচরণ সরদার শাস্ত্রীয় যুক্তি, ঐতিহাসিক সত্য এবং নৈতিক চরিত্রবলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে পৌণ্ড্ররা কোনো অন্ত্যজ বা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় নয়, বরং আর্যাবর্তের সনাতন ক্ষাত্রশক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি লক্ষ লক্ষ পৌণ্ড্র মানুষকে উপনয়ন বা যজ্ঞোপবীত ধারণের দীক্ষা দিয়ে এক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। এই 'ক্ষত্রিয়করণ' কোনো উচ্চবর্ণের অন্ধ অনুকরণ ছিল না; এটি ছিল সহস্রাব্দ প্রাচীন আত্মবিস্মৃতি মুছে ফেলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক নির্ভীক ঐতিহাসিক ঘোষণা। তিনি সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের অন্যায়কে মেনে নেননি, আবার সেই অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় সনাতন ধর্ম ও ভারতমাতার প্রতি নিজের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতাকেও বিসর্জন দেননি।

মহাত্মা রাইচরণ সরদারের এই ইতিবাচক দর্শন কেবল আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল এক সামগ্রিক সমাজ পুনর্গঠন আন্দোলন। তিনি জানতেন, কেবল অধিকারের দাবি জানিয়ে শক্ত ভিত্তি তৈরি করা যায় না, তার জন্য

প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা। তিনি সমাজে মদ্যপান নিবারণ, নৈতিক শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষা ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ড. আম্বেদকরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু যেখানে অনেকাংশে রাজনৈতিক অধিকার ও সাংবিধানিক সুরক্ষার ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে রাইচরণ সরদার তৈরি করেছিলেন আত্মনির্ভরশীল ও চরিত্রবান সমাজ গড়ার এক তৃণমূল পরিকাঠামো। তিনি জমি, কৃষি এবং উপকূলীয় সম্পদের ওপর সাধারণ মানুষের অধিকারকে তাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি পৌণ্ড্র সমাজকে কেবল আত্মমর্যাদাসম্পন্নই করেনি, বরং জাতীয় অর্থনীতি ও গ্রামীণ সংহতির এক অপরিহার্য স্তম্ভে পরিণত করেছিল।

ভৌগোলিক ও কৌশলগত প্রেক্ষাপটে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের এই জাতীয়তাবাদী ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা ও পূর্ব ভারতের প্রান্তিক জনপদে যখন ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী এবং ধর্মান্তরকামী শক্তিগুলি বিভাজনের বীজ বপন করছিল, তখন রাইচরণ সরদারের এই পুনর্জাগরণ আন্দোলন কোটি কোটি মানুষকে নিজস্ব ধর্ম ও জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রেখেছিল। তিনি যদি সেদিন হতাশাগ্রস্ত হয়ে বা রাজনৈতিক ক্ষোভে ধর্মান্তরের পথ বেছে নিতেন, তবে পূর্ব ভারতের সামাজিক ও জনসংখ্যার ভারসাম্য চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যেত, যা পরবর্তীকালে ভারতের সীমান্ত ও অখণ্ডতার জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারত। সনাতন চেতনায় অবিচল থেকে তিনি পূর্ব ভারতের বিশাল জনসমষ্টিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবাবেগ থেকে রক্ষা করে ভারতের জাতীয় সুরক্ষার এক অভেদ্য সামাজিক দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন।

ড. ভীমরাও আম্বেদকর এবং মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নেতৃত্বাধীন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির তুলনা করলে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৌদ্ধিক সাদৃশ্য এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এক মৌলিক বৈপরীত্য ধরা পড়ে। ড. আম্বেদকর তাঁর বিখ্যাত Who Were the Shudras? গ্রন্থে যে তাত্ত্বিক যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন—অর্থাৎ প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের একটি অংশ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে উপনয়ন বা পৈতা ধারণের বৈদিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শূদ্র বা অবনমিত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল—ঠিক সেই একই ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব রাইচরণ সরদার এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬–১৯২৮) অনেক আগেই গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯১৯ সালে রাইচরণ সরদার নিজে ডায়মন্ড হারবারের 'অল বেঙ্গল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি' থেকে মহেন্দ্রনাথ করণের

লেখা প্রামাণ্য ইংরেজি গবেষণাগ্রন্থ A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (An exposition of the Cultivating Pods: their status, ways of life and social manners and customs) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে মহেন্দ্রনাথ করণের বাংলা গ্রন্থ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় (১৯২৭) ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ (১৯২৮ / ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)-এ ঋগ্বেদ, বিষ্ণু পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ ও মনুসংহিতার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রদেশের অধিপতি রাজা বলির পুত্র পুণ্ড্র (বা যযাতির পুত্র অনু এবং রাজা পুরুর বংশধর) থেকে উদ্ভূত পৌণ্ড্ররা প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ ও আর্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনযজ্ঞের সময় এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য ও উপনয়ন সংস্কারের অভাবে তাঁরা ব্রাত্য বা সংস্কারচ্যুত ক্ষত্রিয়ে পরিণত হন এবং যে ব্রাহ্মণরা তাঁদের যাজন করতেন, তাঁদেরও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজচ্যুত করা হতো।

কিন্তু এই অভিন্ন ঐতিহাসিক নির্ণয়ের পর ড. আম্বেদকর যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, মহাত্মা রাইচরণ সরদার সেখানেই সম্পূর্ণ ভিন্ন, গঠনমূলক ও জাতীয়তাবাদী পথ বেছে নেন। ড. আম্বেদকর ব্রাহ্মণ্যবাদের ঐতিহাসিক অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমগ্র সনাতন হিন্দু সভ্যতা, তার শাস্ত্রীয় পরম্পরা, বর্ণব্যবস্থার মূল দর্শন এবং দেবদেবীকে সমূলে বর্জন করার ডাক দেন, যা প্রান্তিক সমাজকে তার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক শিকড় ও জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেছিল।

বিপরীতে, মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও তাঁর সহযোদ্ধারা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে, পৌণ্ড্রদের ভাষা, আচার-আচরণ, বিবাহ রীতি ও ধর্মীয় জীবনচর্চা সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; তাঁরা ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য বা বিজাতীয় নন। মধ্যযুগের পুরাণগুলিতে ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রদের হেয় করার জন্য যে শ্লোকগুলি ঢোকানো হয়েছে, সেগুলি ছিল স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রক্ষিপ্ত সংযোজন (corrupt interpolations)। রাইচরণ সরদারের দর্শন ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট—ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিততন্ত্র যদি অন্যায়ভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপনয়ন ও বৈদিক সংস্কার থেকে বঞ্চিত করে থাকে, তবে তার প্রকৃত প্রতিকার অভিমানবশত পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম বা সংস্কৃতি বর্জন করা নয়, বরং শাস্ত্রীয় ও সামাজিক অধিকারের মাধ্যমে সেই হৃত ক্ষত্রিয় মর্যাদা পুনরায় ছিনিয়ে নেওয়া। এই জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের

চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) পবিত্র রথযাত্রার দিনে, যখন মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে লক্ষ লক্ষ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষ শাস্ত্রীয় বিধি ও বৈদিক সূত্র অনুসারে পুনরায় উপনয়ন বা পৈতা গ্রহণ করেন—যে ঐতিহাসিক দিনটি আজও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে 'উত্তরণ দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়। গবেষক ড. রূপ কুমার বর্মণ তাঁর গবেষণায় যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার এই তফসিলি সমাজ সনাতন হিন্দু দেবদেবী বা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে কখনও প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং মকর সংক্রান্তিতে কপিল মুনি পূজা ও রথযাত্রার মতো সনাতন উৎসবগুলিকে নিজেদের জাতীয় সম্মেলন ও সামাজিক উত্তরণের প্রতীকে পরিণত করে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যকে পরাস্ত করেছে।

১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পুনা চুক্তি এবং বঙ্গীয় রাজনীতির সংকট রাজনৈতিক রণকৌশলের ক্ষেত্রেও ড. আম্বেদকরের গৃহীত পদক্ষেপের তুলনায় মহাত্মা রাইচরণ সরদারের অবস্থান ছিল অনেক বেশি বাস্তবসম্মত, দূরদর্শী ও জাতীয় সংহতির অনুকূল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের লন্ডন গোলটেবিল বৈঠকগুলিতে ড. আম্বেদকর অনুন্নত শ্রেণির জন্য যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার (Separate Electorate) দাবি তুলেছিলেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালে যে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (Communal Award) ঘোষণা করেছিলেন, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতিরই একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ফাঁদ। হিন্দু সমাজকে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিকভাবে স্থায়ীভাবে দ্বিখণ্ডিত করার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করলে ড. আম্বেদকর প্রবল নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পুনা চুক্তিতে (Poona Pact) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় ড. আম্বেদকরের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও দূরদর্শিতার অভাব দুটি দিকে প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, তিনি প্রথমে ব্রিটিশ শাসকদের মদতে পৃথক নির্বাচনের দাবি তুলে ভারতের মূলধারার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রান্তিক সমাজের এক তিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের সৃষ্টি করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, পুনা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রবল শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসিলি নেতৃত্বের সঙ্গে কোনওরূপ আলোচনা বা পরামর্শ করার প্রয়োজনই বোধ করেননি, অথচ বোম্বাই প্রদেশের তুলনায় বাংলায় তফসিলি জনসংখ্যা

ও তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। এমনকি সমকালীন বাংলার নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলিও আম্বেদকরের এই একতরফা সিদ্ধান্তকে 'ড. আম্বেদকরের রাজনৈতিক ভ্রান্তি' (Dr. Ambedkar's political blunder) বলে অভিহিত করে ঘোষণা করেছিল যে, আম্বেদকর স্বাক্ষর করার আগে বাংলার নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করার ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও দেখাননি। অন্যদিকে ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, পুনা চুক্তির মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের ১০টি আসনের পরিবর্তে যৌথ নির্বাচনে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হলে তা উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতাদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রদেশে বর্ণহিন্দু ও তফসিলিদের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

মহাত্মা রাইচরণ সরদার এই ধরনের চরমপন্থী, সংঘাতমুখী বা দোদুল্যমান রাজনীতির আবর্তে নিজের সমাজকে কখনও নিক্ষেপ করেননি। তিনি জানতেন যে, প্রশাসনিক অধিকার, আদমশুমারিতে সম্মানজনক মর্যাদা ও সাংবিধানিক সুরক্ষা আদায়ের জন্য সরকারের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক ও তথ্যভিত্তিক সংলাপ প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য জাতীয় সংহতি বিপন্ন করা বা কেবল রাজনৈতিক দর-কষাকষির ওপর সমাজের ভবিষ্যৎ সঁপে দেওয়া চরম বোকামি। তাই একদিকে ১৯২১ সালের ১৭ই জানুয়ারি সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষ থেকে রাইচরণ সরদার, বেণীমাধব হালদার, অনুকূলচন্দ্র নস্কর, ভবসিন্ধু নস্কর, হেমচন্দ্র নস্কর ও রাখালচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট ডব্লিউ. এইচ. থমসনের (W. H. Thomson) কাছে ডেপুটেশন দিয়ে আদমশুমারিতে অপমানজনক 'পোদ' শব্দের পরিবর্তে 'পৌণ্ড্র' নাম নথিভুক্ত করার সরকারি স্বীকৃতি আদায় করেন এবং ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে তাঁদের কেবল মৎস্যজীবী হিসেবে চিত্রিত করার প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেদের প্রাচীন কৃষিজীবী ও যোদ্ধা ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য তুলে ধরেন; অন্যদিকে ১৯৩৩ সালের ২৮শে জানুয়ারি বাংলার রিফর্মস কমিশনার ও জয়েন্ট সেক্রেটারি আর. এন. গিলক্রিস্টের (R. N. Gilchrist) সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে রাইচরণ সরদার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শিক্ষাগত অগ্রগতি ও প্রশাসনিক অধিকারের বিষয়টি সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। রাইচরণ সরদারের এই ভারসাম্যপূর্ণ ও দূরদর্শী নীতির ফলেই

পৌণ্ড্র সমাজ একদিকে যেমন নিজেদের ক্ষত্রিয় আত্মমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক অস্মিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল, অন্যদিকে তেমনই ১৯৩৬ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া (সিডিউলড কাস্টস) অর্ডারের মাধ্যমে তফসিলি জাতি হিসেবে প্রাপ্য সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত সংরক্ষণের সুফল থেকেও বঞ্চিত হয়নি এবং স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ সালে সরকারিভাবে 'পৌণ্ড্র' নামের চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

ড. আম্বেদকরের অনুসারী রাজনীতির সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিটি মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪০-এর দশকে অবিভক্ত বাংলায়, যা মহাত্মা রাইচরণ সরদারের প্রদর্শিত জাতীয়তাবাদী পথের শ্রেষ্ঠত্বকে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে প্রমাণ করে দিয়েছে। ড. আম্বেদকর প্রান্তিক সমাজকে কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মন্ত্রে ('Capture the temple of power') উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে যে 'অল ইন্ডিয়া সিডিউলড কাস্টস ফেডারেশন' গঠন করেছিলেন, তার বঙ্গীয় শাখা (Bengal Provincial Scheduled Castes Federation) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন মূলধারার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের সঙ্গে যে 'দলিত-মুসলিম জোট' গঠন করেছিল, তার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ ও আত্মঘাতী। সাময়িক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মন্ত্রিত্বের মোহে মুসলিম লীগের সঙ্গে এই মিতালি বাংলার তফসিলি সমাজকে কোনও দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা তো দিতেই পারেনি, উল্টে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংহত তফসিলি মানুষকে চিরতরে ভিটেমাটিহীন, নিঃস্ব শরণার্থীতে পরিণত করেছিল। এমনকি ড. আম্বেদকর নিজেও ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গের তফসিলি বিধায়কদের ভোটে সংবিধান সভায় নির্বাচিত হলেও দেশভাগের ফলে বাংলায় তাঁর সেই রাজনৈতিক ভিত্তিটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পূর্ববঙ্গের তফসিলি সমাজের স্বার্থরক্ষায় তিনি কার্যত কিছুই করতে পারেননি।

অন্যদিকে, মহাত্মা রাইচরণ সরদার (যিনি ১৯৪২ সালের ২৪শে জানুয়ারি পরলোকগমন করেন) তাঁর জীবদ্দশায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে যে অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিলেন, তার ফলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন সর্বদা ভারতমাতার অখণ্ডতা ও মূলধারার জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছে। রাইচরণ সরদারের

ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাসের প্রধান ভাষ্যকার মেদিনীপুরের খেজুরির মহেন্দ্রনাথ করণ (১৯শে নভেম্বর ১৮৮৬ – ১৭ই জুলাই ১৯২৮)—যাঁর গবেষণাগ্রন্থ রাইচরণ সরদার নিজে প্রকাশ করেছিলেন—কেবল একজন সমাজসংস্কারক বা ঐতিহাসিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান স্বাধীনতা সংগ্রামী (Freedom Fighter) এবং খেজুরী বন্দর (১৯২৭), সমাজরেণু (১৯২৫), বাংলার জাতি সমস্যা ও দুর্ভিক্ষের গান-এর মতো দেশপ্রেমমূলক গ্রন্থের রচয়িতা। একইভাবে পৌণ্ড্র সমাজের আরেক বিশিষ্ট নেতা মণীন্দ্রনাথ মণ্ডলও (১৮৮০–১৯৪৩)—যিনি ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার সি. টি. কলেজ হলে বঙ্গীয় জনসংঘ বা অনগ্রসর শ্রেণির ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন—ছিলেন একজন খ্যাতনামা স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী ও লেখক। এমনকি ১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর (১৮৯৪–১৯৪৭) বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে ১৯৪৭ সালের ৯ই মে বসিরহাটের নিকটবর্তী সোলাপোতা গ্রামে এবং ১৬ই মে কলকাতার বউবাজার স্ট্রিটের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে জনসভা করেছিলেন এবং বিরোধীদের প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখেও অবিচল থেকে সভাপতিত্ব করেছিলেন, তখনও তাঁর মূল প্রেরণা ছিল অখণ্ড স্বদেশভূমি ও পিতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষা করা। সর্বোপরি, রাইচরণ সরদারের আন্দোলনের অন্যতম সারথি হেমচন্দ্র নস্কর (যিনি ১৯৩৭ সালে অনুকূলচন্দ্র দাস ও পতিরাম রায়ের সঙ্গে বঙ্গীয় আইনসভায় বিধায়ক বা MLA নির্বাচিত হয়েছিলেন) এবং বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের মতো বিশিষ্ট পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জননেতারা সরাসরি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূলধারার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুলাই গঠিত (এবং ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রথম পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় এবং পরবর্তীতে ১৯৪৮ সাল থেকে রূপকার ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় হেমচন্দ্র নস্কর কৃষি, বন ও মৎস্য দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে সল্টলেক অঞ্চলের উন্নয়নসহ নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনির্মাণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। মহাত্মা রাইচরণ সরদারের আদর্শিক উত্তরাধিকার যে কতটা গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো আজও সর্বভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের (যার নবোদ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস ১৩ই ডিসেম্বর

২০২০) বাৎসরিক পালনীয় দিবসগুলির তালিকায় মহাত্মা রাইচরণ সরদার, সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার ও ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসের পাশাপাশি ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী, ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস এবং ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সর্বোচ্চ জাতীয় মর্যাদায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

আজকের একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতি ও ভারতের উদীয়মান শক্তিকাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের পথটির শ্রেষ্ঠত্ব ও দূরদর্শিতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি কখনোই আত্মবিস্মৃতি বা শিকড়বিচ্ছিন্নতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। ড. আম্বেদকরের পাণ্ডিত্য ও সাংবিধানিক অবদান চিরস্মরণীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ধর্মান্তরের সিদ্ধান্ত ভারতীয় সমাজদেহে যে বিচ্ছিন্নতার ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তা আজও কোথাও কোথাও সামাজিক ঐক্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, মহাত্মা রাইচরণ সরদার শিখিয়েছিলেন কীভাবে নিজ ঐতিহ্যের গভীরতম সত্যে আস্থা রেখে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালানো যায় এবং একই সাথে রাষ্ট্র ও ধর্মের অখণ্ডতাকে সুরক্ষিত রাখা যায়। মহাত্মা রাইচরণ সরদারের এই নির্ভীক, ইতিবাচক ও সমন্বয়ী দর্শন বর্তমান ভারতকে আত্মশুদ্ধি, সামাজিক ন্যায় এবং অটুট জাতীয়তাবোধের সমন্বয়ে এক অপরাজেয় বিশ্বশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার এক অনন্য প্রেরণা।

আধুনিক ভারতের সামাজিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা মহাত্মা রাইচরণ সরদার এক ব্যতিক্রমী, দূরদর্শী ও গঠনমূলক সমাজসংস্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। ড. ভীমরাও আম্বেদকর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও সংবিধান প্রণেতা হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা সত্ত্বেও সমকালীন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ব্রিটিশ-নির্ভর পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি উত্থাপন, বাংলার তফসিলি সমাজের জনসংখ্যাগত ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে পুনা চুক্তি সম্পাদন, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতের বিরোধিতা করে দেশভাগের প্রাক্কালে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পরোক্ষভাবে পুষ্ট করা এবং সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্জনের যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন, মহাত্মা রাইচরণ সরদার তাঁর প্রাজ্ঞ, সংযত ও মাটি-সংলগ্ন নেতৃত্বের কারণে সেই ভ্রান্ত পথগুলি সচেতনভাবেই পরিহার করেছিলেন। রাইচরণ সরদার নিজের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে, সমাজদেহের ক্যানসারস্বরূপ অস্পৃশ্যতা ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করার জন্য নিজের সনাতন ধর্ম বা জাতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই; বরং প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের গৌরবময় ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, উপনয়ন

সংস্কারের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার এবং ভারতের জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার মাধ্যমেই প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত, ইতিবাচক ও স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ মেনে চলুন

1. অনুপ্রবেশকারীদের কাছে জমি বিক্রি করবেন না। অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া হবে।
2. নিয়মিত গীতা পাঠ করুন - এই গ্রন্থ ক্ষত্রিয়দের কথোপকথন।
3. তিলক লাগিয়ে বাইরে বের হবেন, 'পৌণ্ড্র' কথার অর্থ তিলক এবং এটি ক্ষত্রিয় আচার।
4. ক্ষত্রিয় আচার রপ্ত করতে নিয়মিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করুন।
5. বিভিন্ন NARRATIVE ও অপপ্রচার সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
6. যিনি বলবেন হিন্দু মুসলিম করবেন না - তাকে বলুন দেশ কেন ভাগ হয়েছিল ?
7. ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হলে ভারত কেন হিন্দু রাষ্ট্র নয় ? প্রশ্ন করুন।
8. মুসলিমরা মুসলিমদের পক্ষে কথা বললে দোষ নেই, খৃষ্টানরা খৃষ্টানদের হয়ে কথা বললে দোষ নেই, হিন্দুরা হিন্দুর পক্ষ নিয়ে কথা বললে সাম্প্রদায়িক বলা হচ্ছে। যারা বলছে তাদেরকে চিহ্নিত করুন ও তাদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দূরে থাকুন।
9. হিন্দু বিরোধী কমিউনিস্টদের থেকে দূরে থাকুন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ১১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করা শ্রেয়

- শ্রীমঙ্গল মৃধা

আমার পরম আরাধ্য পিতা স্বর্গলোক গমন করেন বাংলা ২৩/০৩/১৩৯৮ (ইং - ০৮/০৭/১৯৯১)। তখন সম্পূর্ণ চাষ মরশুম। আমরা তিন ভাই ও চার বোন খুব সংকটে পড়ে যাই। তখন ৩০ দিন শ্রাদ্ধের নিয়ম ছিল। এই দীর্ঘদিন অশৌচ পালন করা ঐ সময়ে খুব সংকটজনক হয়ে পড়ে। তাই বাবার দেহ সৎকার করার পর আমরা আমাদের পূজণীয় জ্যাঠতুত বড়ভাই বনমালী মৃধার (বর্তমানে স্বর্গীয়) নিকট পরামর্শ করতে গেলাম। পূজনীয় দাদা আমাদের বললেন - তোরা কোনও চিন্তা করিস না, আমি ব্রাহ্মণদের কাছে জেনে দেখি ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করা যায় কিনা। তোরা গঙ্গায় পিণ্ড দিয়ে আয়।

পূজনীয় দাদা সাহেবখালীর শচীন মণ্ডল মহাশয়, কনক নগরের রাইচরণ বাবুদের কাছে গিয়ে পরামর্শ করে জানলেন - ওনারা তৎকালীন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শাস্ত্র মতে আলোচনা মাফিক ১১ দিনের আদ্য শ্রাদ্ধ করেছিলেন এবং

সুরেনবাবু বলেছিলেন শাস্ত্রানুযায়ী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করতে পারেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শুভ কাজে যে কোনও একজন ব্রাহ্মণের গোত্র অনুযায়ী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের গোত্র উচ্চারণ করা হয়, যেমন - আলম্মাণগোত্র, কাশ্যপগোত্র, ভরদ্বাজগোত্র ইত্যাদি তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ১১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারী। এছাড়া মানবিক দিক দিয়ে দেখলে বর্তমান যুগে মানুষ সকল বিষয়ে সমান সমান অধিকার ভোগ করছে; শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের তপশীলি শ্রেণীতে পরিণত করে, মানুষ মারা গেলে একটা শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছে।

আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা চাই আমরা আর ঐ ধরণের শ্রেণী বৈষম্যের মধ্যে না থেকে সমানাধিকার পেতে। শ্রাদ্ধের আগে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নির্ধারিত বৈঠক ব্যবস্থা অনুসারে গ্রামের স্বর্গীয় বরদাকান্ত মণ্ডল মহাশয়ের ভাই কালীপদ মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং সেখানে সকলে ১১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। পূজনীয় দাদা বনমালী মৃধার উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সম্মতি ও সহযোগিতায় আমাদের পিতা স্বর্গীয় অশ্বিনী মৃধার আদ্যশ্রাদ্ধ ১১ দিনে সম্পূর্ণ করি। ১০ দিনে দশাকর্ম এবং কামান। ১১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ, নারায়ণ সেবা ও রামায়ণ গানের ব্যবস্থা হয়। এটিই ছিল ছোটো সাহেবখালী গ্রামের প্রথম ১১ দিনে অনুষ্ঠিত আদ্যশ্রাদ্ধ।

এই ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করে আমরাও খুব উপকৃত হয়েছিলাম। কারণ ভরা চাষের মরশুমে ৩০ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে হলে আমাদের চাষের খুবই ক্ষতি হত। এছাড়া ১ মাস অশৌচ পালন বেশ ব্যয়বহুল ও শারীরিক ঝুঁকি সাপেক্ষ। সেদিক দিয়েও আমরা খুব উপকৃত হয়েছিলাম।

গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যারা আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন ও পাশে থেকে সহযোগিতা করেছিলেন তারা হলেন - ১। বনমালী মৃধা ২। খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৩। শুভেন মৃধা ৪। কার্ত্তিক মণ্ডল ৫। দুর্গাপদ মৃধা ৬। দুর্গাপদ মণ্ডল ৭। কালীপদ মণ্ডল (টপ্পাদার) ৮। শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল ৯। মতীন্দ্রনাথ মণ্ডল ১০। পরেশ মণ্ডল ১১। নটবর মণ্ডল ১২। পরেশ বৈদ্য ১৩। গৌর মণ্ডল ১৪। ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ। গ্রামের এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও মাননীয় রাজ্যেশ্বর বাউলিয়া মহাশয়, ১৩ দিনের সমাজের হলেও উনি আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়া মাত্র ৩০ টাকার

বিনিময়ে রামায়ণ গান গেয়ে সহযোগিতা করেন সুশীলচন্দ্র গায়েন।

আমরা গীতাতে যে সনাতন ধর্মের কথা পাই সেখানে সনাতন ধর্ম সবশ্রেণীর মানুষদের জন্য বলা আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ধর্মের দিক দিয়ে সকল মানুষকে একই রকম সম্মানে সম্মানিত করেছেন এবং একই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। তিনি একই ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলেছেন। গীতার মাহাত্মেও বলা আছে আমাদের মন্ত্র হোক একটি এবং আমাদের ঈশর হউক একজন - তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে সবার সমান সুযোগ সুবিধা থাকা ও পাওয়া উচিত। উপনিষদেও একায়ণবাদের কথা বলা হয়েছে।

তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব - আমরা সবাই একসাথে মিলিত হয়ে আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শ্রেণীকে আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে উন্নত থেকে উন্নততর করতে পারি তার প্রয়াস করা উচিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও মাথায় রাখা বিশেষ প্রয়োজনবোধ হয়ে পড়েছে বর্তমানে তা হল - কেউ মারা গেলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুকে নিয়ে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মিলে একটা নিম্নমানের সমাজনীতি নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয় এবং পিতৃ-মাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদের উপর সমাজের ভয় দেখিয়ে শুধু নিজেদের ভোজনের জন্য একটা অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। এবিষয়ে শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়ের লেখা ও সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতায় উল্লেখিত নিয়ম সমস্ত তপশীলি মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনবোধ করি। উক্ত নিয়মের অগ্রাধিকার দিলে সাধারণ মানুষ বিশেষ উপকৃত হবে এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে মৃতের শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে যে জঘন্য গোলমালের সৃষ্টি হয় তার অবসান ঘটবে।

তাই সবার কাছে আমার স্বকরুণ প্রার্থনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে নিয়মকানুনের কথা অধ্যাপক শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন তা আমরা সর্বন্তকরণে মেনে নিয়ে উনার সাথে তপশীলি শ্রেণীর উন্নত থেকে উন্নততর করার আন্দোলনে সহযোগিতা করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি। সেই সাথে সাথে সকল যুব সমাজকে স্বপনবাবুর আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে সহযোগিতার আবেদন জানাই।

ছোটো সাহেবখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপরামর্শে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রাচীনতম কষ্টদায়ক প্রথার অবসান ঘটিয়ে ১১ দিনে শ্রাদ্ধের নিয়ম প্রচলিত করা হয়। যারা এই

মতে মতাদর্শী ছিলেন বর্তমানে তারাও এই নিয়ম স্বগর্বে পালন করে আসছেন। সেজন্য সে সব ব্যক্তিবর্গকে আমি সম্মান জানাই এবং সর্বশেষে আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য শত শত প্রণতি জানাই। সেই সাথে সাথে শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়ের আন্দোলনকে স্বাগত জানাই এবং আশীর্বাদ করি ওনার আন্দোলন যেন খুব দ্রুত সফলতা লাভ করে।

সর্বশেষে জানাই শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হয়েও আমাদের মতামতকে মেনে নিয়ে স্বর্গীয় পিতা-মাতার শ্রাদ্ধক্রিয়া ১১ দিনে সম্পূর্ণ করেছেন। সেজন্য ওনাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

- শ্রীমঙ্গল মৃধা

পিতা- অশ্বিনী মৃধা

ছোটো সাহেবখালী

হিংগলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগণা।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের জন্য সকল পাঠকের নিকট থেকে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। বছরের যে কোনও সময় লেখা পাঠানো যাবে। লেখা পাঠাতে হবে Email ID: poundrakshatriyadarpan@gmail.com তে এবং ৯৮০০২৯৬৬৪৮ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অর্থনীতি

আত্মশক্তির জাগরণই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি, ভাতা বা ভর্তুকি সহায়ক মাত্র — পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- শ্রীরাধামাধবাচার্য

যেকোনো জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অভ্যুদয় ও দীর্ঘস্থায়ী আর্থ-সামাজিক মুক্তি কেবল বাহ্যিক অনুদান, সরকারি ভাতা বা সাময়িক ভর্তুকির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে পারে না; তার মূল ভিত্তি নিহিত থাকে সেই সমাজের নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের মধ্যে। **বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কালজয়ী আত্মশক্তি ও স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধমালায় বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যখনই কোনো সমাজ নিজের কল্যাণভার সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির দাক্ষিণ্যের হাতে সঁপে দেয়, তখনই তার ভেতরের প্রাণশক্তি শুকিয়ে যায়। বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ-এর বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সত্যটি আজ নতুন করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। ভাতা বা ভর্তুকি তাৎক্ষণিক দারিদ্র্য লাঘবে কিংবা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রাথমিক অবলম্বন হিসেবে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তাকেই যদি জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা একমাত্র অর্থনৈতিক আশ্রয় বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে জাতির মেরুদণ্ড ও সৃজনশীল উদ্যম পঙ্গু হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে আজ এই ধ্রুব সত্যটি

গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে— আত্মশক্তির জাগরণই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত চাবিকাঠি, আর সরকারি ভাতা বা ভর্তুকি সেই যাত্রাপথের সাময়িক সহায়ক মাত্র।

ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ও বঙ্গদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল, স্বয়ম্ভর ও সংগ্রামী ঐতিহ্য। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের গবেষণা ও পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সমাজ চেতনা শীর্ষক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গের আদি জনগোষ্ঠীর মানুষজন কৃষি, ভূমি উদ্ধার, বাণিজ্য ও আত্মরক্ষায় অসামান্য পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে এবং বর্ণব্যবস্থার নিপীড়নে তারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্যুত হয়ে সুন্দরবন ও দক্ষিণবঙ্গের জলা-জঙ্গলময় প্রান্তিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু প্রতিকূল প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়েও তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি বা পরমুখাপেক্ষিতাকে বরণ করেননি; বরং অদম্য শারীরিক শ্রম ও সাহসের জোরে নদীনালা ও বাদাবন হাসিল করে বাংলার শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সামাজিক ন্যায় ও আত্মমর্যাদা আন্দোলন (১৮৯১-১৯৫৬) ছিল মূলত আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের আন্দোলন। বেণীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার এবং ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ মনীষীরা সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল সরকারি অনুগ্রহের আশায় বসে থাকলে জাতির মুক্তি আসবে না। মহাত্মা রাইচরণ সরদার তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ **‘দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা’-য়** (উদ্ধৃত: অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর ও বাংলার জাতি আন্দোলন) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন:**"স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব... প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও।"**

রায়চরণ সরদারের এই বাণী আজকের ভাতা-নির্ভর অর্থনীতির যুগে যেন এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি বুঝেছিলেন যে ক্ষুদ্র বৈষয়িক প্রলোভনে আত্মবিক্রয় করলে বা পরনির্ভর হয়ে পড়লে জাতির নিজস্ব সত্তা ও মর্যাদা লুপ্ত হয়।

বিংশ শতকের গোড়ায় যখন পৌণ্ড্র সমাজের মানুষ চরম অর্থনৈতিক অনটন ও সামাজিক অস্পৃশ্যতার শিকার ছিলেন, তখন তাঁদের সামনে কোনো সরকারি ভাতার ঝুলি উন্মুক্ত ছিল না। তবুও সেই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁরা যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে আত্মশক্তি ও সংঘশক্তির ফসল। পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সমাজ চেতনার ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই:

বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগরের গ্রামভিত্তিক শিক্ষাবিপ্লব: স্বজাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মণিপুর বাঁশতলা গ্রামে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে মুষ্টিভিক্ষা ও অর্থ সংগ্রহ করে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

মহাত্মা রাইচরণ সরদারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ: সমাজের প্রথম স্নাতক ও আইনজীবী রায়চরণ সরদার **১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমিতি' গঠন** করেন এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডায়মন্ড হারবার থেকে **'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকা** প্রকাশ করেন। দূরদূরান্তের দরিদ্র পৌণ্ড্র ছাত্রদের কলকাতায় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুবিধার্থে তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে **'আর্যপৌণ্ড্রক ব্রহ্মচর্য আশ্রম' নামে ছাত্রাবাস** এবং মন্দিরবাজারে **'শিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশন'** প্রতিষ্ঠা করেন।

মহেন্দ্রনাথ করণ ও রাজেন্দ্রনাথ সরকারের বৌদ্ধিক ও সাংগঠনিক জাগরণ: মেদিনীপুরের খেজুরির সন্তান মহেন্দ্রনাথ করণ **'খেজুরি সাধারণ পাঠাগার'** স্থাপন এবং *A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods* (১৯১৯) ও ***'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ'*** **(১৯২৮) র**চনার মাধ্যমে জাতির ইতিহাসচেতনা জাগ্রত করেন। অন্যদিকে খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার (ঔপনিবেশিক বাংলার জাতি-বিরোধী চিন্তানায়কবৃন্দ) **১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র সংঘ' ও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র-যুব পরিষদ'** গঠন করে তরুণ প্রজন্মকে আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

গৌরমোহন মণ্ডল ও ডাঃ ধ্রুবচাঁদ হালদারের উচ্চশিক্ষা বিস্তার: নিম্নবঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গৌরমোহন মণ্ডলের প্রেরণায় বীরেশ্বরপুরে মহাবিদ্যালয় এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ধ্রুবচাঁদ হালদারের এক লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত অনুদানে দক্ষিণ বারাসতে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, মুষ্টিভিক্ষা, সমবায় তহবিল এবং স্বজাতির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম যুগের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল—কোনো সরকারি খয়রাতির ওপর ভর করে নয়।

ভাতা ও ভর্তুকির অর্থনীতি: সহায়ক বনাম সীমাবদ্ধতাঃ আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare State) সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, বৃত্তি, ভাতা এবং কৃষি বা ক্ষুদ্র শিল্পে ভর্তুকির একটি নির্দিষ্ট ও ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যাতে চরম দারিদ্র্যরেখার নিচে তলিয়ে না যান, মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে অর্থাভাবে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য না হয়, কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যাতে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারেন—সেই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ও

সংরক্ষণ নীতি একটি প্রাথমিক 'সুরক্ষা কবচ' বা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন এই সহায়ক ব্যবস্থাটিকেই অর্থনৈতিক জীবনের মূল চালিকাশক্তি বলে ভ্রম করা হয়। ভাতা-নির্ভর মানসিকতার তিনটি সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে:

১. উৎপাদনশীল শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির অবক্ষয়: মানুষের হাতে যখন বিনা শ্রমে বা ন্যূনতম প্রচেষ্টায় সামান্য নগদ অর্থ পৌঁছায়, তখন অনেকের মধ্যেই কঠোর পরিশ্রম, ঝুঁকি গ্রহণ এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের তাগিদ কমে যায়। মাসিক কয়েকশো বা হাজার টাকার ভাতা মানুষের দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্যের সামান্য চাহিদা মেটাতে পারে, কিন্তু তা কখনোই কোনো পরিবারের স্থায়ী মূলধন বা সম্পদ (Capital Asset) সৃষ্টি করতে পারে না।

২. উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকোচন ও মধ্যমানের তৃপ্তি: ভাতা ও ভর্তুকির সংস্কৃতি মানুষের অর্থনৈতিক স্বপ্নকে সংকুচিত করে ফেলে। তরুণ প্রজন্ম যখন দেখে যে সামান্য অনুদানেই জীবন কোনোমতে চলে যাচ্ছে, তখন তারা বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ, উচ্চতর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা কিংবা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার দুর্জয় সাহস হারিয়ে ফেলে।

৩. নাগরিক অধিকারবোধের পরিবর্তে অনুগ্রহপ্রার্থীর মানসিকতা: দীর্ঘদিন ধরে ভাতা বা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকলে সমাজের মানুষ নিজেদের রাষ্ট্রের সক্রিয়, উৎপাদনশীল ও করদাতা নাগরিক হিসেবে ভাবার পরিবর্তে শাসকের 'অনুগ্রহভাজন সুবিধাভোগী' (Beneficiary) হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এর ফলে জাতির আত্মমর্যাদা, স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামী চেতনা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অর্থনৈতিক সংকট ও চ্যালেঞ্জঃ আজকের পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষত দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষের অর্থনৈতিক চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই সমাজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে পূর্বসূরিদের সংগ্রামের ফলে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে এবং একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু অন্যদিকে সমাজের গরিষ্ঠ অংশ আজও প্রথাগত ও অলাভজনক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ।

কৃষিজমির খণ্ডীকরণ ও জলবায়ু সংকট: সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী অঞ্চলের পৌণ্ড্র সমাজের মূল জীবিকা ছিল কৃষি ও মৎস্য চাষ। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উত্তরাধিকার সূত্রে জমি খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার ফলে প্রথাগত চাষাবাদ আর লাভজনক নেই। তদুপরি ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন ও লবণাক্ততার প্রকোপে প্রান্তিক চাষিরা প্রতিনিয়ত নিঃস্ব হচ্ছেন।

অসংগঠিত শ্রম ও পরিযায়ী প্রবণতা: নিজস্ব শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্যোগের অভাবে গ্রামের

বিপুল সংখ্যক তরুণ আজ দিনমজুর, রাজমিস্ত্রি বা স্বল্প-মজুরির অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে বা শহরে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানে তাঁদের শ্রমের চূড়ান্ত শোষণ ঘটলেও অর্জিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগের অভাবে পরিবারের স্থায়ী অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটছে না।

সরকারি চাকরির সংকোচন ও সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা: দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষিত পৌণ্ড্র যুবসমাজের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সংরক্ষিত কোটায় একটি সরকারি চাকরি পাওয়া। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। কেবল সরকারি চাকরির আশায় বসে থেকে জীবনের মূল্যবান যৌবনকাল অতিবাহিত করার প্রবণতা সমাজে শিক্ষিত বেকারত্বকে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগে অনীহা: ঐতিহাসিক কাল থেকেই বাঙালি এবং বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের মতো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে এক ধরনের ভীতি ও অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করার চেয়ে নিরাপদ পরনির্ভরতাকে বেছে নেওয়ার এই মানসিকতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে ভাতা-নির্ভরতার মোহ ত্যাগ করে আত্মশক্তির জাগরণে ব্রতী হতে হবে। সরকারি ভর্তুকি বা প্রকল্পকে কখনোই ভোগ্যপণ্য কেনার অর্থ হিসেবে না দেখে, তাকে সক্ষমতা বৃদ্ধির (Capacity Building) প্রাথমিক সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এই লক্ষ্যে সমাজের সামনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা রয়েছে:

১. প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে দক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষায় (Skill & Technical Education) জোরঃ কেবল সাধারণ ডিগ্রি অর্জন করে সরকারি চাকরির লাইনে দাঁড়ানোর দিন শেষ। বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তি (IT), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), আধুনিক চিকিৎসা-পরিষেবা, নার্সিং, আইন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, এবং কারিগরি শিক্ষায় পৌণ্ড্র তরুণ-তরুণীদের এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি বৃত্তি বা স্কলারশিপের অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় না করে উন্নত প্রশিক্ষণ, ভাষাশিক্ষা ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনে বিনিয়োগ করতে হবে।

২. কৃষির আধুনিকীকরণ ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ (Agri-Entrepreneurship)ঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত ভূমিপুত্র ও কৃষিকাজে দক্ষ। কিন্তু আজকের দিনে সনাতন পদ্ধতিতে শুধু ধান চাষ করে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। কৃষিকে একটি লাভজনক বাণিজ্যে রূপান্তরিত করতে হবে। জৈব কৃষি (Organic Farming), উদ্যানপালন, মাশরুম চাষ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ, পোল্ট্রি ও ডেয়ারি ফার্মিং এবং সর্বোপরি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (Food Processing) শিল্পে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের ফড়েগিরি

রুখতে গ্রামভিত্তিক 'ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি' (FPO) ও সমবায় গড়ে তুলে উৎপাদিত ফসল সরাসরি বাজারে ও অনলাইনে বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) এবং ব্যবসায়িক মানসিকতা গঠনঃ "চাকরি খুঁজব না, চাকরি দেব"—এই মন্ত্রকে পৌণ্ড্র যুবসমাজের মূল আদর্শ করে তুলতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, ই-কমার্স, লজিস্টিকস এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে ছোট ছোট উদ্যোগ (Startups) শুরু করতে হবে। যদি কোনো সরকারি ভর্তুকি বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়া যায়, তবে তা উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি ক্রয় বা ব্যবসার মূলধন হিসেবে খাটাতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন সফল ব্যবসায়ী কেবল নিজের পরিবারের নয়, আরও দশটি পরিবারের অন্নসংস্থান করতে পারেন।

৪. সমবায় আন্দোলন ও নিজস্ব অর্থনৈতিক তহবিল (Community Capital Pool) গঠনঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বদেশী সমাজ' এবং মহাত্মা রায়চরণ সরদার ও পঞ্চানন বর্মার আদর্শ অনুসরণ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে নিজস্ব সমবায় ব্যাংক, ক্রেডিট সোসাইটি ও শিক্ষা-উদ্যোগ তহবিল গড়ে তুলতে হবে। সমাজের যাঁরা আজ প্রতিষ্ঠিত—চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, সরকারি আধিকারিক ও সফল ব্যবসায়ী—তাঁদের একত্রিত হয়ে একটি 'কমিউনিটি ভেঞ্চার ফান্ড' বা মেন্টরশিপ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, যাঁরা সমাজের দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ও উদ্যমী তরুণদের ব্যবসা বা উচ্চশিক্ষায় মূলধন ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন।

৫. নারীর প্রকৃত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ আজকের দিনে নারীদের হাতে সামান্য মাসিক ভাতা তুলে দেওয়াকেই অনেকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে মনে করেন। কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মা-বোনেদের বুঝতে হবে যে, ওই সামান্য ভাতার অর্থ সংসারের খুচরো খরচে ফুরিয়ে যায়, তা তাঁদের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয় না। পরিবর্তে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self-Help Groups)-র মাধ্যমে সেই অর্থ একত্রিত করে কুটির শিল্প, সেলাই ও বুটিক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হাঁস-মুরগি পালন বা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে যখন নারীরা নিজেরা উপার্জনক্ষম ও উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন, তখনই ঘটবে প্রকৃত নারীশক্তির জাগরণ।

৬. অপব্যয় রোধ ও পুঁজি সঞ্চয়ের সংস্কৃতিঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সঞ্চয় ও মূলধন গঠন (Capital Accumulation)। সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা উৎসবে আড়ম্বর ও লোকদেখানো অপব্যয় কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে। অহেতুক ভোগবিলাস ও নেশার কবল থেকে মুক্ত থেকে পরিবারের প্রতিটি উদ্বৃত্ত পয়সা সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার সংস্কার গড়ে তুলতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, **যে জাতি নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে, পৃথিবীর কোনো প্রতিকূলতাই তাকে**

দাবিয়ে রাখতে পারেনি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ একদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা সামাজিক বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার ভেদ করে কেবল আত্মশক্তি, শিক্ষা ও একতার জোরে নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজ একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়িত অর্থনীতির যুগে দাঁড়িয়ে সেই লড়াকু ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়ে কেবল সরকারি ভাতা বা ভর্তুকির ঝুলির দিকে তাকিয়ে থাকা এই বীর জাতির পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের প্রতি চরম অবিচার।

ভাতা বা ভর্তুকিকে একটি সাময়িক ছাতা বা লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পথ চলতে হবে নিজের পায়ের শক্তিতেই। পরনির্ভরতার শৃঙ্খল ভেঙে শিক্ষা, প্রযুক্তি, কৃষি-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ এবং সমবায় শক্তির মাধ্যমে যখন প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবার স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, তখনই মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও মহেন্দ্রনাথ করণের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ ঘটবে। আত্মশক্তির এই মহাজাগরণই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে কেবল অনুগ্রহপ্রার্থী নয়, বরং আধুনিক বাংলা ও ভারতের অর্থনীতির অন্যতম নির্মাতা ও চালিকাশক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

"যারা সংগঠন করেন, তাদেরও সকলের পরিবার আছে। তাই অজুহাত দেখিয়ে, ভালো কাজ থেকে দূরে থেকে, অলস মানসিকতার পরিচয় দেবেন না। সাধ্যানুসারে কিছু করুন এবং সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন।"

- পত্রিকা সম্পাদক।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ধর্ম

সনাতন ধর্ম সুরক্ষায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ও সমকালীন জাতীয়তাবাদী ভূমিকা

- শ্রী বীরভদ্র গায়েন

সনাতন সংস্কৃতির সমাজ-দার্শনিক বিন্যাসে ক্ষত্রিয় সত্ত্বা সর্বদা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, ধর্মীয় ভারসাম্য এবং মানবকল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রধান রক্ষাকবচ হিসেবে স্বীকৃত। পূর্ব ভারতের এক অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুণ্ড্র জনপদ, যার অধিবাসীদের বীরত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্বের বিবরণ বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন প্রধান পুরাণে পুণ্ড্র সাম্রাজ্য ও পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর সামরিক ও প্রশাসনিক ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। বিষ্ণুপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের বিবরণ অনুযায়ী, পৌণ্ড্র জাতির উৎপত্তি প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় মহারাজা যযাতির পুত্র অনুর ধারা কিংবা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম—এই পঞ্চ রাজপুত্রের ঐতিহাসিক রক্তধারা থেকে নিঃসৃত। মহাভারতের আদি ও সভা পর্বের আলোচনায় পুণ্ড্র রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং সেখানকার পরাক্রমশালী শাসকদের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে দিগ্বিজয় পর্বে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের পূর্ব ভারত অভিযানের সময় পুণ্ড্র

নরপতির সঙ্গে সংঘাত ও তৎপরবর্তী মৈত্রীর বিবরণ প্রমাণ করে যে প্রাচীন বাংলায় পৌণ্ড্ররা ছিলেন সমসাময়িক ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ক্ষত্রিয় শক্তি। হরিবংশ ও ভাগবত পুরাণে বর্ণিত পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যান তাঁর অসামান্য শাসনব্যবস্থা ও পরাক্রমের পরিচয় বহন করে। সনাতন শাস্ত্রের সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কেবল বাহুবল প্রদর্শন নয়; বরং 'লোকসংগ্রহ' অর্থাৎ প্রজাপালন, অরণ্য উন্মুক্ত করে কৃষিজমি বিস্তার, অর্থনীতি ও সমাজ পরিকাঠামোকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই ছিল তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের শাসনকর্তা হিসেবে পৌণ্ড্র পূর্বপুরুষগণ ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরা ও সনাতন সমাজকে পূর্ব প্রান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মধ্যযুগীয় বিদেশী বহিরাগত আগ্রাসনের অস্থিরতা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভাজনমূলক সমাজতাত্ত্বিক কারসাজির ফলে বাংলার সনাতন সামাজিক বিন্যাসে এক গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ও জনগণনা কর্তারা ভারতীয় সমাজকে বহু ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করতে ঔপনিবেশিক শ্রেণিবিন্যাস জারি করেন এবং স্থানীয় কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়কে কৃষিজীবী ও জল-অচল গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে অবমাননাকর 'পোদ' আখ্যায় নথিবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালান। এই শোষণমূলক সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের সূচনালগ্নে পৌণ্ড্র সমাজের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী সংস্কার ও জাগরণ পর্বের সূচনা হয়। পণ্ডিত শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব হালদার, রাইচরণ সরদার এবং মহেন্দ্রনাথ করণের মতো চিন্তাবিদ ও জাতীয়তাবাদী সংস্কারকরা এই সমাজের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯০৯ সালে গঠিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি পরবর্তীতে 'সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি'-র রূপ ধারণ করে, যা বাংলার প্রতিটি গ্রামে ক্ষত্রিয়ত্ব পুনরুদ্ধার এবং বৈদিক সংস্কার পুনঃপ্রবর্তনের গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

মহেন্দ্রনাথ করণ ১৯১৯ সালে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে শাস্ত্র ও সমাজতাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন যে পৌণ্ড্ররা কোনো অন্ত্যজ বা হীন জাতি নন; বরং তাঁরা হলেন সেই প্রাচীন সূর্য-চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের উত্তরাধিকারী, যাঁরা পারিপার্শ্বিক ঐতিহাসিক সংকটের ফলে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম থেকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হয়ে ব্রাত্য হয়েছিলেন। ফলে উপনয়ন ধারণ এবং বৈদিক সংস্কার পালনের মাধ্যমে নিজ বর্ণগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুনরুদ্ধার করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই আত্মমর্যাদা আন্দোলনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, অন্যায় সামাজিক বঞ্চনা সত্ত্বেও পৌণ্ড্র নেতৃবৃন্দ সনাতন ধর্ম এবং সনাতন সমাজ ত্যাগ করার পথ বেছে নেননি। বরঞ্চ তাঁরা স্বধর্মের অভ্যন্তরীণ সংস্কার, বৈদিক ধর্মাচারণ এবং

শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে সনাতন সমাজের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেছিলেন। পরবর্তীকালে অনুকূলচন্দ্র নস্করের মতো ত্যাগী নেতারা এই সমাজকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আত্মমর্যাদা দেন এবং ১৯৪৭ সালের সংকটময় মুহূর্তে সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত থেকে মুক্ত রেখে সনাতন সংস্কৃতির ধারাকে অবিচল রাখেন।

একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে সনাতন ধর্ম এক চতুর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং ভূ-রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। একদিকে সনাতন সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বর্ণভেদকে কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সনাতনীদের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে কৃত্রিম পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির সাহায্যে মূল জাতীয়তাবাদী স্রোত থেকে বৃহৎ অংশকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দায়িত্ব অপরিসীম। সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, নদীয়া ও হাওড়া-হুগলির উপকূলবর্তী অঞ্চলজুড়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সনাতন সমাজের একটি প্রধান জনসংখ্যাতাত্ত্বিক মেরুদণ্ড। কোনো সমাজের প্রান্তীয় ও মধ্যবর্তী স্তর সুরক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ না থাকলে সামগ্রিক ধর্মীয় কাঠামো টিকে থাকতে পারে না। **তাই বর্তমান সময়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রধান জাতীয়তাবাদী ভূমিকা হওয়া উচিত সনাতন সমাজের ভেতরে 'সামাজিক সমরসতা' বা অখণ্ড সৌভ্রাতৃত্বের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠা।**

ঐতিহাসিক ক্ষত্রিয় ধর্মের মূল সারবত্তা হলো সকলের আশ্রয়স্থল হওয়া। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে আজ জাতপাতভিত্তিক সংকীর্ণ ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সনাতন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে আত্মিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। যে বর্ণবৈষম্য এককালে সনাতন সমাজকে দুর্বল করেছিল, সেই কুসংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সর্বজনীন সনাতন ঐক্যের অগ্রদূত হতে হবে এই সমাজকে। সনাতন সংস্কৃতিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ছোট বা অচ্ছুত নয়—এই বেদান্তিক সত্যকে প্রচার ও প্রয়োগের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিভাজন সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে এক অভেদ্য সামাজিক প্রাচীর গড়ে তুলতে পারেন। তৃণমূল স্তরে সামাজিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির এই সমন্বয়ী উদ্যোগ সনাতন সমাজকে অভ্যন্তরীণভাবে অজেয় করে তুলবে।

ধর্মের সুরক্ষা কেবল বহির্মুখী প্রতিরক্ষার ওপর নির্ভর করে না; ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি হলো তার নিত্য আধ্যাত্মিক ও আচারনিষ্ঠ জীবন্ত চর্চা। ব্রিটিশ পর্বে পৌণ্ড্র মনীষীরা উপনয়ন সংস্কার ও বৈদিক জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর যে জোর দিয়েছিলেন, বর্তমান ভোগবাদী ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে তার প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারের প্রতিটি ঘরে সনাতন শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ, নিয়মিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং বৈদিক জীবনাচরণের নিয়মিত অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। ধর্মীয় উদাসীনতা ও নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়। তাই নিজ ঐতিহ্য ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বজায় রেখে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মিক বল সঞ্চার করতে হবে।

একই সঙ্গে গ্রামবাংলা ও নগর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মন্দিরকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণমূলক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকভাবে সনাতন মন্দির কেবল বিগ্রহ উপাসনার গৃহ ছিল না; মন্দির ছিল শিক্ষা, সামাজিক আলোচনা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সমাজকল্যাণের জীবন্ত কেন্দ্র। পৌণ্ড্র অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় মন্দির পরিচালনা সমিতিকে সক্রিয় করে সেখানে সাপ্তাহিক শাস্ত্রালোচনা, চরিত্রগঠনমূলক পাঠশালা, দরিদ্র সনাতনীদের বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা ও শিক্ষাদান এবং সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মন্দির যখন সমগ্র জনপদের আশা-ভরসার কেন্দ্রে পরিণত হবে, তখন বিচ্ছিন্নতা বা ধর্মীয় উদাসীনতার কোনো সুযোগ থাকবে না। পারিবারিক ও সামাজিক উভয় স্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধের এই ব্যবহারিক প্রয়োগ সনাতন ধর্মের শিকড়কে তৃণমূল স্তরে মজবুত করবে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ উপকূলীয় বদ্বীপ ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে সনাতন সমাজ আজ তীব্র জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রূপান্তরের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, সুন্দরবন অঞ্চল এবং সংলগ্ন গ্রামীণ জনপদগুলোতে যেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিবিড় বসতি রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন বিদেশি অর্থপুষ্ট সংস্থা ও সুযোগসন্ধানী পক্ষ দারিদ্র্য, চিকিৎসার অভাব এবং কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে অনবরত ধর্মান্তরণের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এই সীমান্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা এখানে সরাসরি জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে। এই ভূ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভূমিকা হতে হবে সজাগ প্রহরীর মতো।

যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এই মাটির ভূমিপুত্র এবং কৃষিশ্রম থেকে শুরু করে স্থানীয় জনজীবনের সর্বত্র তাঁদের প্রভাব বিদ্যমান, তাই তাঁরাই পারেন ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর তৃণমূল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। পৌণ্ড্র সমাজের সচ্ছল, শিক্ষিত ও সংগঠিত অংশের উচিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র সনাতনী পরিবারগুলির পাশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চিকিৎসার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সনাতনীদের কোনো অংশ যেন অভাবের তাড়নায় বা সামাজিক অপমানের শিকার হয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য না হয়, সেদিকে নজর রাখা পৌণ্ড্র নেতৃত্বের ক্ষত্রিয়ধর্মীয় দায়িত্ব। একই সঙ্গে,

যারা বিভ্রান্ত হয়ে বা প্ররোচনায় পড়ে অতীতে সনাতন ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁদের সম্মানের সঙ্গে 'পরাবর্তন' বা স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার পথ সুগম করতে হবে। ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারলে প্রাচ্য ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে সনাতন সংস্কৃতি চিরতরে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের শাশ্বত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেছেন যে শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, কর্মদক্ষতা, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ মনোভাব, দানশীলতা এবং প্রজাপালনের শাসনভাবই হলো ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক গুণ (গীতা ১৮/৪৩)। বর্তমান যুগে এই ক্ষাত্রতেজের প্রয়োগ কেবলমাত্র সনাতন অস্ত্রের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; আধুনিক যুগের যুদ্ধ মূলত মেধা, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ও মতাদর্শের যুদ্ধ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবসমাজকে এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে নিজেদের আধুনিক যুগের বৌদ্ধিক ক্ষত্রিয় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ঔপনিবেশিক যুগে সীমিত সুযোগের মধ্যেও যেভাবে পৌণ্ড্র সমাজ থেকে বিদ্বান ও সমাজনেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনই বর্তমান প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষা, প্রশাসনিক সেবা, আইন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। শাসনব্যবস্থার নীতিনির্ধারণী স্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকদের মেধার উপস্থিতি থাকলে তা সমগ্র সনাতন সমাজের স্বার্থ ও সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করবে।

বৌদ্ধিক সক্ষমতার পাশাপাশি শারীরিক বল ও আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করা যুবসমাজের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি গ্রামে ও পাড়ায় ব্যায়ামাগার, যোগচর্চা ও সনাতন মার্শাল আর্টের কেন্দ্র গড়ে তুলে তরুণদের শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলতে হবে, যাতে ধর্মস্থান, নারী এবং দুর্বল নাগরিকদের ওপর যেকোনো সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বা সমাজবিরোধী উপদ্রবের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। একই সঙ্গে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সনাতন ধর্ম এবং পুণ্ড্র ইতিহাসের ওপর চলা পরিকল্পিত মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হবে। ইতিহাস বিস্মৃত কোনো সমাজ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না; তাই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের গৌরবগাথা এবং বিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস সর্বসমক্ষে তুলে ধরে তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সঞ্চারিত করতে হবে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস হলো প্রতিকূলতার মুখে অবিচল আত্মবিশ্বাস ও স্বধর্মনিষ্ঠার এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সামাজিক বঞ্চনা, ঔপনিবেশিক অবমাননা কিংবা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা—কোনো প্রতিকূলতাই তাঁদের সনাতন ধর্মের শিকড়

থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। বর্তমান শতাব্দীর সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সেই ঐতিহাসিক ক্ষাত্রধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় সমুপস্থিত। অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিতে কেবল আত্মতুষ্ট না থেকে বর্তমানের জাতীয়তাবাদী প্রয়োজনের নিরিখে নিজেদের সংগঠিত করাই পৌণ্ড্র সমাজের অগ্রগণ্য কর্তব্য। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যখন একদিকে নিজেদের বৈদিক জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবেন, এবং অন্যদিকে বৃহত্তর সনাতন সমাজের সংহতি রক্ষায় ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন, তখনই ধর্মের প্রকৃত সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। মেধা ও ত্যাগের সমন্বয়ে সামাজিক সমরসতা প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক সুরক্ষাবলয় নির্মাণ করা এবং ভারতমাতার সনাতন ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে সমুন্নত রাখাই হোক বর্তমান যুগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শাশ্বত ব্রত। এই জাতীয়তাবাদী ও ইতিবাচক সংকল্পের মাধ্যমেই সনাতন ধর্মের বিজয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

"বর্বরদের কোনও ইতিহাস থাকেনা"
- মহাত্মা রাইচরণ সরদার
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

বর্তমান বিশ্ব ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের করণীয়

-শ্রী ত্রিলোচন নস্কর

একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে বিশ্বরাজনীতি এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। সাবেক একমেরু বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আজ এক জটিল বহুমেরুকেন্দ্রিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে প্রযুক্তিগত বিপ্লব, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক সীমানার টানাপোড়েন এবং জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ আন্তর্জাতিক সমীকরণকে নতুন মাত্রা দিচ্ছে। বিশেষ করে বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির ভরকেন্দ্র যখন আটলান্টিক থেকে সরে এসে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে থিতু হচ্ছে, তখন প্রাচীন সভ্যতা ও উদীয়মান বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে ভারতের অবস্থান ও নেতৃত্ব ক্রমশ নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যেকোনো রাষ্ট্রের সামগ্রিক সুরক্ষাবলয় ও অগ্রগতি নির্ভর করে তার অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তি, ঐতিহাসিক সংহতি এবং নাগরিক সমাজের জাতীয়তাবোধের ওপর। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের অংশীদার এবং বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ভূমিকা ও করণীয়

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী একটি বিষয়।

ঐতিহাসিকভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ পুণ্ড্রবর্ধন ও অবিভক্ত বাংলার এক গৌরবময় মাটির সন্তান, যাদের শিকড় প্রোথিত রয়েছে শ্রমনিষ্ঠা, শৌর্য এবং আত্মমর্যাদার দৃঢ় ঐতিহ্যে। ঔপনিবেশিক শাসন ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এই জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল জাতীয় আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। মহেন্দ্রনাথ করণ বা হরিচরণ মল্লিকের মতো চিন্তানায়কদের হাত ধরে যে জাগরণ শুরু হয়েছিল, তার মূল সুরটিই ছিল আত্মনির্ভরতা, শিক্ষা ও আত্মশক্তির প্রকাশ। বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের মুখে যখন প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক শক্তিতে ভর করে দাঁড়াতে চাইছে, তখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সেই সুপ্ত ক্ষাত্রতেজ ও সৃজনশীল মানসিকতাকে জাতীয় স্বার্থে পুনরায় সক্রিয় করে তোলা সময়ের দাবি।

বর্তমান বিশ্বরাজনীতি মূলত পরিচালিত হচ্ছে অর্থনৈতিক কূটনীতি, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং কৌশলগত স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার এই যুগে খাদ্য নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার সুরক্ষা প্রতিটি সার্বভৌম দেশের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি বৃহৎ অংশ আবহমানকাল ধরে কৃষি, জলজ সম্পদ এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আত্মনির্ভর ভারতের বর্তমান ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে এই ঐতিহ্যবাহী দক্ষতাকে রূপান্তরিত করতে হবে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক উদ্যোগে। কৃষি-প্রযুক্তি, এগ্রো-বিজনেস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বঙ্গোপসাগরীয় নীল অর্থনীতি বা 'ব্লু ইকোনমি'র মতো সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিতে নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। তৃণমূল স্তরের এই অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ভারতকে বহির্দেশীয় অর্থনৈতিক চাপের মুখে এক অভেদ্য সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা সুরক্ষার এই যুগে বিশ্বরাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বৌদ্ধিক মানবসম্পদ। ভূ-কৌশলগত প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হলে মেধা ও কারিগরি উৎকর্ষের বিকল্প নেই। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তরুণ প্রজন্মকে চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে এসে মহাকাশ বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা গবেষণা, আইন এবং সিভিল সার্ভিসের মতো জাতীয় নীতিনির্ধারণী অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করতে হবে। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ভারতের বৌদ্ধিক শক্তির পরিসর বৃদ্ধি করা সম্ভব। মেধার সুসংহত বিকাশ কেবল একটি সমাজের সার্বিক উত্থান ঘটায় না, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের উদ্ভাবন ক্ষমতাকেও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

বহুস্তরীয় আন্তর্জাতিক কূটনীতির আবহে আজ বিশ্বজুড়ে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অভ্যন্তরীণ সংহতি নষ্ট করার চক্রান্ত একটি বড় কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দেশের আত্মবিশ্বাস ও স্থায়িত্বকে নাড়িয়ে দিতে সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই জটিল পরিস্থিতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সবচেয়ে বড় জাতীয়তাবাদী দায়িত্ব হলো সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো প্রচারণাকে প্রতিহত করা। ভারতের সনাতন বহুত্ববাদী কাঠামো ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূলধারায় অবিচল থেকে জাতীয় ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে। আত্মপরিচয়ের মর্যাদা বজায় রেখেই সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতাই যে কোনো বাহ্যিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ।

ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত অত্যন্ত সংবেদনশীল এক অঞ্চল। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিসরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বাস্তব ও ঐতিহাসিক বিস্তার রয়েছে। একটি দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা কেবল সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল থাকে না, বরং সীমান্তে বসবাসকারী জনগণের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সতকর্তা ও সহযোগিতার ওপর রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বহুলাংশে নির্ভর করে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এই গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডে সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের সুরক্ষার দ্বিতীয় বলয় হিসেবে কাজ করতে পারে। স্থানীয় সামাজিক নেতৃত্বকে সুদৃঢ় করে সীমান্তবর্তী জনপদের সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বর্তমান ভূ-রাজনীতিতে এক গভীর কৌশলগত অবদান।

বিশ্বরাজনীতি আজ স্পষ্টতই এক পুনরুজ্জীবিত ভারতের আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে। এই সন্ধিক্ষণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ কোনো নীরব দর্শক হতে পারে না; তাদের হতে হবে আত্মবিশ্বাসী ও সক্রিয় অংশীদার। শিক্ষা, উদ্ভাবনী অর্থনীতি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়ে যখন একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী জাতীয় স্বার্থে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে, তখন কোনো বৈশ্বিক পরিবর্তনই জাতির অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারে না। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের এই নবজাগরণ ও ইতিবাচক আত্মবিকাশ একবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে বিশ্বমঞ্চে স্বাবলম্বী ও অপরাজেয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পকে নিঃসন্দেহে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

সাবধানতা* পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অনুপ্রবেশকারীদের কাছে জমি, দোকান, বাড়ি বিক্রি না করেন। এমনকি ভাড়াও দেবেন না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উল্লেখযোগ্য নারীরা

- শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

ভারতের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নারীরা অসীম সাহসিকতা, আত্মত্যাগ এবং অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনকালে যখন বাংলার কয়েকটি জনগোষ্ঠী ব্রিটিশ রাজত্বকে আশীর্বাদ মনে করে অথবা বর্ণহিন্দুদের আন্দোলন বিবেচনা করে স্বদেশী ও স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বীরাঙ্গনারা সম্পূর্ণ বিপরীত ও আপসহীন জাতীয়তাবাদী পথ বেছে নেন। গবেষক ও ইতিহাসবিদ শ্যামলকুমার প্রামাণিকের 'পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস' গ্রন্থ এবং 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ'-এর ঐতিহাসিক দলিলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী নারীদের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রামাণ্য উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল মোচনের এই সংগ্রামে স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর এবং অষ্টমী ঢালী প্রমুখ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী প্রত্যক্ষভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ঔপনিবেশিক শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কারাবরণ করেন।

বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডলঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নারী জাগরণ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল এক অগ্রগণ্য নাম। তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশ এবং ঔপনিবেশিক দমন-পীড়নের মধ্যেও তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে একজন সক্রিয় বিপ্লবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। দেশের পরাধীনতা ঘোচানোর লক্ষ্যে পরিচালিত স্বদেশী ও মুক্তি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি নির্ভীকচিত্তে কারাবরণ করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের মধ্যে স্বর্ণময়ী মণ্ডলের এই কারাবরণ কেবল একটি ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ ছিল না, বরং তা সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীসমাজের মধ্যে সুপ্ত ক্ষত্রিয় তেজ এবং ভারতমাতার মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বিপ্লবী মোক্ষদা নস্করঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীশক্তির অপর এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি হলেন বিপ্লবী মোক্ষদা নস্কর। দক্ষিণবঙ্গের নদীমাতৃক অঞ্চলে বসবাসকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী নস্কর পরিবারের এই বীরাঙ্গনা গৃহকোণের গণ্ডি অতিক্রম করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতে শামিল হন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর সক্রিয় বৈপ্লবিক ভূমিকার কারণে তাঁকেও ঔপনিবেশিক কারাগারে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়। বিপ্লবী মোক্ষদা নস্করের এই কারাবরণ

প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মমর্যাদা আন্দোলন কেবল সামাজিক অধিকার আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এই সমাজের নারীরা নিজেদের সামাজিক মুক্তিকে ভারতমাতার সার্বিক স্বাধীনতার সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন।

বিপ্লবী অষ্টমী ঢালীঃ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কারাবরণকারী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবীদের সারিতে অষ্টমী ঢালী এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। স্বর্ণময়ী মণ্ডল ও মোক্ষদা নস্করের সহযোদ্ধা হিসেবে বিপ্লবী অষ্টমী ঢালীও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের ব্যক্তিসুখ তুচ্ছ করে কারাবরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক দলিলে এই তিন বিপ্লবী নারীর নামের সাথে 'প্রমুখ' শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর এবং অষ্টমী ঢালীর নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় আরও বহু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী তৎকালীন স্বদেশী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে কারালাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। কালের প্রবাহে এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংরক্ষণের অভাবে বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে এই বিপ্লবী নারীদের সংগ্রামী ইতিহাস অজ্ঞাত থেকে গেলেও, ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে তাঁদের কারাবরণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের সংগ্রামী চেতনার মূলে ছিল তাঁদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য ও বৈদিক সংস্কারগত উচ্চ মর্যাদা। ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে এই সম্প্রদায়ের নারীরা কেবল পরিবারের অংশ ছিলেন না, বরং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আচারে পুরুষের সমান অধিকারভোগী ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে যে **'আত্মমর্যাদা আন্দোলন'** ও শিক্ষা জাগরণ সূচিত হয়, তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। তৎকালীন সমাজসংস্কারক ও নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজের নারীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত না করলে জাতির প্রকৃত উন্নতি বা লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। এই কারণে পিতামাতারা যাতে পুত্রসন্তানের পাশাপাশি তাঁদের কন্যাসন্তানদেরও—অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই—উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তার জন্য সমাজের সর্বস্তরে জোরালো আবেদন জানানো হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একইসঙ্গে, সেকালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত কন্যাপণ প্রথার মতো সামাজিক রীতি ও তার পরিণতি নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক পর্যায়ে গভীর আত্মসমালোচনা শুরু হয়। শিক্ষার প্রসার এবং এই ধরনের আধুনিক সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীরা ক্রমশ প্রান্তিকতা কাটিয়ে মূলধারার সমাজজীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আদর্শিক দর্শনে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মহাত্মা রাইচরণ সর্দার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্রে সমাজের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উদ্দেশ্যে সরাসরি "মাতৃগণ" বলে সম্বোধন করে তাঁদেরকে গৌরবময় ইতিহাস ও মর্যাদা রক্ষার এবং শিক্ষা ও অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সমগ্র সমাজকে **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননী"** রূপে অভিহিত করে প্রতিটি নারী ও পুরুষকে সেই জননীর সন্তান হিসেবে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এই আদর্শিক ভাষ্যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সন্তানের পরিচয়েই জাতি ও জননীর পরিচয় এবং সন্তানের আদরেই জননীর আদর নিহিত থাকে। এই দর্শন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদেরকে কেবল পরিবারের চালিকাশক্তি হিসেবে নয়, বরং সমগ্র জাতির আত্মপরিচয়, সৎ পরিবেশ গঠন এবং ভারতমাতার মর্যাদা রক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব কাল থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর সমকালীন রাজনীতি পর্যন্ত অধিকার রক্ষা, গণআন্দোলন এবং সাংগঠনিক নেতৃত্বে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীরা নিরন্তর নিজেদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রমাণ দিয়ে চলেছেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংগঠিত স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলার অন্যতম বৃহৎ কৃষক সংগ্রাম 'তেভাগা আন্দোলন'-এ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নারীরা অত্যন্ত সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলত কৃষিজীবী ও ভূমিপুত্র হিসেবে পরিচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শ্রমজীবী নারীরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষক নারীদের সঙ্গে একজোট হয়ে আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ফসলের ন্যায্য অধিকার এবং কৃষকের মর্যাদা রক্ষার এই সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের অংশগ্রহণ বাংলার গ্রামীণ গণআন্দোলনের ইতিহাসে নারীশক্তির এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিল।

সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সবচেয়ে আলোচিত ও প্রতিবাদী নারী মুখ হলেন **শ্রীমতী রেখা পাত্র।** সন্দেশখালির গণআন্দোলনে স্থানীয় নারীদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে তিনি প্রধান মুখ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেত্রী ও প্রার্থী হিসেবে সর্বভারতীয় রাজনীতির মূল মঞ্চে উঠে আসেন। এক সাধারণ খেটে খাওয়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবার থেকে উঠে আসা রেখা পাত্রের এই অদম্য সাহস ও রাজনৈতিক উত্থান সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনজাতির আত্মমর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়। নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন এক রাজনৈতিক নেতা তাঁর উদ্দেশ্যে কুরুচিকর ও নারী-অবমাননাকর মন্তব্য করলে রেখা পাত্র তার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ

জানান এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটিকে কেবল একজন খেটে খাওয়া মহিলার অপমান হিসেবে দেখা হয়নি, বরং সমগ্র তফসিলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনজাতিরই অসম্মান হিসেবে গণ্য করে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়, যার ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্ব প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। রেখা পাত্রের এই সংগ্রামী ভূমিকা প্রমাণ করে যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীরা আজও তাঁদের পূর্বসূরি বিপ্লবীদের মতোই আপসহীন ও লড়াকু।

বর্তমান সময়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের শক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয়তাবাদী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' আমাদের দেশ তথা ভারতমাতাকে মজবুত করার সংকল্প নিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের সমন্বয়ে 'দেবী বাহিনী' নামক একটি বিশেষ নারী সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই 'দেবী বাহিনী' গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা ও ইতিহাসবোধ জাগ্রত করা, আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি করা, আধুনিক সমাজ সংস্কারে তাঁদের নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করা এবং দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করা। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীকে সমস্ত দ্বিধা ও সংকোচ ঝেড়ে ফেলে এই জাতীয়তাবাদী সংগঠনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তাঁরা অন্যের বদান্যতার উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণে এবং উঠতি প্রতিভাদের বিকাশে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উল্লেখযোগ্য নারীদের সামগ্রিক জীবন ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন উপনয়ন সংস্কারের আধ্যাত্মিক সমানাধিকার থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর ও অষ্টমী ঢালীর কারাবরণ, শ্রীমতী সোনালী রায়ের বৌদ্ধিক ও নৈতিক চর্চা, তেভাগার কৃষক সংগ্রাম এবং সমকালীন রাজনীতিতে রেখা পাত্রের প্রতিবাদী নেতৃত্ব ও 'দেবী বাহিনী'র সাংগঠনিক উত্থান—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সমাজের নারীরা অদম্য ক্ষত্রিয় তেজ ও গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক প্রতিকূলতা ও ঐতিহাসিক অবহেলাকে জয় করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীরা যেভাবে সমাজ সংস্কার, নারীশিক্ষা এবং ভারতমাতার গৌরব বৃদ্ধিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তা ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে এক চিরভাস্বর ও প্রেরণাদায়ী অধ্যায়।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

কবিতা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাগাথা

-এ আই আচার্য

ভারত-ভূমের পূর্ব প্রান্তে, জাহ্নবী যেথা মেশে সাগর-জলে,
সেই পুণ্যভূমি জুড়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ গর্বে মাথা তোলে।
আমরা প্রাচীন, আমরা শাশ্বত, নয় কোনো ক্ষণিকের ধারা,
ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, মহাকালের প্রহরে, আমাদের গৌরব-ইশারা। মহর্ষি কপিল মুনি- সেই জ্ঞান-প্রভাকর,
পূর্বপুরুষের নাম,
তাঁরই সাংখ্য দর্শনের প্রজ্ঞা, আমাদের জীবনের অভিরাম।
মনুর বংশের কূল-দীপ, চন্দ্রবংশের পবিত্রতা রহে,
দেবাহুতির পুত্রের সাথে, আমাদের রক্ত-যোগ সে তো কহে।
অত্রি মুনি, চন্দ্র দেব, সেই বংশের বিস্তার,
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীর জাতি, আমরা করি অহংকার।
নহে শুধু পৌরাণিক সূত্র, ইতিহাসে আমাদের বাস,
পুণ্ড্রবর্ধন সেই জনপদ, যেখানে রটেছে সুবাস।
বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেব- আমাদেরই সেই রাজা,
রাজদণ্ড ধরে শাসন করেছি, দিয়েছি প্রজার সাজা।
রাজপদ ত্যাজি তাঁরই সহোদর, কপিল নিলেন বৈরাগ্য-যোগ, একই বংশে যোদ্ধা ও ঋষি, আমাদের মাঝে সেই সংযোগ। ক্ষমতা আর আধ্যাত্মিকতা, দুই বাহুতেই শক্তি,
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি তাই, করে ধর্ম-পথে ভক্তি।
সাগর-সঙ্গমে কপিল-আশ্রম, আজও তীর্থ-ধাম,
সগর-পুত্রদের মুক্তি দিয়ে, তিনি দিলেন পুণ্য-নাম।
ক্ষত্রিয়ধর্মের ত্রুটি মোচন, পাপক্ষয় করি দান,
সেই আশীর্বাদ ধন্য আমরা, পবিত্র আমাদের প্রাণ।
গঙ্গাসাগর মেলাতে, লক্ষ কোটি লোক আসে,
সেই কপিল-মন্দির রয়েছে, আমাদের এই আশে-পাশে।
ভূমির সাথে হৃদয়ের টান, জন্ম আমাদের এখানে,
আদি বাসিন্দা আমরাই তো, এ কথা সবাই জানে।
আমাদের সংস্কৃতি গভীর, যুদ্ধ ও জ্ঞানের আলোয় গড়া,
অসি-চালনা জানি, আবার সাংখ্য-তত্ত্বেরও পড়া।
পুরুষ আর প্রকৃতির ভেদাভেদ, আমাদের চেতনায় জাগে,
মুক্তিপথের সেই মন্ত্রে, আমরাই থাকি আগে।
অহংকারের বিনাশে, আমরাই তো দেখেছি রাজপদ পতন,
কিন্তু কপিলের বৈরাগ্যে, খুঁজে পেয়েছি নতুন জীবন।
তাই আমরা শুধু যোদ্ধা নই, আমরা স্থিতধী, জ্ঞানী,
অতীতের সেই মহৎ ধারা, আমরাই তো বহনকারী।
বিপন্নতার মাঝেও ছিল, আমাদের দৃঢ় অবস্থান,
ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছি, রক্ষা করেছি আমাদের মান।
এই বঙ্গভূমি, এই সাগর-কূল, এই আকাশ-বাতাস,
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামের সাথে, মিশে আছে আমাদের বিশ্বাস।
উচ্চ আমাদের সামাজিক মর্যাদা, অতীত আমাদের মহান,
আত্মমর্যাদার দীপ্তিতে, আমরা করি জয়গান।
এই বিশ্বাসে বলীয়ান হোক, প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রাণ,
আমাদের ঐতিহ্য অক্ষয় হোক, যুগে যুগে হোক মহান।

সাংগঠনিক খবর

সাংগঠনিক সভা

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

১৬/০৫/২০২৬

অনলাইন আলোচনা সভা

১৬ই মে ২০২৬ শনিবার, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি গুগুল মিটে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক

শ্রী তপন বৈদ্য মহাশয়। বেদ মন্ত্র পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেদ মন্ত্র পাঠ করেন মেদিনীপুরের হলদিয়া থেকে কুমারী কমলিকা গায়েন। তিনি শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয়ের কন্যা। শ্রীশুভেন্দু গায়েন হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় মিহির কুমার গায়েনের পৌত্র এবং সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, মেদিনীপুর জেলার কনভেনর। বেদমন্ত্র পাঠের পর সভা পরিচালনা করেন সভাপতি এবং একে একে উপস্থিত পদাধিকারীরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রথমে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল মহাশয়। তিনি তাঁর পরিচিতি কয়েকজনের সঙ্গে সংগঠনের বিষয়ে কথা বলেছেন বলে জানান। তারপর বক্তব্য রাখেন ল-সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীমিলটন সরকার মহাশয়। তিনিও জানান যে তিনি অনেকের সাথে কথা বলেছেন, তবে সেরূপভাবে কাজ এগোয় নি। এরপর বনগাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীমুকেশ মণ্ডল মহাশয় বক্তব্য রাখেন এবং বলেন সংগঠনকে তৃণমূলস্তরে নিয়ে যেতে হবে এবং তারজন্য আমাদেরকে বের হতে হবে, মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। মেদিনীপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয় জানান তিনি তাঁর পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং চেষ্টা চালাচ্ছেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একত্রকরণের জন্য। এরপর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। তিনি পত্রিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন - এই পত্রিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত কার্যকারী হবে, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। সভার শেষমুহূর্তে সংগঠনের মাননীয় সহ-সভাপতি শ্রী দেবাশিষ জোয়ারদার মহাশয় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর পরিবারের একজন প্রিয়জনকে হারানোর সংবাদ জানান। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন তিনি অনেকের সঙ্গেই এই সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আগামী দিনে তাদেরকে যুক্ত করবেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রীতপন বৈদ্য মহাশয় মুখোমুখি বসে মিটিং করার প্রস্তাব করেন তাঁর বক্তব্যে। কিন্তু সদস্যদের অবস্থানের দূরত্ব বিবেচনা করে অনলাইন মিটিংই ঠিক এটি স্থির হয়। তিনি পরবর্তী জেনারেল মিটিং-এ সবাইকে অংশগ্রহণের কথা বলেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতি শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং কল্যাণমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পরবর্তী মিটিং জুন ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক সংবাদ

- ওড়িশাতে বেশ কিছু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানকার অধিবাসী **শ্রীদীপঙ্কর মণ্ডল** ‘সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজে’র ওয়েবসাইট

www.poundrakshotriy.com থেকে ফোন নম্বর পেয়ে সংগঠনের সভাপতি শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডলকে ফোন করেন এবং পৌণ্ড্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এক এই মর্মে একটি শংসাপত্র চান। সভাপতি তাকে আশ্বস্ত করেন। **শ্রী দীপঙ্কর মণ্ডলের নিকট থেকে ছত্তিশগড় রাজ্যে ১৫টি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রাম আছে বলে জানা যায়।** শ্রী মণ্ডলকে ওড়িশা ও ছত্তিশগড় রাজ্যে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ' সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

- দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি ও মগরাহাট থেকে একাধিক ব্যক্তি 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজে'র ওয়েবসাইট www.poundrakshotriy.com থেকে ফোন নম্বর পেয়ে সংগঠনের সভাপতি শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডলকে ফোন করেন এবং তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক আলোচনা হয়। **শ্রী প্রভাত কাঁসারীকে মগরাহাট বিধানসভা এবং শ্রী প্রসেঞ্জিৎ হালদারকে রায়দিঘি বিধানসভার কনভেনরের দায়িত্ব দেওয়া হয়।** তাঁরা ইতিমধ্যে Whatsapp Group খুলে এলাকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের যুক্ত করা শুরু করেছেন।
- **শ্রী অরুপ মিস্ত্রী মহাশয়** কুলতলি থেকে সংগঠনের সভাপতিকে ফোন করেন এবং কাস্ট সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানান। সংগঠনের সভাপতি শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কয়েকজন শাসক নেতার নম্বর দেন, কিন্তু অরুপবাবু তাদের সাথে যোগাযোগ করে হতাশ হন। তিনি হতাশার কথা সভাপতিকে জানান এবং দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা বলেন। সভাপতি তাকে ধাপে ধাপে কি কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন ও প্রশাসনকে জানাতে বলেন। সেই অনুযায়ী অরুপবাবু প্রশাসনের দ্বারস্থ হন এবং বিষয়টির একটি সুরাহা হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে কুলতলিতে সংগঠন বিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
- উত্তর ২৪ পরগণার বিরাটীতে বাড়ি **শ্রীঅরিজিত ঘোষ** মহাশয় তিনি সভাপতির সাথে যোগাযোগ করেন এবং জানান যে তাঁর ঠাকুর মা বলতেন তাঁরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। তাই তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্পর্কে জানতে চান এবং এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে চান। তাঁকে সংগঠনের গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছে এবং আগামী বার্ষিক সম্মেলনে তাঁকে সদস্যপদ দেওয়া হবে।
- জয়নগর বিধান সভার **শ্রী তপন মণ্ডল** আমাদের সংগঠনের পুরানো সদস্য। তাঁর সাথে জয় নগরে সংগঠন প্রসারের ব্যাপারে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এবং অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ

1. সকল সরকারী নথিতে ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি শংসাপত্রে পৌণ্ড্র শব্দের সঙ্গে **'ক্ষত্রিয়'** যোগ করে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** করতে হবে।
2. মকর সংক্রান্তির দিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে।
3. **মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
4. **সুন্দরবনে মহাত্মা কপিল মুনির নামে 'কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
5. **সরকারকে "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ"** গঠন করতে হবে এবং তাতে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনরাই থাকবেন।
6. **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে রাখতে হবে।**
7. সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার নদীবাঁধগুলি কংক্রিটের দ্বারা স্থায়িত্ব বিধান করতে হবে।
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করতে হবে এবং মিউজিয়াম নির্মাণ করতে হবে।
9. **সুন্দরবনের পানীয় জল সমস্যার সমাধানের জন্য পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করতে হবে।**
10. **হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরের 'কল্পগঙ্গা ও কপিল মুনি মেলা'র পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।**
11. হাসনাবাদ থেকে হেমনগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।
12. বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত এলাকার প্রার্থী বাছাইয়ে, প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলিকে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
13. হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"ব্রহ্মচারী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়"** করতে হবে।
14. সুন্দরবনের নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের নামে নামকরণ করতে হবে।
15. সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার ও জেলার অন্য অংশের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন রোড পারমিট প্রদান ও বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
16. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তাদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে হবে।

17. পূর্ব মেদিনিপুরে ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
18. দক্ষিণ রায়, বেণী মাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, ঈশানচন্দ্র কামার, পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর, স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশী গৌরহরি বিশ্বাস, জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের নামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
19. শহীদ গঙ্গাহরি দাসের নামে সাগরদ্বীপে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
20. ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার মহাশয়ের নামে একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
21. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুঁথি বিশেষজ্ঞ অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
22. সমাজদরদী শক্তিকুমার সরকারের নামে সুন্দরবনে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
23. সঙ্গীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদারের নামে সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
24. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দরদী হেমচন্দ্র নস্করের নামে একটি উপনগরীর নাম রাখতে হবে।
25. সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকারের নামে একটি নার্সিং কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলাতে গড়ে তুলতে হবে।
26. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে সুন্দরবনে একটি ট্যুরিজম কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
27. বসন্তকুমার মণ্ডল মহাশয়ের নামে টালিগঞ্জের একটি সরকারী স্টুডিওর নামকরণ করতে হবে।
28. শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের নামে একটি ছাত্রাবাসের নাম করণ করতে হবে।
29. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা একটি দূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
30. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামে মেদিনীপুরের একটি স্কুলের নামকরণ বা নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
31. মথুরাপুর লোকসভার একটি কিষানমান্ডির নাম কংসারী হালদারের নামে রাখতে হবে।
32. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।
33. প্রতিটি ব্লকের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থীকে ইংলিশ মিডিয়ামে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
34. প্রতিটি ব্লকে কিছু প্রাইমারী স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উন্নীত করতে হবে।
35. হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, দৌলতপুর, বিষ্ণুপুর, আমতলা, কৃপারামপুর, বলরামপুর,

রায়পুর, রামেস্বরপুর, রামচন্দ্রপুর, চম্পাহাটি, কালিকাপুর বারাসাত, নিমপীঠ ও তুলসীঘাটা, বিদ্যাধরপুর, বাসন্তি, তালদি, দীঘিরপাড়, মাখালতলা, ঢোলা, অযোধ্যানগর, চাঁদপুর, বংশীধরপুর, কৃষ্ণচন্দ্র পুর, মথুরাপুর ইত্যাদি জনগণনা শহরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করতে হবে।

36. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে ফায়ার ব্রিগেড অফিস বানাতে হবে ও টীম রাখতে হবে।
37. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে কোল্ডস্টোরেজ বানাতে হবে।
38. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত দুটি করে রাইস মিল বানাতে হবে।
39. মৎস্যজীবীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে এবং উপযুক্ত বিমার ব্যবস্থা করতে হবে।
40. পরিবেশের ক্ষতি না করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন করতে হবে। এই শিল্পে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করতে হবে।
41. বিনোদন পার্ক নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে তার নামকরণ করতে হবে।
42. সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লককে রেল নেটওয়ার্কে জুড়তে হবে।
43. রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।
44. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের পরিবেশের মান বজায় রাখার জন্য নদীর তীরগুলিতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
45. লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়াতে হবে ও ডিজিটালাইজড করতে হবে।
46. প্রতি ব্লকে একটি হাসপাতাল এবং প্রতি গ্রামে একটি করে হেলথ সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।
47. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের নদী তীরস্থ প্রতিটি গ্রামে স্থায়ী শ্মশাণ ঘাট ও শ্মশাণ যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম বানাতে হবে।
48. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের প্রতিটি ব্লকে DISASTER MANAGEMENT-এর শাখা গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় যুবদের সেখানে যুক্ত করতে হবে।
49. প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে চাকরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
50. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখের নামে মহিলা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
51. গ্রাম, পৌরসভার নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে রাখতে হবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

